১১শ ভাগ। (Registered No C 344.) ভাদ্র, ১৩২১।

অবসর

মাসিক পত্র



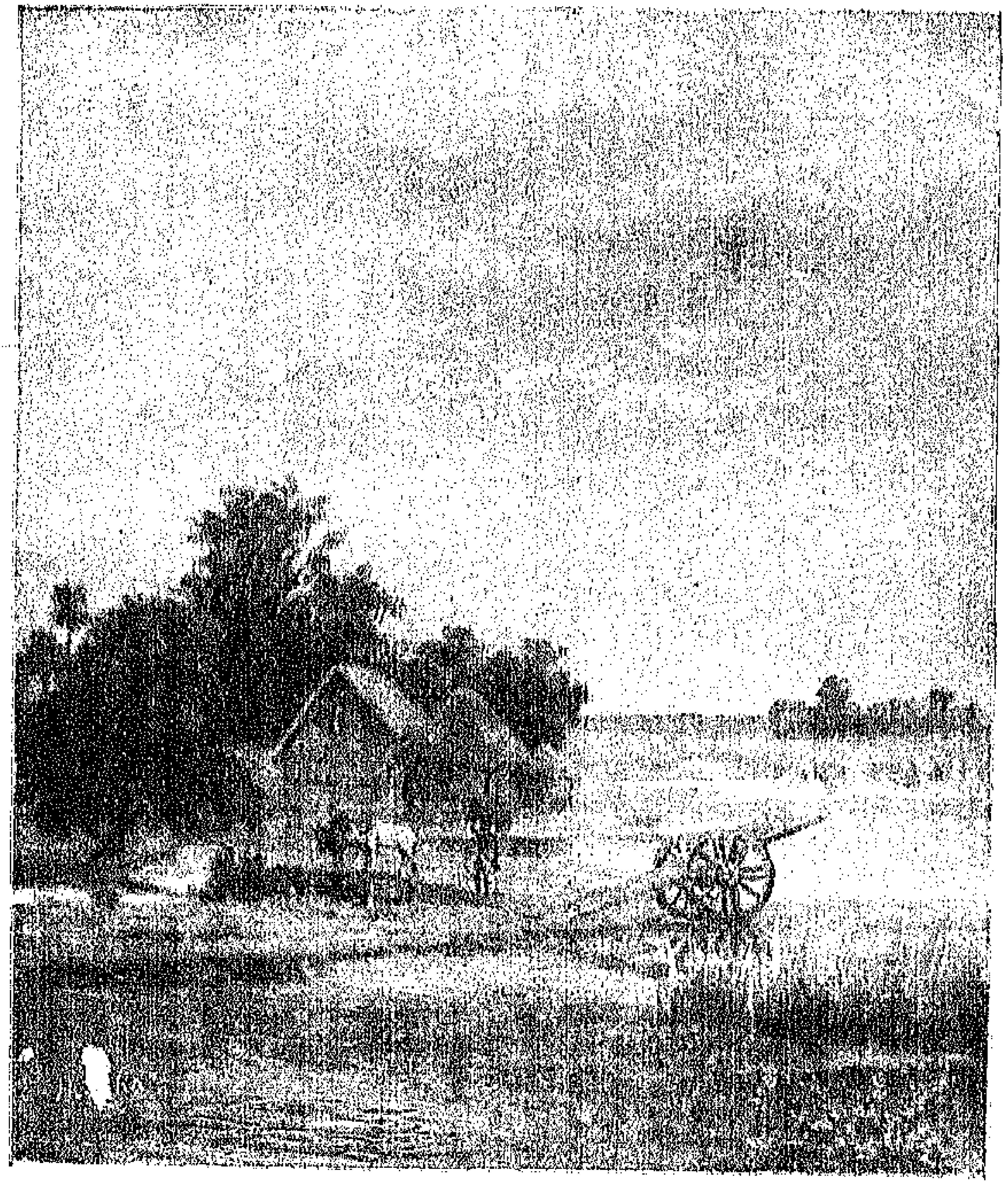
শ্রীসুরেনচণ্ডী দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা, ৯২নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর প্রেস" হইতে

শ্রীপঞ্চানন মিত্র দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ সিকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵১০ আনা।

সূচী।



পল্লী সন্ধ্যা।

ENGRAVED & PRINTED BY
THE ACME PRINTING & PROCESS WORKS.
115, Amherst St., Calcutta.

PUBLISHED BY
HAREKRISHNA SAHA,
81, Sitaram Ghosh Street.

অবসর—



পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত
নরকোৎসব নামক নব প্রকাশিত গ্রন্থের একটি দৃশ্য।
উষার শিবার্চ্চনা করিতে গমন।

অবসর।

১১শ ভাগ ১৩২১। ——— ১ম সংখ্যা, ভাদ্র।

অবসর।

বহু অন্বেষণে পেয়েছি তোমায়
আজি ওগো "অবসর"!
শ্রান্ত ক্লিষ্টপ্রাণে শান্তি-প্রদায়িনী
বড় তুমি নিরন্তর।
সংসার মরুর মরীচিকা-মাঝে
পড়ি যবে পিপাসায়,
ওষ্ঠাগত প্রাণ, হতাশে চাহিয়া
থাকি তব প্রতীক্ষায়;—
তুমি কোথা হ'তে সে তপ্ত পরাণে
ঢালিতে শান্তির বারি,
ধীর পদক্ষেপে দাও দরশন
সে'কালে করুণা করি।
রত্নগর্ভা তুমি ধর গর্ভে কত,
মূল্যবান উপদেশ,
বুঝি বা তোমায় না পেলে নরের
দুর্গতি হ'ত অশেষ!
হতাশের আশা ভগ্ন হৃদে বল,
ধৃতিতে বিতর সুখ,
পরিশ্রান্ত জনে শান্তি বিতরিয়া
নিবার সকল দুখ।
কাব্য আলাপন সাহিত্য বিজ্ঞান
তোমার প্রসাদে নর
পুরাণেতিহাস ধর্ম্মনীতি আদি
করে ওগো "অবসর"।
এ বিশাল বিশ্বে কোথা নিরজনে
ল'ভেছ জনম তুমি,
কিন্তু উঠিতেছে তব যশঃ ভাতি
উজ্জ্বলি ভারত ভূমি।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রার্থনা।

১

নবীন বরষে মনের হরষে
পরমেশ তব চরণে।
আশা চিরকাল কাটে যেন কাল
(ওই) রাতুল-চরণ-শরণে॥

২

এ নব বরষে পিতা পরমেশে
নব ভাবে সাজে সাজিয়ে।
মানস-কুসুম ঢালি অনুপম
যাচি পদে আজি মজিয়ে।

৩

(যেন) কর্ম্মময় ভবে নর নারী সবে
'অবসর' সদা লভিয়ে।
(করি) তব নাম গান জুড়ায় পরাণ
হরষিত মনে বসিয়ে॥

৪

(মম) আর কিছু নাই এই ভিক্ষা চাই
শক্তি নাহি স্তুতি করিতে।
(আমি) যে দিকে যখন ফিরাই নয়ন
তব রূপ পাই হেরিতে॥

৫

যত মহাজন (তব) করুণাভাজন
(আমি) অভাজন আছি পড়িয়ে।
করি কৃপাদান হের ভগবান
পাপ তাপ নাশ করিয়ে॥

৬

(তব) অপরূপ রূপ ওহে বিশ্বরূপ
বিরূপ হওনা অধমে।
পদে এ মিনতি হের বিশ্বপতি
(বড়) যাতনা পেতেছি মরমে॥

শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সমাজদ্বার।

কাব্যের স্বরূপ।

বিদেশীয় বিখ্যাত সমালোচক মেকলে বলিয়াছেন যে, 'সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের অবনতি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তাই বলিয়া কালচক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান (Experimental Science) কখনও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয় না, বরং উত্তরোত্তর উন্নতই হইতে থাকে।' সঙ্গীত, চিত্রশিল্প ও স্থাপত্যবিদ্যা সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য হইলেও কাব্যসাহিত্যে ইহা ন্যূনাধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সুরুচি-সঙ্গত প্রণালীর চরম উন্নতি সাধিত হইলেও, উহা কিছুতেই উপযুক্ত কলা-সকলের প্রতি বিশ্বসাধারণের তীব্র মনোযোগ আকর্ষণ করাইতে পারে না। এবং অস্পষ্ট হইলেও কবির ভাষা তাহার কাব্যরচনার উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ উপযোগী। সুসভ্য সমাজের ব্যবহৃত শব্দাবলী দার্শনিক, কিন্তু অর্দ্ধসভ্য লোকের ব্যবহৃত শব্দাবলীই কবিতার উপযুক্ত।

মানবের ভাষাগত পার্থক্য আংশিক মাত্রায় তাহাদের মানসিক কার্য্য-কলাপের প্রাকৃত পরিবর্ত্তন হইতে সমুদ্ভূত এবং এই পরিবর্ত্তন দ্বারাই বিজ্ঞা-নের উন্নতি ও কাব্যের অবনতি। জ্ঞানোন্নতি বিধানের জন্য যেমন একীকরণ (Generalisation) আবশ্যক, ভাব-উদ্ভাবনের জন্যও তেমনি আবার বিশেষত্বের (Particularity) নিতান্ত প্রয়োজন। মনুষ্যের জ্ঞান ও চিন্তার আধিক্য অনুসারে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি কম, শ্রেণীবিশেষের প্রতি বেশী। সুতরাং তাহারা শিব গড়াইতে বানর গড়াইয়া ফেলেন—এবং স্বরূপ-মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে প্রতিবিম্ব দেখিয়াই সন্তুষ্ট হন। তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অপেক্ষা মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণে সমধিক নিপুণ হইতে পারেন, কিন্তু বিশ্লেষণ কবির কায নহে—কবির কায বাস্তব চিত্র চিত্রিত করা।

কাব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ অনেকটা চিন্তাশক্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকে, এবং একথা বলা যাইতে পারে না যে, সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাশক্তিরও হ্রস্বতা ঘটিবে। কারণ, ঈশ্বর-প্রদত্ত প্রতিভা না থাকিলে জোড় করিয়া কেহ কাহাকেও কবি করিতে পারে না। বিজ্ঞান অনেকটা তথ্যাগার সদৃশ; যদি তাহা না হইত, তবে মানব কখনও অতীত যুগের আবিষ্কৃত জানিতে সমর্থ হইত না। বৈজ্ঞানিক তাহার পূর্ব্বপুরুষগণে

ক্রিয়াকলাপের ছায়াবলম্বন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কবি কখনও কোন বিষয়ের বর্ণনায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের অনুগমন করেন না। কবি সাধারণতঃ তাঁহার অন্তর-নিহিত ভাবরাশিরই বিকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ সকল ভাব কখনও অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ করেন না।

কবি শব্দ-সমুদ্র মন্থন করিয়া ভাবরাশিকে এমন ভাবে অভিব্যক্ত করেন যে, উহা স্বপ্নের ন্যায় কৌতুহলোদ্দীপক প্রতীয়মান হইয়া থাকে। চিত্রকর যে কার্য্য রঙের সাহায্যে সম্পাদন করেন, কবি তাহা শব্দের সাহায্যে করিয়া থাকেন। চিত্রকর ও কবির মধ্যে এই যা পার্থক্য। জনৈক বিখ্যাত কবি বলিয়াছেন,—

"As imagination bodies forth The forms of things unknown, the poet's pen

Turns them to shapes and gives to airy nothing
A local habitation and a name,"

বস্তুতঃও কাব্য মনশ্চক্ষুর সম্মুখে এক অতি অনির্ব্বচনীয় স্বপ্ন-মাধুরীর সৃষ্টি করে। কবির কাব্য-রচনা করিবার নিয়মটী অভ্রান্ত, কিন্তু তিনি যে যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া কাব্য-রচনা করেন, তাহাই সময়ে সময়ে ভ্রান্ত। কল্পনাপ্রসূত কাবই কাব্য—বিশেষতঃ কবি কাব্য-রচনার সময় তন্ময়চিত্তে কল্পনারই আশ্রয় লইয়া থাকেন। কবি কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুগামী হইতে বাধ্য নহেন, এবং তিনি স্বকীয় চিত্তবিনোদনার্থ ও পাঠকের মনোরঞ্জনার্থ সময়ে সময়ে স্বীয় বক্তব্যের পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কাব্য হইতে সত্যের নামগন্ধ লোপ করিতে পারেন না।

সুসভ্য সমাজে ও সাহিত্য জগতে যিনি কবিযশঃপ্রার্থী, তিনি সর্ব্বতোভাবে বালস্বভাবের অনুগামী হইবেন। যে সুগভীর তত্ত্ব-জ্ঞানের জন্য তাঁহার নাম বিখ্যাত হইয়াছে কিম্বা হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা তাঁহার ক্রমোন্নতির অন্তরায় বোধে সেদিকে দৃষ্টিহীন হওয়াই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ পরের মুখে প্রশংসা শুনিয়া কবির গর্ব্বিত হওয়া উচিত নহে। মেকলের মতে, 'কাব্য কেবল কল্পনার ফল এবং তজ্জন্যই উহা যৌক্তিক চিন্তার সহিত সুসঙ্গতি রক্ষা করিতে অক্ষম।' কিন্তু একথা সম্পূর্ণ প্রমাদাত্মক। চরম সত্যও কাব্যের সাহায্যে অভিব্যক্ত হইতে পারে। যদি আমরা মেকলের মত

স্বীকার করি, তবে অসভ্য লোকদিগকেও কবি স্বীকার করিতে হইবে; কেননা, তাহারাও কল্পনার সন্তান এবং বিচারশক্তিহীন। স্বপ্নসদৃশ অলীক পদার্থের সৃষ্টি করাই কাব্যের উদ্দেশ্য,—একথা সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল। জীবনের দুর্জ্ঞেয় জটিল রহস্য উদ্‌ঘাটন করাও কাব্যের প্রধানতম উদ্দেশ্য! অধ্যাপক সার্পসাহেব তদীয় Aspeet of Poetry নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"So far is it from being true that reason has putout imagination, that perhaps there never was a time when reason so imperatively calls imagination to her aid and when imagination enters so largely into all literary and evon into Scientific products." সুতরাং বলা অবৈধ নহে যে, অযৌক্তিক কল্পনা কাব্যের উপাদান হইবার অনুপযোগী। মেকলে একথাও বলিয়াছেন যে 'মানবের মনে বিভিন্ন চিত্র চিত্রিত করাই মহাকবি মিণ্টনের কৃতিত্ব'। কিন্তু যে শক্তি থাকিলে ঐরূপ চিত্র চিত্রিত করা যাইতে পারে, বালক কিম্বা অসভ্যের পক্ষে তাহা কি সম্ভবপর? সুতরাং যদি মেকলের মত মানিয়া লওয়া যায়, তবে বিদ্যার সহিতও কাব্যের অসঙ্গতি দোষ ঘটিয়া যায়; কিন্তু "Learning and wisdom may be lodged in the samo brain with the highest poetry, as Lucretius, Virgil, Dante, Milton and goethe may proev." ম্যাথিউ আরনল্ডের ন্যায় মনস্বী সমালোচকও বলিয়াছেন যে, উৎকৃষ্ট কাব্যের উপদেশ ও উপাদান অনেকাংশে প্রকৃত বিষয়ের অনুরূপতা ও গভীরতা হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে; এবং এই অনুরূপতা ও গভীরতা যতই বেশী হইবে, কাব্যের উৎকর্ষতাও ততই অধিক প্রতিপন্ন হইবে। সুতরাং কাব্য কেবল কল্পনামূলক হইতে পারে না, উহাতে সত্যের নামগন্ধও বিশেষরূপে জড়িত থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

শ্রীবেণীমাধব দত্ত।

সোণার হার।

(গল্প)

১

গ্রামের নবগোপাল বাবুকেই সৎ এবং বিশ্বাসী লোক মনে করিয়া হরেন্দ্র কাশী যাইবার সময় তাহার স্ত্রীর সমস্ত গহনা তাঁহারই কাছে গচ্ছিত রাখিয়া গেল। নবগোপালবাবুও ইহাতে কোন আপত্তি করিলেন না; কেননা প্রতিবেশী হরেন্দ্রের এই সামান্য উপকারটুকু করিতে অস্বীকার করাটা তিনি নেহাইৎ অন্যায় বিবেচনা করিলেন। হরেন্দ্র নবগোপালবাবুকে গহনাগুলি বুঝাইয়া দিয়া একদিন বেশ নিশ্চিন্তমনে স্ত্রীকে লইয়া কাশী চলিয়া গেল।

তখন কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীর চাঁদ সবেমাত্র পূবের আকাশে দেখা দিয়াছিল। নবগোপালবাবু আহারাদি শেষ করিয়া বিছানায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। পার্শ্বের উন্মুক্ত জানালা দিয়া প্রচুর চাঁদের আলো গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সারা বিছানাটা আলোকিত করিয়াছিল। সেই ধপ্‌ধপে বিছানার একপার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড তাকিয়ার উপর নিজের কৃষ্ণবর্ণ স্থূল দেহখানি এলাইয়া দিয়া অবিরাম ভড়র্ ভড়র্ শব্দে নির্জ্জন গৃহখানি মুখরিত করিয়া তুলিতেছিলেন। ললাট তাঁহার ঈষৎ কুঞ্চিত। কি একটা বিষয় খুব গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বেশ বুঝা যায়।

বাহিরে পরিষ্কার আকাশে কি সুন্দর চাঁদ উঠিয়াছে। চাঁদের আলো কেমন স্নিগ্ধ, কেমন চমৎকার! চারিদিকে যেন হাসির ফোয়ারা খুলে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতির ছবিতে বেশ একটা সহজ সরল ভাব ফুটে উঠেছে। কিন্তু নবগোপালবাবুর সে সকলের দিকে আদৌ দৃষ্টি ছিল না, দৃষ্টি ছিল তাঁর আপন অন্তরের ভিতর। তিনি সেখানে একটা কিছু গড়িয়া পিটিয়া ঠিক করিয়া রাখিতেছিলেন। নবগোপালবাবুর ভিতর বাহির দুই-ই সমান—দুই-ই অন্ধকারময়।

সংসারের কাযকর্ম্ম শেষ করিয়া যখন পত্নী স্নেহলতা গৃহে প্রবেশ করিল, তখন নবগোপালবাবু ধূমপান সমাধা করিলেন। হুঁকাটী স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলেন—"ওগো শুনেছ, হরেন্দ্র আজ কাশী থেকে বাড়ী ফিরে এসেছে?"

"কৈ না! সত্যি নাকি? তা কখন এল তারা?"

"সত্যি নয় ত কি আর মিথ্যে বলছি? আপদ আর থাকবে কোন চুলোয়? এই বিকেলে ৫টার সময় ফিরে এসেছে।"

"ওমা! ও আবার কি রকম কথা তোমার। আপদ কাকে ব'লছ গো? বেচারা কতদিন পরে দেশে ফিরে এসেছে। আহা, তা আস্‌বে বৈ কি। আপনার ঘর বাড়ী ফেলে বিদেশে কি আর সত্যি বেশীদিন পড়ে থাকতে ভাল লাগে?"

"কাল যে গহনাগুলো চাইতে আসবে?"

"তা তার-গহনা দিয়ে দেবে, ব্যাস্‌।"

"ব্যাস্‌! ভারী আমার ব্যাস্‌ শিখেছেরে! এতদিন যে আমি রাখলুম, তার দরুণ কিছু পাব না? হারটা তাকে আর আমি দিচ্ছি নে।

"তা সে অম্‌নি দিতে চাইবে কেন?"

"আরে—দিতে চাইবে না যে সে আমি জানি; কিন্তু হার যে সে আমার কাছে রেখেছিল, তার প্রমাণ কি?"

"ওমা! ঠকিয়ে নেবে তুমি?"

"তুমি মনে করেছ কি তবে! ব'লে,ক'য়ে?"

"অধর্ম্ম হবে যে!"

"ওঃ!—ভারী আমার 'ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির' এসেছেন গো! আপনার চরকায় তেল দাও। নিজের কায দেখ, কায দেখ। কাযকর্ম্ম সেরে শুয়ে পড়, রাত হয়েছে" বলিয়া নবগোপালবাবু শুইয়া পড়িলেন। স্নেহলতা বহুক্ষণ বকিল, কিন্তু নবগোপালবাবু আর একটীও কথা কহিলেন না। অগত্যা স্নেহলতাকে শেষে থামিতে হইল।

২

যাহা হইবার তাহাই হইল। হরেন্দ্র অন্যান্য অলঙ্কারগুলি পাইল বটে, কিন্তু হার পাইল না। অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল, ঝগড়া হইল, কিন্তু নবগোপালবাবু হার কিছুতেই বাহির করিলেন না; বলিলেন—"হার হার করে মিছে চেঁচিও না, হার আমাকে দিয়েছিলে?"

হরেন্দ্র রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"দিই নি? মিথ্যে কথা ফের? সেই পাথর সেট্‌ করা পাঁচশ টাকার হারটা? পাজি, জোচ্চোর কোথাকার

নবগোপালবাবুও রাগিয়া উঠিলেন। চীৎকার করিয়া বলিলেন—"গালা গালি হচ্ছে? তোর মত ছোটলোককে এখুনি আমি রীতিমত জব্দ

দিতে পারি জানিস্? ফের যদি পাগ্‌লামি করবি, তা হ'লে চাকর দিয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দেব।"

"আচ্ছা, দেখা যাবে কে কাকে জব্দ করে" বলিয়া হরেন্দ্র অলঙ্কারগুলি তুলিয়া লইয়া রাগে ফুলিতে ফুলিতে বাহির হইয়া গেল।

বাড়ীতে আসিয়া হরেন্দ্র পাড়ার দশজনকে ডাকিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিল। কথাটা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ভদ্রলোকে যে এইরূপ করিয়া প্রতিবেশীকে ঠকাইতে পারে, সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই প্রকাশ করিলেন যে তাঁহারা এই সর্ব্বপ্রথম সে কথা শুনিলেন। অনেক তর্ক বিতর্ক হইল, কিন্তু পুলিসে সংবাদ দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন সহজ উপায় কেহই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাহাই ঠিক হইল। হরেন্দ্র পুলিসে সংবাদ দিতে স্বীকৃত হইল। পুলিসে সংবাদ দেওয়া হইল বটে, কিন্তু কোন ফল হইল না। নবগোপালবাবুর কাছে যে হরেন্দ্র হারটী রাখিয়াছিল, তাহা প্রমাণ হয় কিরূপে? হরেন্দ্র যখন নবগোপালবাবুকে অলঙ্কারগুলি দিয়াছিল, তখন তথায় কেহই ছিল না; কাযেই সাক্ষী মোটেই পাওয়া গেল না। বেচারা হরেন্দ্র যেন একেবারে দমিয়া গেল। একদিন মধ্যাহ্নে বিছানার উপর পড়িয়া পড়িয়া হরেন্দ্র কত কি ভাবিতেছিল। ভাবনার তাহার সীমা ছিল না; সে কেবলই ভাবিয়া যাইতেছিল, কিন্তু একটী মাত্র উপায়ও ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এমনি করিয়া ভাবিয়া ভাবিয়াই তাহার দিনগুলা আজকাল কাটিয়া যাইতেছে।

ভাবিতে ভাবিতে একবার তাহার মনে হইল—"তাই ত। লোকটা জোচ্চুরি করে আমার অমন চমৎকার হারটা গাপ্ কর্ল্লে, আর আমি তার কিছু কর্ত্তে পারলুম না? একটুও তাকে জব্দ কর্ত্তে পারলুম না? জব্দ করা চাই, যেমন করে হোক, হার তার কাছ থেকে আদায় কর্ত্তেই হবে।" হরেন্দ্র হৃদয়াবেগ দমন করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—"নিশ্চয় আদায় কর্ত্তে হবে।"

ঠিক এই সময় হরেন্দ্রের পত্নী সরলা গৃহে প্রবেশ করিল। স্ত্রীকে দেখিয়া হরেন্দ্র উঠিয়া বসিল। সরলা স্বামীর কাছে আসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—"আদায় তা হ'লে না করে ছাড়্ছ না?"

হরেন্দ্র বলিল—"নিশ্চয়ই না।"

"উপায় কিছু ঠিক করেছ? কেমন করে করবে?"

"চেষ্টার অসাধ্য কায নেই" জান ত তা? আমি কি সহজে ছাড়ব মনে করছ নাকি? দেখ, আদায় কর্ত্তে পারি কি না?

"আমি একটা কথা বলব, শুনবে?"

"কি বল না?"

"তোমার ভজহরিকে ওদের বাড়ী চাকর রেখে দাও না?"

"কি হবে তাতে?"

"ভজহরি তোমার খুব বাধ্য জানি। ওকে দিয়ে কাযটা হাসিল করে নিতে পারবে এখন।"

"তা ত বুঝলুম। কিন্তু ভজহরিকে ওরা রাখবে কেন? ওদের ত চাকর রয়েছে?"

"না না, নেই, সেটা কাল পালিয়েছে।"

"কে বল্লে তোমাকে?"

"নাপ্‌তে বৌ বল্‌ছিল। ওদের চাকরটা পালিয়ে গেছে ব'লে ওরা বুঝি তাকে একটা চাকর দেখে দিতে ব'লেছে। ভজহরিকে যদি ওখানে ঢুকিয়ে দাও তা হলে বল, আমি নাপ্‌তে বৌকে বল্‌ব এখন।"

"আচ্ছা তুমি ব'ল তাকে।"

"বেশ" বলিয়া সরলা কি একটা জিনিষ আলমারি হইতে বাহির করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

হরেন্দ্র বুঝিয়াছিল, এ একটা বেশ চমৎকার উপায়; তাই মোটে দেরী করিল না, তখনই একটা ছাতা লইয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

ভজহরি একবার খুব বিপদে পড়িয়াছিল। হরেন্দ্রের পিতা অনেক চেষ্টা এবং পরিশ্রম করিয়া তাহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার ঢের অর্থও ব্যয় হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই ভজহরি ইঁহাদের অত্যন্ত বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। হরেন্দ্রকে সে খুব ভালবাসিত, কারণ সে তাহাকে একপ্রকার কোলেপিঠে করিয়াই মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল।

ভজহরির বাটী যাইয়া হরেন্দ্র পূর্ণ একঘণ্টা কাল তাহাকে বেশ করিয়া সমস্ত কথা বুঝাইল। ভাল করিয়া সকল কথা শুনিয়া ভজহরি স্বীকৃত হইল, বলিল—"দোষ হবে না ত এতে?"

হরেন্দ্র বলিল—"একবার বের করে আন্‌তে পারলে সে আর এ কথা প্রকাশই কর্ত্তে পারবে না।"

ভজহরি বলিল—"যদি করে ?"

হরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"কিছু হবে না। তুমি মোটেই ভয় ক'র না।"

৩

ভজহরি নবগোপালবাবুর বাটীতে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হওয়ার পর প্রায় পাঁচমাস অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে পর্য্যন্ত হারের কোন কিনারা হয় নাই। হরেন্দ্র তখনও হারের কথা ভুলিতে পারে নাই, উহার স্মৃতি মধ্যে মধ্যে তাহাকে বিশেষ কষ্ট দিত।

একদিন সন্ধ্যাকালে হরেন্দ্র একাকী বাহিরের ঘরে একখানা ইজি চেয়ারে পড়িয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া বাহিরের রাস্তা বেশ সুন্দর দেখা যাইতেছিল ; হরেন্দ্র একদৃষ্টে সেই পথের দিকে চাহিয়াছিল। রাস্তা দিয়া লোক যাইলেই সে মাথা তুলিয়া ভাল করিয়া তাহাকে দেখিয়া লইতেছিল। ক্রমে ভজহরি সেই পথে দেখা দিল।

তাহাকে দেখিয়াই হরেন্দ্র একেবারে লাফ দিয়া উঠিয়া সোজা হইয়া বসিল। কিছুক্ষণ পরে ভজহরি দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই সে বলিয়া উঠিল—"কি ভজুদা, যা অনুমান করেছিলে তাই ঠিক কি ?"

ভজহরি ধীরে ধীরে কপাটটী ভেজাইয়া দিয়া বলিল—"হ্যাঁ, তাই ঠিক।"

"তা হ'লে আজই করবে মনে করেছ ?"

"হ্যাঁ আজই, আর দেরী করা ভাল নয়। কি বল তুমি ?"

"আমিও তাই বলি।"

"তুমি সব ঠিক করে রেখেছ ? আজই তা হলে বেরিয়ে পড়ছ ত ?"

"হ্যাঁ, এই রাত্রেই ; এখন কাযটা হ'য়ে গেলেই হয়। আর সেখানে যখন চাকরী হ'ল, তখন সেখানে থাকাই ভাল।"

"আর এখানে থাকাও ঠিক নয়। ব্যাটা বড় খারাপ লোক, এর পর নিশ্চয়ই পেছনে লাগ্‌বে।"

"সেই জন্যেই ত আরো যাচ্ছি।"

"তোমার মেয়েকে এনেছি, সে এইখানেই আছে।"

"আচ্ছা, বেশ করেছ। তা হলে এখন আমি চল্লুম। তুমি ঘুমিয়ে প'ড় না কিন্তু, আমি কায শেষ করেই এখানে আসব।"

"হ্যাঁ ভাল কথা, তুমি এক কায ক'রো ত। এই কাগজটুকু সঙ্গে রেখে

দাও। বাক্সটা তুমি নিও না, যেখানে আছে সেই খানেই রেখে দিও, খালি হারটা নিও, আর এই লেখা কাগজটুকু সেই বাক্সে রেখে দিও।”

“কেন?”

“দরকার আছে।”

ভজহরি একটু হাসিয়া বলিল—“আচ্ছা।” তারপর—হরেন্দ্রের হাত হইতে কাগজটুকু লইয়া প্রস্থান করিল।

৪

ভজহরি যখন নবগোপালবাবুর বাটীতে প্রবেশ করিল, তখন রাত্রি মাত্র ৮টা। নবগোপালবাবু পুত্রকন্যাকে দুইপার্শ্বে লইয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় আহারে বসিয়াছিলেন, আর গৃহিণী স্নেহলতা সম্মুখে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল। ভজহরি সেখানে গেল না, যেখানে ছিল সেই খানেই দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল কি ভাবিল। চট্ করিয়া একটা উপায় ঠিক করিয়া লইয়া সে একেবারে বারাণ্ডায় উঠিয়া পড়িল। দেখিল, সম্মুখের ঘরের দরজা উন্মুক্ত রহিয়াছে। এদিক ওদিক চাহিয়া সে ত্বরিতপদে গৃহে প্রবেশ করিল। এই ঘর দিয়াও শয়নকক্ষে যাওয়া যায়। ভজহরি সেখানে যাইয়া দেখিল, আলো জ্বলিতেছে। রান্নাঘরের দাওয়ার একপার্শ্বে ঘেঁসিয়া বসিলে এ ঘরটা বেশ দেখা যায়। ভজহরির ভয় হইল, পাছে কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলে। কিন্তু কোন মতেই বিলম্ব করা যাইতে পারে না। ভজহরি সাহসে ভর করিয়া দরজার নিকটে আসিয়া ধীরে ধীরে তাহা ভেজাইয়া দিল; কেহ লক্ষ্যও করিল না।

এখন ভজহরির মাথা হইতে ভয়ের বোঝা কতকটা নামিয়া গেল, ক্ষুদ্র একটী নিশ্বাস ফেলিয়া সে আপনার কার্য্যে অগ্রসর হইল। বিছানার একটা কোণ উল্টাইয়া বড় রকমের একটা চাবী বাহির করিল; সেটা লোহার সিন্দুকের চাবী। ভজহরি সেই চাবীর সাহায্যে সিন্দুক খুলিয়া ফেলিল। ডালা তুলিতেই একটা চক্‌চকে মখমল মোড়া বাক্স তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। বাক্সটা হাতে তুলিয়া লইয়া সে খুলিল। কি সুন্দর হার! নানাবর্ণের পাথরগুলা ভজহরির চক্ষের সম্মুখে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি হারটী তুলিয়া লইয়া হরেন্দ্রপ্রদত্ত কাগজটুকু বাক্সের ভিতর রাখিয়া ডালা বন্ধ করিয়া দিল। পরে বাক্সটী যথাস্থানে রাখিয়া সাবধানে সিন্দুকে চাবী বন্ধ করিল।

কায শেষ হইয়া গেল। ঘরের বাতাসে ভজহরির যেন দম আটকাইয়া যাইতেছিল, ঘর ছাড়িয়া পলাইবার জন্য তাহার মন ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিল। চাবীটা খাটের কোণে রাখিয়া উল্টান বিছানা ঠিক করিয়া দিয়া সে বেগে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল; তখনও রান্নাঘরে হাসিগল্প চলিতেছিল। ভজহরি আর দাঁড়াইল না, সাবধানে প্রাঙ্গণে নামিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

* * * * *

কাল সপ্তমী পূজা, আজ ষষ্ঠী। ছেলে মেয়েরা দলে দলে নূতন কাপড় জামা পরিয়া বাড়ী বাড়ী ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইতেছে। নবগোপালবাবু ডাকিলেন—"ওগো, শান্তিকে একবার এদিকে ডেকে দাও ত, দরকার আছে।"

স্নেহলতা কন্যা শান্তিকে সঙ্গে লইয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল—"কেন, কি দরকার ?"

নবগোপালবাবু বলিলেন—"সেই হারটা আজ ওকে প'র্‌তে দেব। আর মিছে তুলে রেখে কি হবে ?"

স্নেহলতা হারের কথা শুনিতে বা তাহা দেখিতে মোটে ভালবাসিত না। তাই স্বামীর কথা শুনিয়া তাহার রাগ হইল, বলিল—"না, থাক্, ও হার প'রবে না।"

নবগোপালবাবু সিন্দুক খুলিয়া হারের বাক্স বাহির করিয়া বলিলেন—"তোমাকে ত আর পর্‌তে বলছি নে ? ও পরবে না কেন ? আয় ত শান্তি আমার কাছে !"

স্নেহলতা আর দাঁড়াইল না, তখনই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু ঘরের বাহিরে আসিতেই একটা অস্ফুট চীৎকারধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্ত কাল থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিল। ও কি ও ! সে দেখিল, তাহার স্বামী লোহার সিন্দুকে ঠেশ দিয়া পড়িয়া আছেন এবং কন্যা শান্তি শুষ্ক পাণ্ডুর মুখে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। হারের বাক্সটা খোলা পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু হার নাই। ডালার উপর একটুকরা কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া স্নেহলতা তাহা তুলিয়া লইয়া পড়িল—"যার জিনিষ তার কাছেই গেছে।"

শ্রীললিতকুমার সিংহ।

মাতৃত্ব।

মাতার আসন বড় উচ্চে! মাতার ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু জগতে আর আছেন কি না, তাহা বলা বড়ই কঠিন। জননী সন্তানের নিমিত্ত অনাহারেও দিন যাপন করেন। সন্তান যখন গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তিনি গর্ভবেদনার সকল জ্বালা ভুলিয়া গিয়া তাহার মুখাবলোকন করতঃ তৃপ্তিলাভ করেন। দশমাস দশদিন সন্তান উদরে রাখা যে কি কষ্ট, তাহা মাতা ভিন্ন অন্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারেন না। সন্তানের কষ্ট উপস্থিত হইলে মাতা তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত কত দেবতার নিকট কত কি আরাধনা করেন, তাহা ভাবিলে হৃদয় স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ হয়। সেই জন্যই মাতা অত উচ্চাসনে সমাসীনা।

এই স্বার্থপর জগতের মধ্যে মাতার ন্যায় নিস্বার্থভাবে সন্তানকে আর কে ভালবাসিতে পারে? আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বর, যদি মাতার হৃদয়ে অপার করুণা ঢালিয়া না দিতেন, তবে এই জগৎ কোন্ দিন লীন হইয়া যাইত! মাতার হৃদয় হইতে যে করুণার স্রোত মর্ত্তাধামে প্রবাহিত, তাহা স্বর্গের মন্দাকিনীর বারিধারার অপেক্ষাও মধুর। যিনি তাহা উপভোগ করিয়াছেন, তিনি তাহার মর্ম্ম সুন্দররূপে অবগত আছেন। পিতার হৃদয়ে সময়ে সময়ে স্বার্থপরতা ক্রোধ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু মাতার হৃদয়ে ক্রোধ দৃষ্ট হইলেও তাহা সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্ত। পিতা বিমাতার বশীভূত হইয়া সন্তানকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু মাতা তাহা পারেন না। মাতার হৃদয় স্বভাবতঃ কোমল; কোমল হৃদয় আঘাত সহ্য করিতে পারে না। সন্তানকে যখনই অন্য কর্তৃক তিরস্কৃত হইতে দেখেন, তখনই তাঁহার কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগে। যাহার হৃদয় যত কোমল, তাহার হৃদয় তত প্রেম ও আবেগে পরিপূর্ণ। প্রেমের নিকট স্বার্থপরতা দাঁড়াইতে পারে না। নিস্বার্থ প্রেম এমন জিনিষ, তাহা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। প্রায়ই

এই পৃথিবীতে বহুমূল্য হীরকাদি পদার্থ যথেষ্ট পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নিস্বার্থ প্রেম পাওয়া বড়ই দুষ্কর। স্বর্গ দেবতার সমষ্টি লইয়া গঠিত। দেবতার হৃদয়ে স্বার্থপরতা দেখা যায়, ও সেই স্বার্থপরতার জন্য স্বর্গও সময়ে সময়ে কলুষিত হয়। কিন্তু মাতার হৃদয় স্বার্থপরতায় জড়িত নয় বলিয়া, তাহা স্বর্গের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

সন্তানের যাহাতে তৃপ্তি, মাতারও তাহাতে তৃপ্তি; সন্তানের যাহাতে সুখ, মাতারও তাহাতে সুখ; সন্তানের যাহাতে দুঃখ, মাতারও তাহাতে দুঃখ।

অনেকে বলিতে পারেন, সন্তান উপযুক্ত হইলে, অসময়ে মাতাকে রক্ষা করিবে। কিন্তু এমনও সন্তান আছে যে, সে মাতার প্রতি দৃষ্টিপাতও করে না; কিন্তু মাতা নিয়তই তাহার মঙ্গল কামনা করেন।

চন্দ্রকিরণেও তীব্রতা আছে, মাদকতা আছে, মোহ আছে, কিন্তু মাতার স্নেহে তীব্রতা, মাদকতা বা মোহ নাই। মাতার হৃদয় সর্ব্বদাই সন্তানের হৃদয়ে স্নেহ বর্ষণ করে, তাহা সন্তান উপলব্ধি করিতে পারে না। মাতা অন্যের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারেন, কিন্তু সন্তানের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারেন না। সন্তান যাহাতে উন্নতি লাভ করিতে পারে, মাতা তাহারই চেষ্টা করেন। দশ জনে কিসে সন্তানকে মান্য করিবে, সন্তান কিসে ধার্ম্মিক, সত্যপ্রিয় হইবে, মাতা তাহার চেষ্টা করিতে শোণিত-পাত করেন।

মাতার মধুর বচন শ্রবণ করিলে সমগ্র হৃদয়ের গুপ্ত ভাবগুলি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে। বীণা যেমন কতকগুলি মধুর ও সুশ্রাব্য স্বর-সংযোগে গঠিত, তেমনই মাতার হৃদয় স্নেহ, দয়া, সহানুভূতি, প্রেম, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি সুধাসিক্ত গুণাবলী লইয়া গঠিত। বীণার বিভিন্ন তারে হস্ত প্রদান করিলে, তাহা যেমন বিভিন্ন সুর প্রদান করে, সেইরূপ সন্তানের একবিন্দু অশ্রু মাতার হৃদয়ে সমগ্র ভাবগুলি জাগাইয়া দেয়; মাতা তখন সন্তানের সুখ দুঃখের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন; তিনি আপনাকে আপনি সম্যক্‌-রূপে বুঝিতে পারেন না। অনন্ত নীলাকাশের যেমন সীমা নাই, তাহা যেমন নীরবে অসংখ্য নক্ষত্রমণ্ডল, অনন্ত দৃশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছে; সেইরূপ মাতার হৃদয়েরও সীমা নাই, তাহাও নীরবে অসংখ্য দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করে।

সম্পদ বিপদ, সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি, নিন্দা খ্যাতির মধ্য দিয়া মাতা আপন মহত্ত্ব ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, সেই জন্যই মাতা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের উপযুক্ত পাত্রী। যশের প্রতিও মাতার আকাঙ্ক্ষা নাই, নিন্দার প্রতিও তাঁহার বিদ্বেষ নাই; জ্ঞানের প্রতিও তাঁহার আবেগ নাই, অজ্ঞানতার প্রতিও তাঁহার ঘৃণা নাই; সুতরাং মাতার জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান। মাতার নিকট হইতে আমরা ঐ সকল গুণ ধর্ম্ম শিক্ষা করি বলিয়া ভবিষ্যতে সংসারে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হই; কিন্তু যে মাতা উক্ত গুণের অধি-

কারিণী নহেন, তাঁহার নিকট হইতে কিরূপে সন্তান সৎশিক্ষা লাভ করিবে! শৈশবে মানব-হৃদয় কোমল থাকে, তখন তাহাকে যেদিকে পরিচালনা করা যায়, সেই দিকেই যায়। মাতা যদি সদ্‌গুণশালিনী হন, তবে তিনি তখন হইতেই সন্তানের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, অন্যথা তাহা হইতে পারে না।

মাতার হৃদয়ের সহিত সন্তানের হৃদয়ের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। মাতার হৃদয়ে যে সমস্ত ভাবাবেশ সংঘটিত হয়, সন্তানের হৃদয়েও তাহাই হয়। তাই মাতা সহজেই সন্তানের হৃদয়ে স্থানলাভ করিতে সমর্থ হন এবং সেইজন্যই শৈশবে সন্তানের হৃদয়কে সুধাময় করিয়া তুলিতে পারেন।

পুরুষের হৃদয় স্বভাবতঃ কঠোর হইলেও নারীর সংস্পর্শে আসিয়া, তাহা আবার ধীরে ধীরে কোমল ভাব ধারণ করে। সেই কোমলতা আবার মানবের যন্ত্রণাতাড়িত কঠোর হৃদয়কে ধীরে ধীরে মাতৃত্বের দিকে টানিয়া লইয়া যায়।

প্রাবৃট্‌কালের জলদজালের উপর সৌদামিনী যেমন রঙ্গে ভঙ্গে খেলিতে থাকে, সেইরূপ নারীর হৃদয় নীরস সংসার-যন্ত্রণা-তাড়িত পুরুষহৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

পুরুষ মুক্তাত্মা, যতদিন না নারীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়, ততদিন তাহার উদাসীন ভাব তদীয় হৃদয়ে প্রবলবেগে বহিতে থাকে। তারপর নারীর অপূর্ব্ব রূপ-গরিমায় মুগ্ধ হইলে, অনন্ত সংসারের অনন্ত কোলাহলের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে; আর তাহার উদাসীনতার অস্তিত্ব থাকে না। যে নারী উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সেই নারী মানবকে সংসারে কষ্ট-সহিষ্ণুতা, ধীরতা, স্নেহ, দয়া, মায়া প্রভৃতি গুণরাশি শিক্ষা দিতে সমর্থ। সেই নারী ধীরে ধীরে মানবকে অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে জ্ঞানের মধুর অস্ফুট আলোকে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। স্ত্রী জাতি মানবজাতির মাতা, কেবল যে যিনি গর্ভে ধারণ করেন তিনিই মাতা, তাহা নহে; যে নারী সুন্দর সদুপদেশ দান করিয়া ধীরে ধীরে মানবকে পাপের ভীষণ পথ হইতে ধর্ম্মের মধুর পথে লইয়া যান, তিনিও মাতা।

মাতাই প্রথমে শিক্ষা দেন,—পিতাকে ভক্তি করিতে, তৎপরে অন্যান্য গুরুজনকে ভক্তি করিতে, ভাই বোনকে স্নেহ করিতে, দাস দাসীকে অনুগ্রহ করিতে, প্রতিবেশীর উপকার করিতে, গরিব দুঃখীকে দয়া করিতে, সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে।

সন্তান বিপদে পড়িলে, মাতা আপন তেজস্বিতায় তাহাকে উত্তেজিত করিতে পশ্চাৎপদ হন না।

গৃহধর্ম্মের নিমিত্ত আমাদের যতগুলি সৎশিক্ষার আবশ্যক, আমরা তাহা প্রথমে মাতার নিকট হইতে লাভ করি। তৎপরে ধীরে ধীরে আলোচনার সহায়তায় তাহাদের পুষ্টিসাধন করিতে যত্নতৎপর হই।

জগদীশ্বর, সন্তান গর্ভে জন্মিবার সময় হইতেই, জননীর স্তনদ্বয়ে দুগ্ধ প্রদান করিয়াছেন। যদি তিনি অপার করুণা প্রকাশ না করিয়া জননীর স্তনদ্বয়ে দুগ্ধ প্রদান না করিতেন, তবে এই সুখের ধরাধাম কোন্ দিন লীন হইয়া যাইত। তিনি আমাদের মাতার পিতা ও মাতা দুইই। তাঁহার হৃদয় পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব এই দুই লইয়া গঠিত। সেই জন্যই সন্তানে জন্মিবার পূর্ব্বেই মাতার হৃদয়ে অনন্ত করুণার অনন্ত স্রোত চালিয়া দিয়াছেন। তাই সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেই, তাহার রক্ষার উপায় হয়। অতএব মাতার মাতৃত্বের ভিতর দিয়াই যেন আমরা অপার করুণাময় অনন্ত জ্ঞানের আধার অনন্ত জগতের পিতা ও মাতা জগদীশ্বরকে ভক্তি করিতে সমর্থ হই।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী।

শীত ও গ্রীষ্ম।

—ঃ*ঃ—

শীত কহে, "গ্রীষ্ম তুমি অতি দুরদান্ত,
তব তাপে জীবগণ হয় বড় ক্লান্ত;
কে যায় আরামে নিদ্রা প্রতাপে তোমার?
সহে গো যাতনা বহু তব তাপে নর"।
গ্রীষ্ম বলে, "শীত, তব শীতল শরীর,
কথাগুলি করে মোর শ্রবণ বধির;
দীনগণ লভে শান্তি আমার আশ্রয়ে
আমি না থাকিলে তারা যেত যমালয়ে"।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

নুরজাহান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩)

যাহার ভাগ্যে রাজানুগ্রহ-লাভ ঘটে, সংসারে তাহার আর ভাবনা কি? সম্রাটের অনুগ্রহে তৎপরবর্ত্তী দিবসেই গিয়াস্‌বেগ রাজ-সরকারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই স্বকীয় কৃতিত্বগুণে সাধারণ অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইলেন। এইভাবে রাজ-সরকারে সম্মানজনক পদ লাভ করিয়া গিয়াস্‌বেগ আপন পদোচিত কর্ত্তব্য এরূপ নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদন করিতে লাগিলেন যে, সম্রাট্ তিন বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের নেতৃত্বপদ প্রদান করিলেন। ইহার এক বৎসর পরে গিয়াস্‌বেগ রাজকীয় ভবনের গৃহকার্য্য সম্বন্ধীয় কর্ত্তা হইলেন এবং পঞ্চদশ বৎসর পরে সম্রাট্ কর্ত্তৃক "ইৎমাদ্—উদ্-দৌলা" এই মহা গৌরবজনক উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইলেন। বলা বাহুল্য, এই উপাধির অর্থ "অতুল রত্নের অধিকারী"। কি আশ্চর্য্য! পঞ্চদশবর্ষ পূর্ব্বে যে ব্যক্তি বৃক্ষলতাগুল্মপরিশূন্য মরুভূমির মধ্যে বন্ধু-বান্ধব-বিহীনাবস্থায় অনশনে প্রাণত্যাগে উদ্যত হইয়াছিলেন, আজ সেই ব্যক্তি সম্রাট্ আক্‌বরের রাজদরবারে সবিশেষ গণ্য মান্য ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

পাঠক! চলুন, একবার আমরা ইত্যবসরে সেই মরুভূমিজাতা ক্ষুদ্র শিশুটীর সন্ধান করি। একদিন যে সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে তাহার জনকজননী পথিমধ্যে পরিত্যাগ করিয়াছিল, আজ সেই শিশু আর কোমলপ্রাণা, অর্দ্ধস্ফুটভাষিণী শিশু নহে। আজ সেই শিশু পৌর্ণমাসীর শশধরের ন্যায় সহাস্যমুখী। তাহার আয়ত চক্ষুর্দ্বয়, বর্ত্তুল গ্রীবাদেশ, ললিত পদ-বিক্ষেপ আর চারুমুখে মধুর হাসি দেখিলে আজ মুনি-ঋষিরও ধ্যান ভঙ্গ হয়। পঞ্চদশবর্ষীয়া মেহের-উন্নিষা আজ বর্ষার প্রথমোচ্ছ্বাসময়ী তরঙ্গিণীর ন্যায় আপন রূপ-তরঙ্গে টলটলায়মানা। আহা! সেই অতুলনীয় রূপের সাজি—সেই বিম্বাধরে মৃদু মধুর হাসি আর সেই লজ্জামাখা রসনায় কোকিলবিনিন্দিত স্বর যে একবার দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে, এ সংসারে বুঝি সে-ই ধন্য—সে-ই কৃতার্থ!

একদিন প্রভাতকালে পূর্ব্বাকাশে যখন বালভানুর [illegible] সুর-বিন্দু-নিভ

কিরণরাশি ঘনান্তরালের মধ্য দিয়া উঁকি মারিতেছিল, আর অদূরে কুঞ্জবনের মধ্যে বসিয়া স্বভাবমুগ্ধা পিকবধূ "কুহু" তানে জগৎ মোহিত করিতেছিল, তখন—সেই সুশীতল, সুস্নিগ্ধ প্রভাতকালে মোগল বাদশাহের অন্তঃপুরের মহিলাগণ একটী রম্য কাননে "মিনাবাজার" বসাইবার জন্য সম্মিলিতা হইলেন। এই অমরাবতীসদৃশ, নন্দনকাননপ্রতিদ্বন্দ্বী কাননের শোভা আর কি বর্ণন করিব? ইহার কোথাও বা সুগন্ধি কুসুম-বৃক্ষ-নিচয় নানা-জাতীয় কুসুম-গন্ধ বিকীর্ণ করিয়া সমস্ত কাননটীকে ভরপুর করিয়াছে, কোথাও বা স্বচ্ছতোয়া-নির্ঝরিণী কুল কুলু নাদে কি এক অব্যক্ত গীতি গাহিতেছে, আবার কোথাও বা সরোবর-সোপানে সুন্দরী রমণীগণ রূপের হাট মিলাইয়া বসিয়া আছে।

এই উদ্যানের এক পার্শ্বে স্বয়ং দিল্লীশ্বর আকবর মহিষীর সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতে করিতে উদ্যানের রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার অশেষ প্রশংসা করিতেছেন, আবার কখনও বা উদ্যানের নয়নরঞ্জক পদার্থপুঞ্জ দর্শন করিয়া ভাবে আত্মহারা হইতেছেন। আমার বিশ্বাস, যদি সেই উদ্যানে সেই সময়ে কোন কবি গমন করিতেন, তবে তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতেন "ভূমিতলে ইহাই স্বর্গ"।

সমগ্র উদ্যানটী আনন্দ কোলাহলে মুখরিত। ইহার কোথাও বা সুন্দরী তন্বঙ্গীসকল সুমধুর স্বরে সঙ্গীত করিতেছে—কোথাও বা প্রগল্‌ভা বালিকা-গণ হাস্য করিতেছে, আবার কোথাও বা কোন কোন প্রফুল্লমুখী কুসুম-বৃক্ষে মনের আনন্দে ঝুলন খেলিতেছে। আমাদের আখ্যায়িকোক্ত মেহের এবং তাঁহার মাতাও এই আনন্দের অংশ-গ্রহণে বিরতা ছিলেন না। মেহের-জননী যখন সমাগতা বেগমদিগের সহিত মধুর আলাপে নিমগ্না ছিলেন, মেহের তখন সেই উদ্যানমধ্যস্থ একটী নির্ঝরিণীমধ্যে চরণযুগল আজানু ডুবা-ইয়া দিয়া নিবিষ্টচিত্তে কি যেন কি ভাবিতেছিলেন। তখন যদি কেহ সেই মস্‌লিন বস্ত্রে অবগুণ্ঠনবতী, ব্রীড়াবনতা, অনিন্দ্যসুন্দরী মেহেরকে দর্শন করিতেন, তখন তিনি তাহাকে স্বর্গচ্যুতা কোন দেবকন্যা বলিয়া ভ্রমে পতিত হইতেন।

মেহের নির্ঝরিণীর নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ধীরপদবিক্ষেপে উদ্যানের গুপ্তদ্বার দিয়া একটী অষ্টাদশবর্ষীয় সুন্দর, সুঠাম তরুণ যুবক উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবকের বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, উরুদেশ স্থূল এবং

আকৃতিও নাতিদীর্ঘ নাতিক্ষীণ। তাঁহার ললাটে কৃষ্ণকুন্তলদাম কুঞ্চিতাকারে পতিত হইয়াছে; তাঁহার নেত্রদ্বয়—অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিযুক্ত। তাঁহার অধরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তদীয় হৃদয়নিহিত, দৃঢ় সংকল্প স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। পাঠক বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই সুপুরুষ স্বয়ং সম্রাট্ আকবরের প্রিয় পুত্র সেলিম। সেলিম কথা বার্ত্তায় কতকটা উদ্ধতস্বভাব-সম্পন্ন হইলেও লোকের সহিত আচরণে অতি নম্র ও অতি ভদ্র। আমোদ প্রমোদ ও সুরাপান সেলিমকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি উদ্যানমধ্যে পাদচারণা করিতে করিতে যেখানে চিন্তাবিষ্টা মেহের বসিয়া ছিলেন, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যুবরাজকে আসিতে দেখিয়া মেহের তাড়াতাড়ি অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিলেন এবং একটু সরিয়া গেলেন। নির্ঝরিণীর অনতিদূরে কয়েকটী সুগন্ধি সুদর্শন পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, সেলিমের মন সেই পুষ্পচয়নে ব্যাকুল হইল। কিন্তু তাঁহার হস্তে দুইটী কবুতর থাকায় তিনি পুষ্প চয়ন করিতে পারিতেছিলেন না। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি দেখিলেন—নির্ঝরিণীর নিকট মেহের বসিয়া আছেন, তখন তিনি ধীরে ধীরে তাহার নিকট গিয়া বলিলেন, "ভগ্নি। তুমি কিছুক্ষণের জন্য এই কবুতর দুইটা রাখ, আমি কয়েকটা ফুল তুলিয়া আনি?" মেহের সেলিমের কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে কোমল করযুগল বাহির করিয়া কবুতর দুইটী গ্রহণ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেলিম ফিরিয়া আসিয়া কবুতর দু'টী চাহিলেন, কিন্তু মেহের কথা না বলিয়া হাত তুলিয়া কেবল একটীমাত্র কবুতর উঠাইলেন।

যুবরাজ বলিলেন, একি! আর একটী কবুতর কোথায় গেল?

ভয়বিজড়িত কণ্ঠে মেহের উত্তর করিলেন,—'উড়িয়া গিয়াছে।'

যুবরাজ ঈদৃশ উত্তরে একটু রাগান্বিত হইয়া বলিলেন "কিরূপে?"

মেহের বলিলেন—"এইরূপে"—এই বলিয়া তিনি হস্তস্থিত অন্য কবুতর টীকেও উড়াইয়া দিলেন। মেহের যে সময় কবুতরটীকে উড়াইয়া দিতে-ছিলেন, সেই সময় তাঁহার মুখাবগুণ্ঠন অপসৃত হওয়ায় তদীয় কমল মুখ-খানি সেলিমের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেলিম সেই দেবজনবাঞ্ছিত, অপ্সরা-রূপাবনিন্দিত মূর্ত্তিখানি দেখিয়া কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মেহের বলিলেন। "আমায় ক্ষমা করুন, কবুতরটী আমি

ইচ্ছা করিয়া উড়াইয়া দিই নাই।" এই কথা বলিবার সময় মেহেরের গণ্ডস্থল লজ্জায় আরক্তিম হইল, তিনি আর অধিক কথা বলিতে পারিলেন না।

যুবরাজ বলিলেন, "আর আমার কবুতরে প্রয়োজন নাই, এখন বল দেখি সুন্দরি, তুমি কি স্বর্গ হইতে ছল করিতে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণা হইয়াছ?"

মেহের সে কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া বলিলেন, যুবরাজ! আমার পিতা মির্জ্জা গিয়াস্‌বেগ "ইত্‌মদ্—উদ্দৌলা"। আমি এখন আমার মাতার নিকট যাই—এই বলিয়া মেহের গমনোদ্যতা হইলেন।

যুবরাজ সেলিম তাঁহার করকমল ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "সুন্দরি! তুমি আমার হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছ। তুমি আর একটু অপেক্ষা কর, আমি একবার প্রাণ ভরিয়া তোমার রূপ-সুধা পান করি।"

মেহের সেলিমের হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "যুবরাজ, আমাকে যাইতে দিন।"

যুবরাজ কাতরস্বরে বলিলেন, "সুন্দরি! আমাকে প্রাণে মারিও না।"

মেহের বলিলেন—"যুবরাজ, এইভাবে আমার গতিরোধ করিবার আপনার কোন অধিকার নাই।"

সেলিম বলিলেন, সুন্দরি! তোমার ঐ প্রেমোদ্ভাসিত দৃষ্টি—ঐ মুহুর্মুহুঃ কটাক্ষ আমার হৃদয় মথিত করিয়াছে। সুন্দরি! আমি তোমাকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছি, আমার এই ভালবাসার হেম-হার তুমি ছিঁড়িবার পূর্ব্বে আমার হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়িয়া ফেল।

মেহের এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া অধোমুখে দণ্ডায়মানা রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মেহের বলিলেন, "যুবরাজ! আমার সহিত বিদ্রূপ করা আপনার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে।"

সেলিম বলিলেন, "কখনও নহে। সুন্দরি! আমি তোমার সহিত বিদ্রূপ করিতেছি না। আজ হইতে তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী—প্রাণের আরাধ্য দেবতা—জীবনের ধ্রুব তারা।

মেহের বলিলেন, যুবরাজ! আমি দরিদ্রের কন্যা, আমি আপনার তামাসার যোগ্যপাত্র নহি।"

সেলিম বলিলেন, "অধিক আর কি বলিব সুন্দরি, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার প্রাণেশ্বরী—আজ হইতে তুমিই আমার জ্ঞান—

তুমিই আমার ধ্যান—চিরদিন হৃদয়-মন্দিরে তোমারই প্রতিমা স্থান পাইবে!"

মেহের সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "যুবরাজ, আমাকে আমার মাতার নিকট যাইতে অনুমতি দিন?"

যুবরাজ বলিলেন, "অনুমতি! সে কি কথা সুন্দরি? আজ হইতে আমিই তোমার আজ্ঞাধীন। সুতরাং এক্ষেত্রে তোমার যাহা অভিপ্রায়, তাহাই করিতে পার।"

মেহের কি জানি কি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। অদূরে নির্ঝরিণীর কল কল জলোচ্ছ্বাসের নিস্বন ভিন্ন অন্য কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না। সেলিম ও মেহের দু'জনেই নির্ব্বাক—দুজনেই নিস্পন্দ! সে দৃশ্য দেখিয়া কণ্ব-আশ্রমে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার দর্শন-দৃশ্য স্মৃতিপথে জাগরিত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

বঙ্গলক্ষ্মী।

১

গুণ্ঠন মাঝে চাহনিটুকু দেখিয়া চিনেছি কে তুমি বামা?
আঁধার রাতির দীপ্ত তারা! বঙ্গ-গৃহের মনোরমা!
দেবী তুমি! নারী তুমি! মহান্ তুমি মহান্ মাঝে।
বন্দি তোমায় ধন্য করি ধন্য তুমি হিয়ার মাঝে!

২

অর্ঘ্য করে শুচি-স্নাত পূজার গৃহে ভোরের বেলায়—
যখন তোমার যাত্রা সুরু, নূপুরগুলি কোমল পায়
কেমন কোমল সুরে বাজে সুর বাহারের মূর্চ্ছনায়—
ফুলেরা সব শিউরে চাহে ভোরের হাওয়া ওম্নি বায়।

৩

চীনাংশুকের দিব্য ভাতি নাই যদিও অঙ্গে বটে,
অঙ্গরাগের সুপ্ত রাগে কান্নাপুরি চাঁদের হাটে!
আলতা পরা চরণ দুটী শাখা হাতে ভাগ্যবতী!—
শাড়ীখানি অঙ্গবেড়া লক্ষ্মী যেন মূর্ত্তিমতী।

৪

জন্ম হ'তে কেবলি ব্রত স্বামী ও পুত্রকন্যা লাগি—
মৃত্যু শিয়রে তাদেরি শুভ দেবতা-চরণে নিয়েছ মাগি।
আপনা লাগিয়া চাওনিত কিছু আপন হারায়ে আছো।
স্বরূপ তোমার কেমনে আঁকি, অন্নপূর্ণারূপে যে রাজো!

৫

বিশ্ব লইয়া পেতেছ ঘর, বক্ষে কত কতই স্নেহ!
মুছায়ে দিতেছ যাতনার জল, ঘরে ঘরে অহরহঃ—
একটী দিনেও নাহিক কুণ্ঠা একটী দিনেও নাহিক শ্রান্তি
তোমারি দুয়ারে বসতি করিয়া ধন্য হয়েছে শান্তি—

৬

করুণায় ভরা করুণাময়ী চিনেছি তোমার অমল হাসি—
শারদাকাশ হইতে ভাসি ধবল গাঙে জ্যোৎস্না-রাশি।
গর্ব্ব তুমি দীনের ঘরে "মুক্তা খনির গর্ভ ভূষা
তোমারি অধর-রক্ত-রাগে লাজে রাঙে সন্ধ্যা উষা।

৭

স্বপ্ন-দেশের অপ্সরা সে শুনি বটে মানস-হরা
এমন পল্লী-বাটে নদীর ঘাটে রয় কি মূর্ত্তি সালঙ্কারা।"
(ও যাঁর) চরণক্ষেপে পদ্ম ফোটে, হাস্যে ঝড়ে মুক্তাধারা—
কৃষ্ণ কেশের মুক্তা-দামে কাজল মেঘের তিমিল-ধারা।

৮

কমল তুমি! কোমল তুমি! প্রবল তুমি মায়ার ডোরে—
তোমায় হেরে ভক্ত হৃদি শতদলে মুঞ্জরে।—
ব'লতে কথা, ফুরায় কথা! মর্ম্মে উঠে কতই গাথা।—
স্বর্গ এসে মর্ত্ত্যে নামে, তোমার পূজা হয় গো যেথা।
বেঁচে থাকো সুখে থাকো শান্তি তোমায় রহুক ঘিরে!—
কালো রূপে ভুবন আলো আমাদের এই ঘরে ঘরে॥

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ।

অভিনেত্রীর বিপদ।

মিস্ ফ্লোরা ওরফে ম্যাডাম বুকাম্প লণ্ডনের মধ্যে একজন সুরসিকা, সুগায়িকা, অভিনয়-পটীয়সী নৃত্যকুশলা ও সুন্দরী। ইঁহার মত সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী লণ্ডনের কোন নাট্যশালায় দৃষ্টিগোচর হইত না। ইঁহার সংসারের মধ্যে রুগ্ন স্বামী ও উভয়ের নয়নানন্দ একটীমাত্র পুত্র ও দুইজন ধাত্রী ইত্যাদি। একমাত্র ফ্লোরার উপায়েই সকলেই প্রতিপালিত।

ফ্লোরা গেইটী থিয়েটারের একজন স্বনামধন্যা অভিনেত্রী। যে দিন ফ্লোরার নাম বোর্ডে উঠে, সে রাত্রে নাট্যশালায় জনতা এত অধিক পরিমাণে হয় যে, শান্তিভঙ্গ আশঙ্কায় নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষকে দস্তুরমত পুলিশের সাহায্য লইতে হয়। ফ্লোরা সপ্তাহে চারি দিন অভিনয় করেন। এই চারিদিনেই ফ্লোরার দৌহিত্র কর্ত্তৃপক্ষগণ সাতদিনের কামান কামাইয়া লন। ফ্লোরাকে পাইয়া গেইটী থিয়েটারের যে নামোজ্জ্বল হইয়াছে, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন!

ফ্লোরার অভিনয় দেখিয়া ফ্লোরার জন্য কত যুবক উন্মত্ত। কত লক্ষপতি কোটীপতি ফ্লোরাকে লাভ করিবার জন্য কতরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন ও কত দিকে কত অর্থ জলের ন্যায় ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু ভাগ্যবিধাতা তাহাদের মধ্যে কাহাকেও সফলমনোরথ হইতে দেন নাই; ফ্লোরার চরিত্র অতি নির্ম্মল। একমাত্র স্বামী ভিন্ন ফ্লোরা অপর পুরুষকে কখন কোন দিন প্রেমের চক্ষে দেখেন নাই। যদিও স্বামী রুগ্ন, তথাপি স্বামীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য ফ্লোরা সদাই সচেষ্ট। রুগ্ন স্বামীর প্রতি কখন কোনদিন কোন রূপ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন নাই বা মনোমধ্যে স্থান দেন নাই। স্বামীর মুখ দেখিয়া, পুত্রের মুখ দেখিয়া, দাস-দাসীর মুখ দেখিয়া ফ্লোরা সর্ব্বদাই প্রফুল্লিতা। সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নিকট স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

ফ্লোরার স্বামী মিষ্টার বুকাম্প রোগ-শয্যায় রোগ-যন্ত্রণায় ফ্লোরাকে কতদিন কত কটু কহিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধিমতী সরলা ফ্লোরা কিছুতেই কর্ণপাত না করিয়া আরও যত্নের সহিত স্বামীর পরিচর্য্যা করিয়াছেন। সন্তানের মুখের দিকে চাহিয়া, স্বামীর প্রেম ও ভালবাসায় মুগ্ধ হন। স্বামীকে দেবতা-স্বরূপ জ্ঞান করেন।

আমাদের দেশে অভিনেত্রীর নাম শুনিলে, অনেকেই ঘৃণায় নাসিকা

কুঞ্চন করেন ও তৎসংক্রান্ত কথায় যোগদান না করিয়া অপর কথার অব তারণা করিয়া থাকেন। কারণ, আমাদের দেশের অভিনেত্রী তাহার সুনাম অর্জ্জন করিলেও লোকের চক্ষে সে ঘৃণিতা, কুলটা ভিন্ন আর কিছুই নয; কিন্তু বিলাতের অভিনেত্রী ও আমাদের দেশের অভিনেত্রী এই দুইএর স্থান ও মর্য্যাদা সম্পূর্ণ বিপরীত। বিলাতের অভিনেত্রীগণ সময়ে সম্ভ্রান্ত ধনকুবেরের সুনজরে পড়িয়া তাঁহাদের পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে পড়া গিয়াছে—অমুক ডিউকের সহিত অমুক অভিনেত্রীর বিবাহ হইয়াছে; অমুক আর্লের সহিত অমুক অভিনেত্রীর বিবাহ হইয়াছে। যে দেশের যে পদ্ধতি। আমাদের দেশের পদ্ধতি একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ আমাদের দেশের অভিনেত্রীগণ অজ্ঞাত-কুল-শীলসম্পন্না, কে তাহাদের বিবাহ করিবেন! সুতরাং সমাজ তাহাদের বিরূপ। এমন কি, লোক-লোচনের বহির্ভূত হইয়া থাকিলেও, আমরা অভিনেত্রীকে বিবাহ করিতে পারিব না। বিলাতের—ভদ্রঘরের মেয়েরা অভিনয়কলা-পটীয়সী হইবার জন্য নাট্যশালায় যোগদান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভবিষ্যৎ আশা এই যে, তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে চাইকি কোন সম্ভ্রান্ত ধনবানের পত্নী বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন। অভিনয়ে সুনাম অর্জ্জন করিলে, বিশেষতঃ ধনীর দল তাঁহার প্রতি সর্ব্বাগ্রে শুভ-দৃষ্টিপাত করিবেন।

ফ্লোরার ভাগ্যে কিন্তু ধনী স্বামী-লাভ হয় নাই। উভয়ের অবস্থান অনুরূপ উভয়েই লাভ করিয়াছেন। এখন ফ্লোরা অভিনয় কৌশলে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, তাই বলিয়া কি ফ্লোরা স্বামী ভিন্ন কোন পর-পুরুষের অনুরাগিণী? না—তাহা কখনই নয়। অনেক ধনী ব্যক্তি তাহার প্রতি অনুরাগ ও আসক্তির ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাকে নানারূপ প্রলোভনে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই কেহই সফলমনোরথ হইতে না পারিয়া, ভগ্নমনে ফ্লোরার আশা সকলকেই ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

একদিন রিহিয়ার স্থাল ভাঙ্গিবার কিছু পূর্ব্বে নাট্যশালার অধিকারী মিষ্টার পলের নিকট হইতে পত্রবাহক একখানি পত্র লইয়া ফ্লোরার নিকট উপস্থিত হইল; ফ্লোরা পত্রখানি পাঠ করিয়া পত্রবাহককে বিদায় দিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বোধ করি মিঃ পল অন্য কোন নূতন নাটক শীঘ্রই অভিনয়ের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন! তাই বুঝি তাহার এত জরুরি

ডাক পড়িয়াছে। যাহা হউক, ফ্লোরা আপন কার্য্য সারিয়া মিষ্টার পলের সহিত দেখা করিতে গেলেন—মিষ্টার পলের প্রাইভেট চেম্বারে! মিঃ পল ও তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী মিষ্টার ইভান্স উভয়ে ফ্লোরারই সম্বন্ধে নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন; মিঃ ইভান্স ফ্লোরার উপর মিঃ পলের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন; পাক প্রকারে তাহার মুখ হইতে ফ্লোরা সম্বন্ধে অনেক কথা বাহির করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু কি করিবেন—মনিবের কথার উপর কথা বলা একান্ত নীতিবিরুদ্ধ ও অকর্ত্তব্য, এই বিবেচনায় তিনি মিষ্টার পলকে কোনরূপ সদুপদেশ দিতে সমর্থ হইলেন না; মনিবের ভাগ্যলক্ষ্মী যে শীঘ্রই তাহার নিকট হইতে বিদায় লইবেন, স্থির জানিলেন; ফলতঃ তাহাই ঘটিল। ফ্লোরা মিষ্টার পলের প্রাইভেট চেম্বারে প্রবেশ করিয়াই উভয়কে অভিবাদন করিলেন ও তাহাকে এইরূপ অসময়ে ডাকিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন।

মিষ্টার পলের ইঙ্গিতানুসারে মিষ্টার ইভান্স তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু অসহায়া রমনীকে ভাবী বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সন্নিকটেই দণ্ডায়মান হইয়া সদুপায় স্থির করিতে লাগিলেন। এদিকে মিষ্টারপল ফ্লোরার উপর এতদূর আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাহাকে দেখিবামাত্রই আপনার পার্শ্ববর্ত্তী কোচের উপর বসিতে নির্দ্দেশ করিলেন! ফ্লোরা এই অসম্ভাবিত আহ্বানে কতকটা অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু পলের দুরভিসন্ধির বিষয় কিছুমাত্র বুঝিতে পারিল না; সুতরাং মনিবের কথানুযায়ী কার্য্য করিলেন! ফ্লোরাকে সম্পূর্ণ নিকটে পাইয়া মিষ্টার পল তাহাকে চুম্বন করিতে উদ্যত হইলেন। পলের এইরূপ ব্যবহারে ফ্লোরা যারপরনাই আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন ও তৎক্ষণাৎ আপন আসন পরিত্যাগ করিয়া নিজ মান সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য যত্নবতী হইলেন। ফ্লোরা পলকে বাধা দিয়া কহিলেন, মিষ্টার পল! আপনার অসৌজন্যে আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও লজ্জিত হইলাম; আপনি জানেন আমি বিবাহিতা! আমার স্বামী বর্ত্তমান! আপনি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ হইয়া জানিনা আজ কি সাহসে আমার প্রতি অসদ্ব্যবহারে উদ্যত হইয়াছেন? আমি চলিলাম—আপনার এ দুরভিসন্ধি পূর্ব্বে বুঝিতে পারিলে কখনই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতাম না। মিষ্টার পল ফ্লোরাকে বাধা দিয়া তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন ও যাহাতে গৃহ পরিত্যাগ করিতে না পারে, সেইজন্য

জোর করিয়া তাহার হাত দুখানি ধরিয়া রহিলেন। ফ্লোরা আসন্ন বিপদে যতদূর সাধ্য আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট রহিলেন এবং পিশাচের কবলমুক্ত হইবার জন্য বল প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না; মিষ্টার পল ফ্লোরাকে নানারূপ প্রেমের কথা কহিতে লাগিলেন ও ফ্লোরার জন্য তিনি যে কত কাতর, তাহা জানাইতে লাগিলেন। ফ্লোরা কিছুতেই কর্ণপাত না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—আমাকে ছাড়ুন। নতুবা আপনি সমূহ বিপদে পতিত হইবেন। বাহিরে মিষ্টার ইভান্স এতক্ষণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কি করিবেন ভাবিতেছিলেন। ফ্লোরার চীৎকারে তাঁহার চমক একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; প্রভুর বিনানুমতিতে তিনি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; ইভান্সকে দেখিয়া পিশাচ পল ফ্লোরার হাত ছাড়িয়া দিল; ফ্লোরা বিদ্যুৎগতিতে গৃহের বাহিরে আসিয়া পলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "পিশাচ, নরকের ঘৃণিত কীট! আজ হইতে তোমার নাট্যশালায় পদাঘাত করিয়া চলিলাম; আর তোমার সহিত দেখা হইবে না। তুমি যখন রমণীর সম্ভ্রম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ, আর তোমাকে বিশ্বাস নাই। মন হইতে এরূপ বাসনা ত্যাগ কর, নতুবা তোমার সমূহ বিপদ নিশ্চিত জানিও; ইহা বলিয়া ফ্লোরা প্রস্থান করিলেন! ফ্লোরার প্রতি পলের এইরূপ ব্যবহার ক্রমে জানিতে পারিয়া অপরাপর সকলেই একে একে নাট্যশালা ত্যাগ করিলেন ও অন্যান্য রঙ্গমঞ্চে যোগদান করিবার জন্য কৃত-সংকল্প হইলেন। পলের ভাগ্যলক্ষ্মী পলকে ত্যাগ করিলেন; সেই দিন হইতেই গেইটীর অভিনয় বন্ধ হইল।

সকলের এইরূপ ব্যবহারে পিশাচ পল যারপর নাই ভীত ও রাগান্বিত হইয়া মিষ্টার ইভান্সকে বলিল, মিষ্টার ইভান্স! সকলের এগ্রিমেণ্ট বাহির কর। দেখি সময় উত্তীর্ণ না হইতেই কে কোথায় যোগদান করিতে সমর্থ হয়! মিষ্টার ইভান্স পলের আদেশানুসারে সমস্ত এগ্রিমেণ্ট বাহির করিলেন! পল সকলের এগ্রিমেণ্ট দেখিয়া একেবারে কপালে চক্ষু তুলিয়া ইভান্সকে বলিতে লাগিলেন, মিষ্টার ইভান্স? ইহাদের মধ্যে ভাল ভাল অভিনেতা ও অভিনেত্রীরইতো এগ্রিমেণ্টের সময় ফুরাইয়া গিয়াছে;' এখন উপায়! ফ্লোরার ত এগ্রিমেণ্ট দেখিতেছি অনেক দিনই অতীত হইয়া গিয়াছে! এখন কি করিব বল দেখি?

মিষ্টার ইভান্স বলিলেন, আমি তো আপনাকে এ সম্বন্ধে অনেক দিন ও

অনেকবার বলিয়াছি—আপনি তখন আমার কথায় আদৌ কর্ণপাত করেন নাই; এখন আমি কি করিব বলুন। পলের উপর মিষ্টার ইভান্সও যারপর-নাই রুষ্ট হইয়াছেন, তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আরও বলিয়া উঠিলেন;—আপনার এরূপ অসদ্ব্যবহারে কে আপনার অধীনে কর্ম্ম করিবে বলুন; গেইটীর বিজয় নিশান কেবল আপনারই দোষে আজ হইতে লোপ পাইল! যদিও আপনাতে আমাতে চাকর মনিব সম্বন্ধ—আপনার কথার উপর, আপনার কার্য্যের উপর অভিমত প্রকাশ করা যদিও আমার ক্ষমতার বাহিরে, তথাপি ন্যায়সঙ্গত কথা আমাকে কহিতেই হইবে; আপনার সহিত এই সমস্ত বিষয় লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা করা আমার কর্ত্তব্য নয় ও আমার ইচ্ছাও নয় জানিবেন। আমাকেও বিদায় দিন—আজ হইতে আমিও আপনার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া চলিলাম; জানিবেন, একমাত্র ফ্লোরার অবমাননাতেই আপনার হাতে গড়া বড় সাধের সাজান বাগান মরুভূমিতে পরিণত হইল; এই বলিয়া মিষ্টার ইভান্স পলের গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন!

মিষ্টার পল প্রমাদ গণিল; দেখিল সকলেই তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! পল বলিয়া উঠিল, যাও সকলেই যাও, আমি কাহাকেও চাহি না; যদি পারি আবার নূতন নূতন উদ্যমে নূতন অভিনেতা অভিনেত্রীর সহিত গেইটীর অভিনয় আরম্ভ করিব! নয় ত একমাস লোকসান হইবে, লোকসান দিব; এত দিন লাভ খাইয়া আসিয়াছি, নয় সেই লাভের অংশ হইতেই কিছু লোকসানের খাতায় খরচ লিখিব; আমি মিষ্টার পল! দেখিব কোন থিয়েটার আমার মত অধিক বেতনে অভিনেতা অভিনেত্রী নিযুক্ত করে! কিন্তু একটী কায; ফ্লোরাকে যে কোন প্রকারে অশেষ বিপদে ফেলিতেই হইবে। আজ সে আমার যে অপমান করিয়াছে, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য যদি আমি সর্ব্বস্বান্ত হই, তাহাও শ্রেয়; তথাপি আমি এ অপমানের প্রতিশোধ লইবই লইব! একমাত্র ফ্লোরার জন্যই আমাকে এত অপমান সহিতে হইয়াছে, আমাকে আরও লোকসান সহিতে হইবে! আমি ফ্লোরাকে উচিত মত শিক্ষা দিয়া তবে পুনশ্চ অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব! ইত্যাদি বলিয়া মিষ্টার পল ফ্লোরার সর্ব্বনাশের জন্য আপন মনে নানারূপ দুরভিসন্ধি খাটাইতে লাগিল!

এ দিকে ফ্লোরা গেইটী থিয়েটার ত্যাগ করিয়াছে শুনিয়া নিউইয়র্কের মিউনিসিপাল থিয়েটারের এজেণ্ট মিষ্টার কেলি কাল-বিলম্ব না করিয়া

ফ্লোরাকে নিউইয়র্কে লইয়া যাইবার জন্য মাসিক ৬০০০ ডলার বেতনে তিন মাসের জন্য নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়া ফ্লোরার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ফ্লোরা মিষ্টার কেলির প্রস্তাবে সম্মতা হইয়া এগ্রিমেণ্ট সহি করিলেন ও নির্দ্দিষ্ট দিনে নিউইয়র্ক যাইবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন; যাইবার মধ্যে ফ্লোরা ও মাষ্টার চার্লস ফ্লোরার একমাত্র নয়নানন্দ স্নেহের পুতলি! দুই জন ধাত্রী ও একজন কেয়ার টেকার। মিষ্টার বুকাম্প অপরাপর সকলকে লইয়া লণ্ডনের বাটীতেই অবস্থান করিতে সংকল্প করিলেন; কারণ তিনি চলৎশক্তি-হীন; এরূপ অবস্থায় পত্নীর সহিত গমন করা তিনি বিধেয় বোধ করিলেন না।

ফ্লোরার লণ্ডন ত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যই যে, যে কোন প্রকারেই হউক কিছু দিনের জন্য পিশাচ পলের মুখ-দর্শন না করা। পলকে তিনি এতই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন যে, পলের নাম পর্য্যন্তও শুনিতে ঘৃণা বোধ করেন।

এ দিকে পল ফ্লোরার নিউইয়র্ক যাইবার কথা শুনিয়া পথেই তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে এইরূপ সংকল্প করিতে লাগিল। শিকার পলাইতেছে দেখিয়া পিশাচ কিরূপে স্থির থাকিবে! যাহার উপর এত আক্রোশ, তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে গিয়া যদি নিজেরও সর্ব্বনাশ হয়, তাহাও স্বীকার; তথাপি এরূপ দুরভিসন্ধি মন হইতে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিবে না! পল কাল বিলম্ব না করিয়া গোপনে নিউইয়র্কে যাইবার সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিল; অতি গোপনে ফ্লোরার অনুসরণ করিতে হইবে—অতি গোপনে আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে হইবে—অতি গোপনে আবার লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া অপরাপর সকলকে উচিত মত শিক্ষা দিতে হইবে—আবার গেইটীর উদ্বোধন করিতে হইবে। এইরূপ নানাপ্রকার ভাবিতে ভাবিতে তাহার আহার নিদ্রা ত্যাগ হইল।

ফ্লোরা নির্দ্দিষ্ট দিনে মিষ্টার কেলির সহিত নিউইয়র্কে যাত্রা করিলেন; পলও অপর জাহাজে করিয়া নিউইয়র্কের জন্য লণ্ডন পরিত্যাগ করিল! পিশাচ অবলার কি সর্ব্বনাশ করিতে অগ্রসর, তাহা অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন; তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যে পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী! পরের মন্দ অভিপ্রায়ে থাকিলে আপনার মন্দ যে অগ্রেই ঘটিয়া থাকে, পিশাচ-প্রকৃতি পলের মত মনুষ্য-হৃদয়ে পৈশাচিক কার্য্য সম্পূরণের সময় তাহা আদৌ স্থান পায় না!

যথাসময়ে মিস্ ফ্লোরা বা ম্যাডাম বুকাম্প নির্ব্বিঘ্নে নিউইয়র্কে অবতরণ করিলেন! সহরে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল; প্রতি কাগজে ফ্লোরার প্রতিমূর্ত্তি দিয়া মিউনিসিপ্যাল—থিয়েটার কোম্পানী বিস্তারিত ভাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন; থিয়েটারের অধ্যক্ষ মিষ্টার কেম্প ফ্লোরাকে যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিলেন! ফ্লোরা মিষ্টার কেম্পের অনুকম্পায় প্রাসাদ তুল্য একখানি দ্বিতল বাটীতে আপনার বাসস্থান মনোনীত করিলেন; এখানে ফ্লোরা সকলেরই নিকট মহা সমাদর পাইতে লাগিলেন। অধিক কথা বলিতে কি, ফ্লোরা এখানে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতেছেন। এদিকে পিশাচ পলও যথাসময়ে নিউইয়র্কে আসিয়া ফ্লোরার গতি বিধি অতি গোপনভাবে লক্ষ্য করিতেছে; কি করিয়া কবে ফ্লোরার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, ইহাই পিশাচের উদ্দেশ্য। ফ্লোরা যথাসময়ে রিহিয়ার স্থালে যোগদান করিয়া অভিনেত্রী বৃন্দকে যথারীতি শিক্ষা প্রদান করিতেছেন! ফ্লোরার শিক্ষা-চাতুর্য্যে সকল অভিনেতা অভিনেত্রীই এমন কি থিয়েটারের অধ্যক্ষও একেবারে মুগ্ধ! ফ্লোরা হইতেই যে অতিশীঘ্রই থিয়েটারের নামোজ্জ্বল হইবে, সকলেই এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ফ্লোরার মুখ চাহিয়া আছেন। মিষ্টার কেম্প আপনার মনে নানা আকাশ কুসুমের সৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছেন; তাঁহার মনে স্থির বিশ্বাস হইয়াছে যে, তিনি বারবার যে লোকসান দিয়াছেন, এইবার ফ্লোরা হইতে তাহার চতুর্গুণ লাভ করিয়া লইবেন!

নির্দ্দিষ্ট সময়ে সহরের চারিধার মিউনিসিপাল থিয়েটারের প্লাকার্ডে ছাইয়া ফেলিল, হাটে মাঠে, পথে ঘাটে, ট্রেণে ষ্টিমারে সকলেরই মুখে ফ্লোরার কথা; অভিনয় হইবার তিন দিন পূর্ব্বেই সমস্ত টিকিট বিক্রয় হইয়া গেল; প্রথম রাত্রিতে ফ্লোরার অভিনয় দর্শনে কতলোক বিফলমনোরথ হইয়া দ্বিতীয় রজনীর জন্য তখন হইতেই টিকিট সংগ্রহ করিতে লাগিল, সহরময় এক মহাহুলস্থুল পড়িয়া গেল।

অদ্য মিউনিসিপাল থিয়েটারে ফ্লোরার প্রথম অভিনয় রজনী; ফ্লোরা সন্ধ্যার পরই অপ্সরী-বিনিন্দিত সাজ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া একবার স্নেহের পুত্তলী চার্লসকে স্নেহভরে কোলে লইলেন ও বলিলেন বাবা; ভগবানের নিকট একবার আমার সুনামের জন্য প্রার্থনা কর দেখি! বালক জানু পাতিয়া করযোড়ে মাতার উদ্দেশ্যে ভগবানের নিকট কাতরে প্রার্থনা করিল; ইহা দেখিয়া স্নেহময়ী মাতার প্রাণে কি যেন এক নূতন আনন্দের লহরী উঠিল!

ফ্লো'রা পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে ধাত্রীর নিকট দিয়া ঈশ্বরের নাম লইয়া থিয়েটারের অভিমুখে চলিলেন, সঙ্গে একজন মাত্র দাসী রহিল। বাটীর বাহিরে মোটরকার অপেক্ষা করিতেছে—কতলোক ফ্লোরার বাটীর সম্মুখে ফ্লোরাকে দেখিবার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে! ফ্লোরা সহাস্যবদনে সকলকে অভিবাদন করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন, গাড়ী অতিকষ্টে ভিড় ঠেলিয়া সগর্ব্বে তীরবেগে থিয়েটার অভিমুখে ছুটিল।

জনতার মধ্যে পিশাচ পল গুপ্তভাবে লুক্কায়িত ছিল; ফ্লোরার এত সম্মান ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া পিশাচের হৃদয়ে শেলাঘাত অপেক্ষা অধিক বাজিয়া উঠিল, ক্রমে জনতা কমিল। পিশাচ এইবার আপনার অভীষ্ট পূরণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল; অতি সন্তর্পণে চোরের মত ফ্লোরার বাসভবনে প্রবেশ করিয়া বালকের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। ধাত্রী চার্লসকে ছাড়িয়া অনতি-দূরে অন্য কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে, বালক ইতস্ততঃ আপন মনে খেলিয়া বেড়াইতেছে। পিশাচ বালককে দেখিয়াই চিনিতে পারিল ও একলম্ফে তাহার উপর পতিত হইয়া সেই গোলাপবিনিন্দিত সুকোমল মুখখানি চাপিয়া ধরিয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই তাহাকে আপনার লংকোটের ভিতর পুরিয়া নিমিষের মধ্যে তথা হইতে অদৃশ্য হইল! পিশাচ চার্লসকে অকস্মাৎ এরূপভাবে ধরিয়াছিল যে, দুধের বাছা কাঁদিবারও সময় পাইল না। চার্লসকে লইয়া পল একেবারে তাহার বাসা বাটীতে উপস্থিত হইল ও আপনার ঘরে তাহাকে বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; বালক কিছুতেই তাহাকে ছাড়িবে না—সে ঘরে থাকিতে চাহিল না, কিন্তু পিশাচ তাহাকে ধাক্কা দিয়া ঘরের মধ্যে ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বারবন্ধ করিয়া দিল ও মনে ভাবিল—এইবার আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে! এইবার আমি প্রতিহিংসা পূর্ণমাত্রায় সাধন করিতে পারিয়াছি! এইবার দুষ্টার পুত্রের জন্য বক্ষে করাঘাত দেখিতে পাইয়া আমার হৃদয়ের জ্বালা নিবাইব! এইবার একবার সেই গর্ব্বিণীর নিকট যাইয়া এই সু-খবরটী দিয়া আসি—দেখি পুত্রের মুখ চাহিয়া আমার বশে আসে কি না! নিশ্চয় আসিবে, মাতা কখন পুত্রহারা হইয়া থাকিতে পারিবে না, এইবার ফ্লোরাকে লইয়া আমার মনের ভিতরে বহুদিন সঞ্চিত সাধ ও আশা মিটাইব! এই বলিয়া দুষ্ট মিউনিসিপাল থিয়েটারের অভিমুখে গমন করিল।

এদিকে দুধের বাছা চার্লস ভূমে পড়িয়া কতক্ষণ কাঁদিল! আবার উঠিয়া দ্বার ধরিয়া বাহিরে আসিবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল! দ্বার

খোলা পাইল না বলিয়া মা মা বলিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল! বিপন্নের সহায় ভগবান বালকের রোদন দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন! অসহায়ের বন্ধু বিপদবারণ চার্লসকে বাহিরে আসিবার পথ দেখাইয়া দিলেন! পলের ঘরে আর একটী ছোট দরজা ছিল, সেইটী খুলিলে পশ্চাতের বারান্দায় আসা যাইত! সেই দরজাটী ভিতরদিক হইতেই বন্ধ থাকিত! সৌভাগ্যবশতঃ তাড়াতাড়িতে পলের তদ্বিষয় আদৌ মনে ছিল না; চার্লস সেই দরজাটী খুলিয়া অতি সহজেই পশ্চাৎস্থিত বারান্দায় আসিল। বারান্দার বাহিরে আসিয়া বালক দেখিল অপর ঘরে লোকজন রহিয়াছে; বালক সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া একটী প্রৌঢ়াকে জড়াইয়া ধরিল! প্রৌঢ়া অকস্মাৎ এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বালকের ছোট ছোট কোমল বাহুপাশে আপনাকে আবদ্ধ দেখিয়া যারপর নাই বিস্ময়ান্বিত হইল ও বালককে স্নেহভরে ক্রোড়ে লইয়া সে কোথা হইতে আসিল, কেই বা তাহাকে আনিল, তাহার অনুসন্ধানের জন্য বাহিরের বারান্দায় আসিয়া ইতস্ততঃ চারিদিক অন্বেষণ করিল; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বড়ই চিন্তিত হইল; বালকের মুখ চুম্বন করিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা! তুমি কাদের ছেলে, কোথা হইতে কি করিয়া এখানে আসিলে? কে তোমায় লইয়া আসিল; তোমার বাপ মা কোথায়? বালক কাঁদিতে লাগিল, প্রৌঢ়া বালকের ক্রন্দন দেখিয়া তাহাকে ভুলাইবার জন্য একখানি সচিত্র খবরের কাগজ দিয়া চিত্রাবলী দেখাইতে লাগিল; বালক কাগজে আপনার স্নেহময়ী মাতার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তখনি চিনিতে পারিল ও 'আমার মা আমার মা' বলিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। বালকের নৃত্য দেখিয়া প্রৌঢ়ার হৃদয় আরও দ্রবীভূত হইল ও তাহাকে আপন ক্রোড়ে তুলিয়া বারংবার তাহার মুখ-চুম্বন করিতে লাগিল! বালক বার বার বলিতে লাগিল—এই আমার মা, আমি মায়ের কাছে যাব। প্রৌঢ়া তখন বলিল, চল বাবা! মায়ের বাছা,—আমি তোমায় মায়ের কাছে দিয়া আসি, এই বলিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহার সহিত থিয়েটার অভিমুখে গমন করিল।

এ দিকে পল থিয়েটারে আসিয়া থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষকে ফ্লোরার সহিত সাক্ষাতের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল! ফ্লোরা আপনার জন্য স্বতন্ত্র একটী ঘর পাইয়াছেন! অনেক লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিতেছে ফ্লোরা তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিতেছেন

এখনও অভিনয় আরম্ভ হইবার প্রায় ১ ঘণ্টা বিলম্ব আছে; এমন সময় সেই নর-রাক্ষস পিশাচের অবতার পল, ফ্লোরার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিল; ফ্লোরা পলকে দেখিয়াই একেবারে ভয়ে ও বিস্ময়ে ম্লান হইয়া নির্ব্বাক হইয়া গেলেন।

পল ফ্লোরার প্রতি ভ্রূকুটিপাত করিয়া কহিতে লাগিল, তুমি মনে করিয়াছ যে, গেইটীর সর্ব্বনাশ করিয়া, আমার সর্ব্বনাশ করিয়া এখানে আসিয়া নিশ্চিন্ত হইলে? আমি তাহা হইতে দিব না! তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া তবে আমি ক্ষান্ত হইব। আজ এখানে অভিনয় করিবে; শত সহস্র দর্শকের কণ্ঠে তোমার সুনাম ঘোষিত হইবে; থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ তোমাকে পাইয়া বিশেষ লাভবান হইবে! কিন্তু আমি তাহা কিছুই হইতে দিব না। একবার বাসায় খবর লইয়া দেখ, তোমার সন্তান কোথায়! আর সন্তানের মুখ দেখিতে পাইতেছ না! দেখিতে পাইবেও না ইহা নিশ্চিত জানিও। পলের মুখে এইরূপ নিদারুণ কথা শুনিয়া ফ্লোরা সভয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিবার উপক্রম করিল, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই পল আপন পকেট হইতে একটী রিভলবার বাহির করিয়া বলিতে লাগিল—নিঃশব্দে থাক! যদি আপনার হিত চাও, তবে চীৎকার করিও না! এখনও বলি, আমার প্রস্তাবে সম্মত হও, হারাধন ফিরিয়া পাইবে, আজীবন সুখে থাকিবে! এখনও আমার প্রস্তাবে সম্মত হও! ফ্লোরা পিশাচের বাক্যে বলিয়া উঠিল, তুমি নর-পিশাচ তুমি নর-রাক্ষস, তোমার সহিত বাক্যব্যয় করা বৃথা; গোপনে তুমিই আমার পুত্রকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছ; তোমার মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য তুমিই এ কায করিয়াছ! কিন্তু তোমার এ মনস্কামনা কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না; ভগবান আছেন, তোমার পাপের দণ্ড তিনিই বিধান ক'র্‌বেন। ফ্লোরার মস্তক ঘুরিতে লাগিল; চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল; আর দাঁড়াইবার ক্ষমতা রহিল না! তিনি জ্ঞানহারা হইয়া সেই স্থানেই পতিতা হইলেন। পল অবসর বুঝিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল! কিন্তু সেই সময়ে একজন কেযার টেকার আসিয়া "ম্যাডাম! অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে" বলিযাই ফ্লোরাকে ভূমিতলে অজ্ঞান অবস্থায় পতিতা দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল; তাহার চীৎকারে অপরাপর সকলে সবেগে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া, ফ্লোরার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং পলকে সন্দেহ ক্রমে ধরিয়া নজরবন্দী



জগদ্বিখ্যাত ঔপন্যাসিক

সার ওয়াল্টার স্কটের

"লেডি অফ দি লেক"

উপন্যাসের একটি দৃশ্য।

বেগে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া, ফ্লোরার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে সুস্থ করি-
বার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং পলকে সন্দেহ ক্রমে ধরিয়া নজরবন্দী

রাখিল! পল পলাইবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। ফ্লোরার সংজ্ঞালাভ তখনও না হওয়াতে এবং পলের উপর কর্তৃপক্ষের সন্দেহ ক্রমেই দৃঢ়ীভূত হওয়াতে তখনি পুলিশ ডাকা হইল ও পিশাচ পুলিশের হস্তে সমর্পিত হইল। পলকে লইয়া পুলিশের লোক চলিয়া যাইবার অনেকক্ষণ পরে ফ্লোরার জ্ঞানের সঞ্চার হইল; এবং পুত্র পুত্র করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। মিষ্টার কেম্প ফ্লোরার মুখে পল সম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া যারপর নাই দুঃখিত ও রাগান্বিত হইলেন ও তখনই ফ্লোরার বাটীতে লোক পাঠাইলেন! প্রেরিত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিল! মিষ্টার কেম্প পুলিশের কর্ত্তাকে টেলিফোন করিয়া পল সম্বন্ধে সমুদয় ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন ও পলের উপর সতর্ক পাহারার জন্য আদেশ দিলেন।

অভিনয় আরম্ভ হইল; সকলে ফ্লোরাকে সান্ত্বনা করিয়া রঙ্গমঞ্চে নামাইলেন; কিন্তু পুত্রশোকাতুরা ফ্লোরা পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন! দর্শকবৃন্দ সকলেই যারপরনাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন! মিষ্টার কেম্প সকলকে ফ্লোরার অসুস্থতার কারণ সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়া পর দিন অভিনয়ের আয়োজন করিলেন। ফ্লোরার এইরূপ আকস্মিক বিপদে দর্শকবৃন্দ সকলেই দুঃখিত হইলেন ও সে রাত্রের মত থিয়েটার ত্যাগ করিয়া পরদিন ফ্লোরার অভিনয় দেখিবার জন্য দ্বিগুণ উৎকণ্ঠিত হইলেন।

এ দিকে সেই প্রৌঢ়া ফ্লোরার পুত্রকে লইয়া এতক্ষণে থিয়েটারের অধ্যক্ষের নিকট আসিল। তখনও ফ্লোরার জ্ঞান হয় নাই; সকলেই বিশেষ ভাবিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই ফ্লোরার সন্তানকে দেখিয়া ও প্রৌঢ়ার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া ফ্লোরার জ্ঞান সম্পাদনের জন্য বিশেষ যত্নবান হইল; ফ্লোরা চক্ষু মেলিলেন! চক্ষু মেলিয়াই দেখিলেন—স্নেহের পুত্রটী তাঁহার গলা ধরিয়া বসিয়া আছে! ফ্লোরা হারাধনকে পাইয়া আকাশের চাঁদ লাভ করিলেন ও প্রৌঢ়ার নিকট হইতে সমস্ত ঘটনা শুনিল। তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিলেন; এ দিকে পলকে লইয়া সেই রাত্রেই পুলিশ পুনরায় থিয়েটারে উপস্থিত হইল; বালক পলকে দেখিয়াই তাহাকে চিনিতে পারিল ও বলিতে লাগিল, এই দুষ্ট আমাকে ধরিয়া আনিয়াছিল; পুলিশ বালকের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া ও প্রৌঢ়ার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পলকে চালান দিল!

পরদিবস ফ্লোরার অভিনয় দর্শনে দর্শকবৃন্দ এত চমৎকৃত হইল যে, তাহাদের ফ্লোরার অভিনয় দেখিবার বাসনা আরও বাড়িল! সহবময় ফ্লোরার সুখ্যাতি আর ধরে না; তদবধি ফ্লোরা নিউইয়র্কেই সুনাম ও সম্ভ্রমের সহিত অভিনয় করিতে লাগিলেন। বিচারে পলের দুই বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল জানিবেন।

শ্রীননিলাল সুর।

সংসার-চিত্র।

সংসারের আবরণ সুকোমল বটে;
কিন্তু হায়! সংসার এ অভ্যন্তর হ'তে
আগ্নেয় গিরি সম করে অনল উদ্গার—
দহে সে হৃদয়ের এ বাসন্তী ভাণ্ডার!
হৃদয়-পরাণ—সর্ব্বস্ব আমার দিয়া
ভালোবাসি। কি আশ্চর্য্য! তবু নর-হিয়া
তুষ্ট নহে; সামান্য—কণিকা অপরাধে
কি ভ্রূকুটি! রোষ-দৃষ্টি! তিরস্কার বিঁধে'
করে জর্জ্জরিত! চতুর্দ্দিক হ'তে মোর
নারী-কণ্ঠে বিদ্রূপ-হাস্য উঠে ঘন-ঘোর
মেঘমাঝে বক্র-কায়া বিদ্যুল্লতা প্রায়!
চিত্ত শক্তি-হীন! শির নত হ'য়ে যায়!
দাও শক্তি! মহাশক্তি! ওই মুক্ত আলো!
যাই সেথা—ভেঙে'-চুরে ভব-কারা কালো।

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

মগধেশ্বরী-সেবা ও পূজা।

মহাত্মা আর্য্যঋষিগণ হিন্দুদিগের জন্য অনেক দেব-দেবীর পূজার বিধান করিয়া গিয়াছেন। এমন কি বৃক্ষ, লতা, নদ-নদীরও পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূর্ব্বে হিন্দুগণ স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ মানসে অনেক দেব-দেবীর পূজা করিতেন। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য-সভ্যতা-স্রোতে প্রায় সকলই বিলীন হইয়া গিয়াছে। এমন কি, এই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ক্রমে অবনতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু ভগবানের কৃপায় পুনরায় সেই ধর্ম্মের দিকে আর্য্য সন্তানগণের মতি গতি ফিরিয়াছে। লুপ্ত-ধর্ম্ম-রত্ন-উদ্ধার মানসে এখন প্রায় লোকই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সকলেই স্বীয় স্বীয় ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন।

হিন্দুরা পৌত্তলিক বলিয়া অনেকে নিন্দা করেন, কিন্তু বলিতে গেলে আমরা পুতুল পূজা করি বলিয়াই আজ জগতে হিন্দু বলিয়া পরিচিত, শত বিপ্লবেও এই ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ আছে। এই পুতুল পূজায় যে কি অলৌকিক রহস্য নিহিত আছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমি আজ যে বিষয়ের বর্ণনা করিতে বসিয়াছি, তাহাও একটী অলৌকিক রহস্যে পরিপূর্ণ। হিন্দুগণ অনর্থক কোন কার্য্য করেন নাই।

চট্টগ্রামে বহুকালাবধি মগধেশ্বরী-সেবা ও পূজা প্রচলিত আছে। ইহা আর কোথাও দৃষ্ট হয় বলিয়া বোধ হয় না। কিরূপে, কোথা হইতে ইহা চট্টগ্রামে প্রচলিত হইল, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার কোন উপায় নাই। আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা যথাযথ বর্ণন করিলাম।

সাধারণতঃ 'সেবা' বলিলে 'পূজা' বুঝায়, কিন্তু এই 'মগধেশ্বরী-সেবা' বলিলে 'মগধেশ্বরী পূজা' বুঝায় না। 'সেবা' ও 'পূজা' স্বতন্ত্র।

'মগধেশ্বরী পূজা' শনিবার কি মঙ্গলবার নিশীথ রাত্রে প্রতিমা নির্ম্মাণ করতঃ নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিধি অনুযায়ী পূজা করিতে হয়। তাহা ঠিক্ শ্রীশ্রী৺কালী পূজার মত। প্রতিমাও কালীর প্রতিমার মত। কিন্তু দ্বিহস্তবিশিষ্টা, মুণ্ডমালা-বিহীনা। তাহা সাধারণতঃ গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের জন্য মানস করিয়া পূজা করিতে হয়। বিশ্বাস, এই পূজার দ্বারা গর্ভিণীর ও গর্ভস্থিত শিশুর কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। এই পূজা, শক্তি পূজার অংশ মাত্র।

কিন্তু 'মধগধেশ্বরী-সেবা' সেইরূপ নহে। তাহা দিনের বেলায় শনিবার কি মঙ্গলবার করিতে হয়। তাহাতে ব্রাহ্মণের দরকার করে না। কোন মন্ত্রাদির আবশ্যক হয় না। সাধারণ লোক বা গৃহস্থ স্বয়ং এই কার্য্য সমাধা করিতে পারেন। এই 'সেবা' গর্ভবতী স্ত্রীলোকের জন্যই করা হইয়া থাকে; তবে যাহাদের কোন 'মানস' থাকে, তাহাদের জন্যও এই 'সেবা' করা হইয়া থাকে। এই সেবার জন্য চট্টগ্রামবাসী হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়; তাহার একটী সুন্দর কারণও দেখা যায়। অনেকে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দেবতার 'মানস' করেন; কিন্তু সিদ্ধির ফল অপরিজ্ঞাত থাকে; হইবে কি না তজ্জন্য সন্দেহ থাকে। কিন্তু এই 'সেবার' ফল সম্বন্ধে একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা যথাযথ বর্ণনা করিব।

এই 'সেবার' বিধি এইরূপ ঃ—

একদিন শনিবার কি মঙ্গলবারে একখানা নূতন বাঁশের ঝাঁকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কলার পাতা বিছাইতে হয়। তাহার উপর পরিষ্কার পাঁচ-পোয়া চাউল রাখিতে হয়। চাউলগুলি রক্তজবার দ্বারা বিভূষিত করিয়া দেওয়া হয়। যাহার 'মানসিক' দিতে হইবে, একটী ছাগী শিশু আনিয়া তাহার পদধৌত জল মানসিকের মস্তকে দিয়া ঐ ছাগী শিশুটী কাটিয়া তাহার রক্তে চাউলগুলি রঞ্জিত করিয়া দেওয়া হয়। রক্তাক্ত মুণ্ড ও নাড়ীভূঁড়ি চর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই ঝাঁকায় সজ্জিত করিয়া দেওয়া হয়। মুণ্ডটীর উপর একটী সর্ষপ-তৈলের দীপ-শলিতা জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। তৎপর কয়েকখণ্ড মাংস অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ঝাঁকার উপর রাখিয়া দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে সকলে "ডালি" বলিয়া থাকে। তারপর সকলে প্রণাম করিলে 'ডালি' মাথায় লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া রাখা হয়। তথায় ধূপ ও দীপ জ্বালিয়া দেবীকে আহ্বান করতঃ লোকজন ফিরিয়া আসে। প্রত্যেক গ্রামে 'ডালি' রাখিবার একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকে। তাহাকে গ্রাম্যবাসীরা পবিত্র স্থান বলিয়া ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া থাকে, তাহাকে "সেবা খোলা" বলে। যখন ডালি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়, তখন শকুনী গৃধিনী আসিয়া মহানন্দে ভক্ষণ করতঃ মানসকারীর অভীষ্ট সিদ্ধি জ্ঞাপন করিয়া যায়। ইহাতে একটী বিস্মিত হইবার বিষয় আছে।

যখন ডালি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়, তখন শকুনী-গৃধিনী পূর্ব্বে ভক্ষণ না করিলে অন্য কোন মাংসাশী জীব তাহা স্পর্শও করে না। দূর হইতে কেবল

আগ্রহের সহিত নিরীক্ষণ করতঃ শব্দ করিতে থাকে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একটী ডালি ৫।৬ দিন যাবৎ অভুক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছিল। কোন জীবই তাহা স্পর্শ করে নাই। যখন সেই ডালিটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়া রাখা হইল, তখন অনেক শকুনী গৃধিনী সেইখানে উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু কতক্ষণ বৃক্ষ ডালে বসিয়া পুনঃ চলিয়া গেল। নিকটে একটী কুকুর ছিল, তাহাকে ডাকিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু কুকুরটী একটু নিকটে যাইয়া অবজ্ঞাভরে চলিয়া গেল। যে গৃহস্থ এই মানসিক করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিবারবর্গের আকুল ক্রন্দনে পাষাণও গলিত হয়। কিন্তু ডালি অভুক্তই রহিল। যাহার জন্য মানস করা হইয়াছিল, সে আর রক্ষা পাইল না। লোকে বলিয়া থাকে যে, যদি 'সেবা' সম্বন্ধে কোনরূপ ত্রুটী লক্ষিত হয়, তবে দেবী সেই ডালি গ্রহণ করেন না। শকুনী গৃধিনী এই ক্ষেত্রে দেবীর সহচরী ও অনুচর বলিয়া কথিত হয়। দেবীর আদেশ না হইলে তাহারা ডালি স্পর্শ করে না বলিয়া গ্রামবাসীর বিশ্বাস।

আর একটী ডালি সম্বন্ধে আমি দেখিয়াছি যে, একস্থানের দুইটী গৃহস্থের বাড়ী হইতে দুইটী ডালি এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়া রাখা হয়। তাহাতে দেখা গেল যে, কোথা হইতে অনেকগুলি শকুনী-গৃধিনী আসিয়া মহানন্দে একটী ডালি লোফালুফি করিয়া ভক্ষণ করিল; অপরটী চাহিয়াও দেখিল না। আমি এই সব দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এই সকলের প্রতি আমার কিছুই বিশ্বাস ছিল না! তাহা দেখিয়া আমার মনে এমন একটী ধাঁধাঁ লাগিয়া গেল যে, চিন্তা করিয়াও ঠিক করিতে পারিলাম না। জগতে এমন অনেক অলৌকিক রহস্য আছে, যাহা অদ্যাপিও মানব আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তখন আমার মনে এমন ভয়ের উদ্রেক হইল যে, দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া শত শতবার নিজের অজ্ঞানতার জন্য ক্ষমা চাহিলাম। এখনও যদি পথে কোন "সেবা খোলা" দেখিতে পাই, দেবীর উদ্দেশ্যে অমনি মস্তক অবনত হইয়া পড়ে; এবং পূর্ব্বকথা স্মরণ পথে উদিত হইয়া ভয়ের ও ভক্তির উদ্রেক হয়। আমরা যতই কেন মুখে বলি না হিন্দুদিগের এই সব অন্ধ বিশ্বাস, ইহা কিছুই নহে, কিন্তু এই কথা বলিতে অন্তরে একটু না একটু ভয়ের উদ্রেক হইয়া থাকে। আন্তরিক সাহস করিয়া দেবতার অবজ্ঞা করিতে কেহই পারে না। অনেকে পাশ্চাত্যবাসীদিগের নিকট নিজের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য মুখে হিন্দুদের দেবীরও পূজা পদ্ধতির নিন্দা করিয়া থাকেন।

কিন্তু অন্তরে অন্যভাব, হিন্দু প্রতিমা দেখিলে সভয়ে প্রণাম করেন। চট্টগ্রামে "মগধেশ্বরী-সেবা" প্রচলন সম্বন্ধে একটী জনপ্রবাদ আছে। অতি পূর্ব্বকালে চট্টগ্রামে মগ্ জাতির বাসস্থান ছিল, তাহারাই "মগধেশ্বরীর" সেবা করিত। মগজাতির দেবতা বলিয়া "মগধেশ্বরী" নাম হইয়াছে। কিন্তু 'মগধেশ্বরীর পূজা' ঠিক কালীপূজার মত। ইহাতে "মগধেশ্বরী" দেবতা কেবল যে মগ-জাতির দেবতা, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। যাহা হউক, কালক্রমে হিন্দু বৌদ্ধ উভয়জাতিরা ইহার সেবা করিয়া আসিতেছেন। এইরূপ জনশ্রুতিও আছে যে, পাঠান রাজত্বকালীন দুর্দ্দান্ত বক্তিয়ার খিলিজির অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া মহারাজ নীলাম্বর মজুমদার স্বীয় পরিজন ও দেবসদৃশ পাঁচজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সহ সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়া চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী শঙ্খ-নদীর মোহানার নিকটবর্ত্তী সুচিয়া গ্রামে স্বীয় উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহার অনেকদিন পর্য্যন্ত কোন সন্তানাদি না হওয়ায় একজন স্থবিরের (মগ সন্ন্যাসী) পরামর্শানুসারে চট্টগ্রামে তিনিই প্রথম এই "মগধেশ্বরীর সেবা" প্রচলিত করেন। এইরূপ কথিত আছে, এই সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী তাঁহাকে কৃত্তিবাস নামক পুত্ররত্ন প্রদান করেন। কালক্রমে এই কৃত্তিবাস "কল্পতরু" বলিয়া বিখ্যাত হ'ন, তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। অদ্যাপিও তাঁহার দান-শীলতার যথেষ্ট পরিচয় চট্টগ্রামে দেদীপ্যমান আছে। তাঁহার বিশাল বংশ চট্টগ্রামে এখনও অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান আছে।

দেখা যায় যে, যে কোন জাতির হউক না কেন, যদি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন অলৌকিক বিষয় হিন্দুদিগের নয়নগোচর হয়, তাহা হিন্দুরা অভ্রান্তভাবে ভক্তির সহিত গ্রহণ করেন। এমন কি বৌদ্ধদিগের যে সকল মঠ আছে, তাহাতে হিন্দুরাও গমন করিয়া, ভক্তির সহিত প্রণাম করেন। মুসলমান ফকির দেখিলে, হিন্দুরা আদর করিয়া থাকেন। মুসলমান দর্গায় হিন্দুরা মানসিক দিয়া থাকেন, কিন্তু মুসলমানেরা আদর করিয়া একজন হিন্দু সন্ন্যাসী দেখিলেও অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। ইহা আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর্য্যজাতি গুণের মর্য্যাদা করিতে কখনও বিস্মৃত হ'ন নাই।

শ্রীনগেন্দ্রলাল চৌধুরী।

মহাপুরুষীয়-ধর্ম্ম।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম বহুশাখায় বিভক্ত ও অল্লাধিক পরিবর্ত্তন করিয়া অনেক মহাপুরুষ আসামে প্রচার করিয়াছেন; তন্মধ্যে মহাপুরুষীয় ধর্ম্মেরই প্রচলন অধিক। ৺শঙ্করদেব ও ৺মাধবদেব এই ধর্ম্মপ্রচার ও ভাগবতের অনুপম অনুবাদ প্রকাশ করেন। মহাপুরুষ দ্বারা প্রচারিত বলিয়া বোধ হয় এই ধর্ম্মের নাম "মহাপুরুষীয়"। মহাপুরুষীয় ধর্ম্মানুসারে বিষ্ণুর আরাধনা করিলেই মুক্তিলাভ করা যায়। অন্য দেবদেবীর পূজা করা তাহাদের নিষেধ। শঙ্করদেব বলিয়াছেন,—

"অন্য দেবদেবী ন করিবা সেবা
গৃহকো নে খাইবা,
প্রসাদো নে খাইবা,
ভক্তি হইবে ব্যভিচার।" "কীর্ত্তন" *

'অন্য দেব দেবীর পূজা করিও না, (তাহাদের) গৃহে খাইও না, প্রসাদও খাইও না, তাহা হইলে ভক্তির ব্যভিচার হইবে। যাগ যজ্ঞাদি করা মহাপুরুষীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিষেধ। তাহাদের মতে তন্ত্রাদিতে যে সমস্ত যাগযজ্ঞের বিধি আছে, তাহা কোন না কোন দেবতার সন্তোষার্থে করা হয় মাত্র। সুতরাং যিনি দেবতারও দেবতা, সেই বিষ্ণুর আরাধনা করাই কর্ত্তব্য, তাহাতেই সমস্ত দেবতার সন্তোষ সাধন হয়।

ভাগবত ধর্ম্মই মহাপুরুষীয় ধর্ম্মের মূল, ভাগবতে কেবল বিষ্ণুপূজার বিধি আছে। ভাগবতে—

"যথা তরোর্ম্মূল-নিষেচনেন,
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা"। ভাগবত॥

"যেমন বৃক্ষমূলে জল সেচন করিলে, কাণ্ড শাখা প্রশাখা সমস্তই তৃপ্তিলাভ করে, আবার যেমন আত্মসন্তোষ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ তৃপ্ত হয়, সেইরূপ একমাত্র ভগবৎসেবাই সমস্ত দেবার্চ্চনার তুল্য"। সেই জন্য মহাপুরুষীয়-

* কীর্ত্তন ৺শঙ্করদেব রচিত মহাপুরুষীয় ধর্ম্মপুস্তক।

দিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাতে অন্য কোন দেব-দেবীর পূজা করা নিষেধ এবং এই ক্রিয়া কাণ্ডেব ব্রতীকেই বিষ্ণুব আরাধনা কবিতে হয। প্রতিনিধি দ্বারা তাহা সম্পন্ন কবা নিষেধ।

মহাপুরুষীয়দিগের মতে কর্ম্ম অপেক্ষা হৃদয়ের ভাবই শ্রেষ্ঠ; তাহাবা কর্ম্মকে একটা অবশ্য করণীয় বলিয়া মনে করে না। 'নামঘোষায' * আছে—

"কর্ম্মত বিশ্বাস যাব হিয়াত থাকন্ত হবি
অতিশয় দুর হোন্ততার।
দুরতো বিদুর হোন্ত তার অহঙ্কার থাকান্তেও
সাক্ষাৎ কৃষ্ণক পাবে,
শ্রবণ কীর্ত্তন ধর্ম্মকার॥"

নিজ হৃদযে ঈশ্বরের অবস্থান থাকা সত্বেও বাহিরের কর্ম্মকাণ্ডে যাহাব বিশ্বাস, পরমেশ্বর তাহাব নিকট হইতে অত্যন্ত দূরে অবস্থান কবেন। কিন্তু হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তনই যাহার ধর্ম্ম, তাহার মনে যদি অহঙ্কারও থাকে, তথাপি সে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়। মহাপুরুষীয ধর্ম্মের মূল মন্ত্রই হইতেছে—

"রাম কহ রাম কহ রামমন্ত্র সার।
তপ, জপ, যজ্ঞ যাগে-সিদ্ধি নাহি আর" ॥ 'কীর্ত্তন'

সনাতন হিন্দুধর্ম্মে প্রচলিত ধর্ম্মকাণ্ড, মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রীত্যর্থে শ্রাদ্ধাদি কিম্বা বিঘ্ন নাশেব জন্য গ্রহযাগ অথবা তীর্থাদি ভ্রমণ প্রভৃতি সকল কার্য্যই মহাপুরুষীয়দিগের অবিধেয়।

খিটোজন কৃষ্ণ কথা, বিচার সময় মনে
ধৈর্য্য ধরি ক্ষণেক থাকয।
যত তীর্থ স্নানদান, দেব পিতৃ যজ্ঞ যাগ
যোগাদিরো ফলক পারয়॥
যার পুত্র সবে ঐত, হরিত শরণ লৈয়া
হরিগুণ গাবে শুদ্ধভাবে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু, নদীর জলক পিয়া
পিতৃগণ তৃপিতিক পাবে॥ "নামঘোষা"॥

যিনি কিছুক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া মনে মনে কৃষ্ণ কথা চিন্তা কবেন, তিনি সমস্ত তীর্থে স্নানদান, দেবলোক, পিতৃলোকের প্রীত্যর্থে যাগ যজ্ঞ ও

* নামঘোষা ৺মাধবদেব রচিত মহাপুরুষীয় ধর্ম্মপুস্তক।

যোগাদির সমস্ত ফলই প্রাপ্ত হন। এবং যাহার পুত্রগণ হরির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ ভাবে হরিগুণ গান করে, তাহাদের পিতৃলোক দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুনদীর জলপান করিয়া তৃপ্তিলাভ করে।

তীর্থ ভ্রমণ ও প্রতিমা পূজা করা সম্বন্ধে ৺শঙ্করদেব বলিয়াছেন

"তীর্থ বুলি করে জলত শুদ্ধি।
প্রতিমাত করে দেবতা বুদ্ধি॥
বৈষ্ণবের নাই ইসব মতি। 'কীর্ত্তন'।

তীর্থ বলিয়া জলে শরীর ও মন শুদ্ধ করে, প্রতিমায় দেবতা আরোপ করে, কিন্তু যিনি বৈষ্ণব তাঁহার এই সমস্ত বিষয়ের দিকে মন যায় না।

আরও—

"সূর্য্য গ্রহণত এক কোটী ধেনু
ব্রাহ্মণকে করে দান।
প্রয়াগ গঙ্গার জলত নিবাস
করে দশ কল্প মান॥
অযুতেক যজ্ঞ— করে অশ্বমেধ
সুবর্ণকি করে দান।
এক শত ভাগ গবিন্দের নাম
তবে ও নুহি সমান্॥" 'কীর্ত্তন॥'

'সূর্য্যগ্রহণের সময় ব্রাহ্মণকে এককোটী গোদান, প্রয়াগের গঙ্গাতীরে দশকল্প-কাল বাস, দশ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও সুবর্ণদান করিলে যে ফল হয়, তাহা গোবিন্দনামের শতাংশের একাংশেরও সমান নহে।'

মহাপুরুষীয়দিগকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, একভাগ 'অবিরক্ত', সংসারের প্রতি যাহাদের বিরাগ জন্মে নাই, অপর ভাগ 'বিরক্ত', সংসারের প্রতি যাহাদের বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। যে সকল ভক্তদিগের সংসারে বিরাগ জন্মে নাই, তাহাদিগকে বেদ-বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যাদি করিতে হয়।

"অবিরক্ত ভকতের বেদ লঙ্ঘিবার দোষ
জানিবা হৈবেক নিশ্চয়।
পরম বিরক্ত যিটো, কৃষ্ণ ভকত হৈল
তার এ কো নাহিক নির্ণয়॥" 'কীর্ত্তন'॥

'অবিরক্ত ভক্তদিগের বেদ লঙ্ঘন করা পাপ, ইহা নিশ্চয় জানিও।'

কৃষ্ণভক্তদিগের মধ্যে যাহারা পরম বিরক্ত, তাহাদের জন্য কর্ম্মাকর্ম্ম নিরূপিত নাই।'

যাহারা সংসারী, তাহাদের বেদ-বিহিত ভক্তি-অবিরোধী কার্য্যাদি করিতে হয়, না করিলে ধর্ম্মাচরণ পূর্ণ হয় না। হরিনাম-অবিরোধী কর্ম্ম কি কি? হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন, অতিথি সৎকার, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির অভাব মোচন, মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্ত-সেবা প্রভৃতি হরিনাম-অবিরোধী কার্য্য বলিয়া কথিত। যে সমস্ত মহাপুরুষীয় গৃহাশ্রমত্যাগী, তাহারা সকল কার্য্যেই স্বাধীন ও নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের হাত হইতে মুক্ত। সমাজে যে সমস্ত কার্য্য করা পাপ বলিয়া ধরা হয়, কেহ সেই পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে কতগুলি দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিলেই প্রায়শ্চিত্ত হইল না। যে পাপে সমাজ যে পরিমাণে কলুষিত হয়, সেই পরিমাণের অনুপাতে অর্থদণ্ড দিতে হয়। সেই অর্থ কেবল একজনের উদর পূরণে ব্যয়িত না হইয়া সমাজের সমস্ত ভক্তদিগের প্রীতিভোজে ব্যয় করা হয়। বিবাহ'বিধি ৺শঙ্করদেব যাহা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখন লুপ্তপ্রায়; কোথাও সে বিধি প্রতিপালিত হয় না, সুতরাং তাহার নিয়মাদিও পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে মিতাক্ষরীণ অনুসারে বিচার কার্য্য পরিচালিত হইত, বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজগভর্ণমেণ্টের বিচার আলয়ে দায়ভাগ অনুসারেই বিচার কার্য্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু এখনও কোন বিষয় যদি সমাজেই মীমাংসিত হয়, তবে মিতাক্ষরীণ অনুসারেই হইয়া থাকে।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী।

সুখী কে?

দীনতার দায়ে দীন দিন-কার্য্য করি সম্পাদন
শিশু যেবা সেও লভে কালে শ্রেষ্ঠ পদ।
বৈভবের ভাবী অধিপতি আলস্যে কাটায়ে কাল
না পারে লভিতে শান্তি বিশ্ব-আকাঙ্ক্ষিত॥

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

শরত-আহ্বান।

পরিবেষ্টিত অমল ধবল
কাশ-গুচ্ছ ভূষণে,
শ্যাম-নবীন-ধান্যের শিস
শোভিত উজল ভুবনে।
মধুর বায় বহিছে মৃদুল,
প্রকৃতি পরশে পুলকাকুল,
গাহিছে হরষে পতত্রিকুল
ললিত রাগিণী সুতানে।
রঙ্গে ভঙ্গে রস-তরঙ্গে
কুসুম-নিকর দুলিছে,
রেণু মাখা চোখে রেণুবাস
ওই, অন্ধ হইয়ে ছুটিছে;
নীলিমাকাশ কুন্দ-নিরদ
রথ'পরি চড়ি এসগো শরত
মণি-ঝলমল নির্ম্মল প্রাতে
বস গো শষ্প আসনে।
মোহন আস্যে সুমধুর হাসি
উজল বিভায় ধরণী
রূপের ছটায় আমোদিত কর
সুচারু হিরণ্য-বরণি!
বন উপবন শাখা শাখিগণ,
ক্ষেত্র মাঠ হো'ক্ স্বর্গ-কানন
নগ নদ নদী প্রাসাদ ভবন
উজল' বিমল বরণে;
এস, ধীর মন্থরে শারদ-লক্ষ্মী
সাজিয়া রঙিল বসনে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

শিক্ষার দোষ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্যামা।

সন্ধ্যা তখন হয় হয় ;—হৈমকিরণ সংযত করিয়া শ্রান্তকলেবরে সূর্য্যদেব অস্তাচলাবলম্বী হইলেন। পাখীরা কলরব করিতে করিতে কুলায়াভিমুখে ধাবিত হইতেছিল। রাখালগণ মাঠ হইতে গাভীপাল লইয়া গ্রামের মধ্যে আগমন করিতেছে। কৃষককুল মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল। পল্লীর নীরব বনভূমিতে সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল।

চাঁদেরহাট গ্রামের দক্ষিণ ভাগে শ্যামসুন্দরের প্রকাণ্ড দীঘি। দীর্ঘিকায় নীলজল পরিপূর্ণ। চারিপার্শ্বে চারিটী ঘাট সুন্দরভাবে বাঁধা—গ্রামের প্রায় সমস্ত লোক এই দীঘিতে স্নান করিতে আগমন করিয়া থাকে। বর্ষাকালে যদিও গ্রামের অপর দুই একটী পুষ্করিণীতে জল পাওয়া যায়, কিন্তু বৈশাখ জ্যেষ্ঠ মাসে সেই দীঘি ব্যতীত আর কোথাও জল থাকে না।

ননিদের বাড়ী যে পাড়ায়, সে পাড়ায় একটা পুকুর আছে, যে বৎসর আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে অধিক বৃষ্টি হয়, সে বৎসর সে পুষ্করিণীতে একটু আধটু জল থাকে। এ বৎসর বৈশাখমাস পর্য্যন্ত সে পুষ্করিণীতে যে জল ছিল, তাহাতে একরূপ কাজ চলিতেছিল, কিন্তু বৈশাখমাসে বৃষ্টি না হওয়ায় তাহার সামান্য জল অপেয় হইয়া উঠিয়াছে। যদিও অতি প্রত্যূষে রৌদ্রের তাপ খরতর না হইতে হইতে তাহাতে স্নান করিয়া লওয়া চলে, এবং রন্ধনাদি করিবার জল আনা চলে, কিন্তু সে জল আর পান করা চলে না। তাহা ঘোলা ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই এখন সমস্ত গ্রামের লোকেরই পানীয় জল শ্যামসুন্দরের দীঘিতে। বৈকালে গ্রামের সমস্ত ললনাকুলই কলসী লইয়া দল বাঁধিয়া শ্যামসুন্দরের দীঘিতে জল আনিতে গমন করিয়া থাকেন।

চপলা পাড়ার মেয়েদের সহিত জল আনিতে শ্যামসুন্দরের দীঘিতে গমন করিয়াছিল। পথে শ্যামা গোয়ালিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে

বলিল,—"মাঠাকুরুণ আমাকে হীরু বাবুদের বাড়ী পাঠিয়েছিলেন, আমি এখন সেখান হ'তে আস্‌ছি—চল, তোমাদের বাড়ী যাব।"

চপলা তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিলেন।

যখন চপলা বাড়ী আসিল, তখন তাহার শ্বাশুড়ী বাড়ী ছিলেন না,—পাড়ার মধ্যে কোথায় গমন করিয়াছিলেন।

চপলা গৃহমধ্যে গমন করিয়া যথাস্থানে জলকলস রক্ষা করিয়া বাহিরে আসিল। শ্যামাকে বসিতে বলিয়া সন্ধ্যার দীপ গুছাইতে গমন করিতেছিল, শ্যামা বলিল,—"আমি আর বসিব না, বাড়ীতে কাজ আছে।"

চপলা বলিল,—"আমার শ্বাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করিবে না?"

শ্যামা। দেখা করিতেই আসিয়াছিলাম,—কিন্তু দেখা হইল কৈ!

চপলা। পাড়ার মধ্যে গিয়াছেন, এখনই আসিবেন।

শ্যামা। আমি বাড়ী গিয়া সন্ধ্যা জ্বালিব।

চপলা। হীরুদের বাড়ী গিয়াছিলে?

শ্যামা। হ্যাঁ, মাঠাকুরুণের কথামত গিয়াছিলাম।

চপলা। তাহাকে কি বলিলে?

শ্যামা। মাঠাকুরুণের কথামত তোমাদের বাড়ী একবার আসিবার জন্য বলিলাম।

চপলা। সে কি বলিল?

শ্যামা। সে বলিল সন্ধ্যার পরেই যাইব।

চপলা। তবে তুমি এখন যাও।

শ্যামা। একটা কথা বলিব?

চপলা। বল না কেন,—আপত্তি কি?

শ্যামা। তুমি যদি রাগ না কর, তবে বলি।

চপলা। সে কি,—এমন কি কথা বলিবে, যাহাতে আমি রাগ করিব?

শ্যামা তখন নানাবিধ ভাবভঙ্গি সহকারে নানাবিধ আকার—ইঙ্গিত করিয়া অবশেষে বলিল,—"হীরু বাবু তোমাকে ভালবাসে—তোমাকে চায়। তুমি যদি তাহাকে আসিতে বল, সে তোমাদের গোলাম হইয়া থাকে।"

পথ-পার্শ্বে-পতিতা ফণিনীর পুচ্ছদেশে পদক্ষেপ করিলে সে যেমন ফণা উত্তোলন করিয়া গর্জ্জিয়া উঠে, চপলা তেমনি ভাবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল! তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া শ্যামা ভীত হইল।

যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া চপলা শ্যামাকে ও হীরুকে গালাগালি দিতে লাগিল, এই সময় চপলার শ্বাশুড়ী বাড়ী আসিলেন। বধূর মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া খেঙ্‌রা লইয়া শ্যামাকে প্রহার করিতে গেলেন,—শ্যামা ঊর্দ্ধ-শ্বাসে পলায়ন করিল। তারপরে শ্বাশুড়ী বধূতে অনেকক্ষণ আর্ত্তনাদ করিলেন,—এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে সমস্ত পল্লী ডুবিয়া পড়িল।

সন্ধ্যার পরে সমস্ত পল্লী যখন অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়া নিস্তব্ধে বসিয়াছিল, তখন হীরালাল দক্ষিণ হস্তে একগাছি যষ্টি ও বাম হস্তে একটি ল্যাণ্ঠন লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইল।

প্রথমেই গিয়া শ্যামার বাড়ী উপস্থিত হইল। গোয়ালাপাড়ার একপ্রান্তে শ্যামার বাড়ী, একখানি খড়ের গৃহ লইয়া তাহার সমস্ত বাড়ী। সেই গৃহেই রন্ধন—সেই গৃহেই দ্রব্যাদি রক্ষা ও শয়ন হইয়া থাকে। ত্রিজগতে শ্যামার আর কেহ নাই—বয়স তাহার পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছে। পাড়া হইতে কয়েক সের দুগ্ধ ক্রয় করিয়া তাহাতে যদিচ্ছা জল মিশাইয়া বিক্রয় করতঃ গ্রাসাচ্ছাদন চালাইত, আর প্রতিবাসিগণের কথাবার্ত্তা শুনিত, তজ্জন্য সকলে তাহাকে কিছু কিছু সাহায্যও করিত।

শ্যামা গৃহমধ্যে বসিয়া পান্তাভাত ভোজন করিতেছিল, এমন সময় হীরালাল তাহার উঠানে গিয়া ডাকিল,—শ্যামামাসি।"

হীরালালের গলার স্বর শুনিয়া শ্যামা তাড়াতাড়ি মুখের অর্দ্ধচর্ব্বিত গ্রাস গিলিয়া ফেলিল, এবং হাতের গ্রাস পাত্রস্থ করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিল, বলিল,—"কেন বাবা?"

হীরা। কি হ'ল মাসী?

শ্যামা। সে কথা আর ব'ল না বাবা,—অনেক মানুষ দেখেছি—এমন দুরন্ত বৌ কখনও দেখি নি!

হীরা। কি হ'ল?

শ্যামা। হ'ল তোমার আর আমার চৌদ্দপুরুষ অন্ত—শাশুড়ী মাগী এসে আমাকে খেঙ্‌রা নিয়ে মারে আর কি,—পালিয়ে প্রাণ বাঁচাই।

হীরালাল কি চিন্তা করিলেন। তারপরে বলিলেন,—"বটে! আচ্ছা, এই আমি যাচ্চি—আসল কথা শুনিয়ে দিয়ে আসি। দেখবো—শ্যামার পায়ে ধরে হীরুর কাছে পাঠায় কি না। যদি এ কাজ সমাধা কর্ত্তে না পারি, আমি বাপের বেটা নই।"

হীরালাল চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

সুলতানার প্রণয়।

সুলতানা নাইলি তুরস্কের বর্ত্তমান সুলতান পঞ্চম মহম্মদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রিন্স মামুদ বসিদের দুহিতা। ইনি বিদুষী, রূপসী; কেবল তুর্কীভাষায় নহে, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষাতেও সুলতানার বিশেষ অধিকার আছে। সম্প্রতি সুলতানা নাইলি সুপ্রসিদ্ধ তুর্ক-বীর আনোয়ার বের সহিত পরিণয় পাশে আবদ্ধা হইয়াছেন। ইঁহাদের পরিণয়-কাহিনী বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। বিগত তুর্ক-বলকান-যুদ্ধে তুর্ক-বীর অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন, সারা দেশ তাঁহার যশোগীতে মুখরিত হইয়া উঠে, ইঁহারই রণকৌশলে ও ক্ষিপ্রকারিতায় অড্রিয়া-নোপল পুনরধিকৃত হয় এবং যুদ্ধাবসানে তুরস্ক-দরবার আনোয়ার বে কে 'পাশা' উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন।—সাহাজাদি নাইলি প্রত্যহ সংবাদ পত্র পাঠ করিতেন; সংবাদ পত্রে বীরবর আনোয়ারের বীরত্ব-কাহিনী পাঠ করিয়া তিনি মুগ্ধ হন, এবং তাঁহার অত্যন্ত পক্ষপাতিনী হইয়া উঠেন। আনোয়ারের নাম শুনিলে তাঁহার অন্তরে অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার হইত; ক্রমেই আনোয়ারের প্রতি তাঁহার অনুরাগ এরূপ প্রবল হইয়া উঠিল যে, এক দিন তিনি আনোয়ারকে এক খানি পত্র লিখিয়া তাঁহার অন্তরের অনুরাগ প্রকাশ করিলেন; তিনি যে আনোয়ারের একান্ত গুণমুগ্ধা—তাঁহারই উদ্দেশে তিনি যে কায়-মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন—পত্রে এ কথারও উল্লেখ ছিল। সাহাজাদির প্রেম পত্র পাঠ করিয়া আনোয়ার বে স্তম্ভিত হইলেন। মহামান্য সুলতানের হারেমের অসূর্য্যম্পশ্যা সাহাজাদি নাইলি তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী—তাঁহার প্রণয়-প্রার্থিনী! ইহা কি সম্ভব? আনোয়ার সাহাজাদিকে তাঁহার পত্রের উত্তর প্রদান করিলেন; পত্রে সাহাজাদির সম্মান ও মর্য্যাদা সম্পূর্ণ-ভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। আনোয়ারের বীরোচিত পত্র পাঠ করিয়া সুলতানা অধিকতর মুগ্ধ হইলেন। অতঃপর একদিন সুলতানা নাইলি পিতার নিকট তাঁহার অন্তরের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন; তিনি যে আনোয়ারের প্রতি একান্ত অনুরাগিণী এবং মনে মনে তাঁহাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন,—পিতাকে অকপট চিত্তে তাহা সকলি বলিলেন।

সহৃদয় প্রিন্স মামুদ কন্যার কাহিনী শুনিয়া আনন্দিত হইলেন; তুরস্কের গৌরব স্বরূপ বীরবর আনোয়ার বেকে কন্যা দান করা যে কিছুমাত্র অগৌরবের কথা নহে—বরং সৌভাগ্যের কথা, ইহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিলেন। সাহাজাদির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। সম্প্রতি মহাসমারোহ সহকারে তাঁহাদের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং সুলতান-প্রদত্ত প্রভূত বিত্ত নবদম্পতীর হস্তগত হইয়াছে।

শোক সংবাদ।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় ২২এ শ্রাবণ রাত্রি একটা পনের মিনিটের সময় মদীয় ভ্রাতষ্পুত্র প্রাণাধিক সুরেনচণ্ডী দত্ত অকালে মর্ত্ত্যলীলা সম্পন্ন করিয়া স্বর্গবাসে চলিয়া গিয়াছে।

তাহার অভাবে আমাদের পরিবারবর্গ শোকাগ্নিতে দহ্যমান—আমাদের বাড়ী হা হা রবে মুখরিত। তাহার বয়স সবে তেইশ বৎসর নয়মাস মাত্র হইয়াছিল। এই অল্প বয়সে সে আমাদের বিপুল ছাপাখানা, বিস্তৃত পুস্তকের কারবার ও সমস্ত কার্য্যের ভার লইয়া অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিয়া আসিতেছিল। অধিকন্তু "অবসরের" ন্যায় একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছিল। তাহার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা যে কি কষ্টে কালাতিবাহিত করিতেছি, তাহা সেই সর্ব্বশান্তিপ্রদাতা শ্রীভগবানই জানেন।

আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ ৺নবকুমার দত্ত মহাশয় অবসরের প্রতিষ্ঠাতা—প্রাণপণে ইহার সম্পাদন করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তারপর বালক সুরেন ইচ্ছা করিয়া যখন ইহার ভার গ্রহণ করে, আমি তখন অতি আহ্লাদে তাহার উপর ভারার্পণ করিয়া পশ্চাৎ হইতে প্রত্যেক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছিলাম। এখন সে গিয়াছে—বুঝি আমি তাহার খুল্লতাত হইয়া এই সকল গুরুভারে তাহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছিলাম, বলিয়া আমার উপরে রাগ করিয়া আমাকে প্রতিভারে কষ্ট দিবার জন্যই তাহার স্বর্গগমন।

অবসর আমার দাদার প্রতিষ্ঠিত—কাজেই আমাদের নিকট ইহা দেবমন্দির সদৃশ। যতদিন দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন অক্লান্ত পরিশ্রমে ইহার কার্য্য করিব।

বর্ত্তমান সংখ্যার সম্পাদন শেষ করিয়াই সুরেন চলিয়া গিয়াছে। আগামী সংখ্যা হইতে আমি ইহার কার্য্য করিব। ভরসা করি, আমার যত্নে অবসর অবনত হইবে না—বরং উন্নত হইবে, আশা করিতে পারি।

আগামী সংখ্যায় সুরেনের হাফটোন ছবি ও জীবনী প্রকাশিত হইবে।

আপনাদের ভৃত্য—

শ্রীলালবিহারী দত্ত।

অবসর—



স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র দত্ত।

সুরেণচণ্ডী।

ঐ সুন্দর প্রতিকৃতি স্বর্গগত সুরেণচণ্ডী দত্তের। সুরেণচণ্ডী অল্পবয়স্ক মেধাবী যুবক—জাতীয় সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, অল্পদিন মাত্র নিপুণতার সহিত 'অবসর' মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়া সংসার হইতে চিরতরে চলিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যসম্বন্ধে পরিচয় দিবার মত কার্য্য তাঁহার অপরবিধ কিছুই নাই। পিতৃ-বিয়োগে কেবল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন মাত্র। সুতরাং নবজীবনে বৈচিত্র বা রহস্য-জাল-জড়িত ব্যাপার কি থাকিবে? তবে বলা যাইতে পারে, জীবিত থাকিলে কালে তাঁহার জীবন-বৃক্ষে স্বর্ণফল ফলিতে পারিত।

ত্রয়োবিংশ বর্ষ নবম মাস মাত্র সুরেণচণ্ডী মর্ত্তভূমে কাটাইয়া গিয়াছেন। এ কাল পর্য্যন্ত তাঁহাতে কোন প্রকার পাতক স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া শোনা যায় নাই। সুরেণচণ্ডী গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সুরেণচণ্ডীর মন্ত্রদাতা গুরু, এবং দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপদেষ্টা ছিলেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার ধর্ম্ম-জীবন কি প্রকারে গঠিত হইতেছিল। তিনি কখনও আলস্যে কাল কাটাইতেন না বা কুসঙ্গীর সঙ্গলাভে পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন না।

ইঁহার একুশ বর্ষ বয়সে রবির দশা পড়ে। পাপদৃষ্টি রবি অষ্টমে (নিধন স্থানে) বিরুদ্ধ থাকেন। রবি অষ্টমে থাকিলে জাতক ব্যবহার কার্য্যে ধূর্ত্ত হয়, এবং বহুবিধ কষ্টভাগী ও নিধনত্ব প্রাপ্ত হয়। আলস্য-বৃদ্ধি, কার্য্যে উদ্যম ভঙ্গ, চৌরদ্বারা ক্ষতি, শরীর কৃশ, জ্বরাদি রোগ, শত্রু-বৃদ্ধি, বুদ্ধির ভ্রম, চক্ষুপীড়া এবং হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদগণ বলিয়া দিয়াছিলেন,—"প্রশস্ত উপায় দ্বারা ভক্তি-ভাবে সেই জগৎ-পিতা নারায়ণের পূজা করাইয়া ১০০৮ তুলসী দান করা আবশ্যক। আর রবির পূজা ও দান করাইয়া গ্রহদোষ শান্তি করান নিতান্ত আবশ্যক—যে হেতু ২৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মারক-দোষ-যুক্ত বিরুদ্ধ রবির দশা থাকিবে। ত্রৈলোক্য মঙ্গল নামক সূর্য্য-কবচ বা নবগ্রহ-কবচ ত্রিলৌহ যন্ত্রে ধারণ করিলে সর্ব্বব্যাধি ও সর্ব্ব আপদ-মুক্ত হইবেন।"

সুরেশচন্দ্রী কুষ্ঠীর এ ফলাফল বা জ্যোতিষিগণের মন্তব্য কাহাকেও জানিতে দেন নাই। ইহার জন্য কোন দৈব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন কি না, তাহাও কেহ বলিতে পারেন না। তবে রবিবার করিতেন—অর্থাৎ প্রত্যেক শুক্ল রবিবারে অপরাহ্নে হবিষ্যাশী হইয়া থাকিতেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে রবিবারে তিনি শ্যামনগরের এক বাগান বাড়ীতে বেড়াইতে যান। সেখানে রবিবার-ব্রত ভঙ্গ হয়,—বান্ধবগণের অনুরোধে মৎস্য মাংসাদি ভোজন করেন। সোমবারে বাড়ী ফিরিয়া আসেন,—শুক্রবারে জ্বর হয়। পর শুক্রবারে রাত্রি ১টা ১৫ মিনিটের সময়ে অকালে কালের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া স্বর্গারোহণ করেন।

অবসরের প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ৺নবকুমার দত্তের ঐ একটী মাত্র পুত্র ছিলেন। আর নাই—সুরেশচন্দ্রের পুত্রাদি কিছুই হয় নাই; অতএব নবকুমার বংশহীন হইলেন। বর্ত্তমান অবসর-সম্পাদক শ্রীযুক্ত লালবিহারী দত্ত মহাশয় নবকুমার বাবুর ভ্রাতা, তিনিই এখন সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও অধিকারী।

অশ্রুবিন্দু।

ফুটিতে ফুটিতে আহা!
ফুটিল না সে যে গো,
নীরবে পড়িয়া গেল ঝরিয়া;
বাসনা-প্রসূন শত
নিরমম কাল গো,
নিমিষে চরণে গেল দলিয়া!
অকলঙ্ক চাঁদ হায়!
দেখিতে দেখিতে গো,
অকাল-জলদ দিল ঢাকিয়া,—
শমন ব্যাধের শরে
পড়িল ঢলিয়া গো,
মধুর-সঙ্গীতকারী পাপিয়া!

বীণাটী বাজিতেছিল
সুমধুর তানে গো,
সহসা থামিল তার ছিঁড়িয়া ;—
রাগিণীটী বায়ু-স্রোতে
ভাসিয়া আসিতে গো,
চকিতে চলিয়া গেল ফিরিয়া।
তরীখানি পাল-ভরে
নাচিয়া নাচিয়া গো,
যেতেছিল তীরবেগে ছুটিয়া ;—
একটী দারুণ ঢেউ
নিমেষে পরশি গো,
অতলে ডুবায়ে দিল টুটিয়া।

শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরকার।

'অবসর' সুরেন বাবুকে হারাইয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। সুরেন বাবুর বয়স এত অল্প—প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন ক্ষমতা দেখিয়া তেমন বুঝি নাই ; মনে করিয়া ছিলাম, তাঁহার বয়স আরও বেশী! যাহা হউক, সকলই ভগবানের ইচ্ছা!

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়—সম্পাদক।
সাহিত্য সম্মিলন—ইছাপুরা, ঢাকা।

সান্ত্বনা।

দেবের বালক 'সুরেন'—সে যে
আস্‌ছিলো এই কাননে—
জোছ্‌নার পথে পরীর মতো
কমল-গোলাপ চয়নে।

তোমরা তখন স্নেহের ডোরে
রাখ্‌লে বেঁধে সোণার ঘরে,
কাট্‌বে বাঁধন সে যে ভোরে—
সেই কথাটী না জেনে!
বাঁচ্‌তো যদি বাঁচ্‌তো কমল—
আহা! বাঁচ্‌তো অরুণ-কিরণে।
জোছ্‌না-রথে আস্‌ছিলো সে,
জোছ্‌না-রথেই গেছে চলে,'
তাইতো তোমরা কাঁদ্‌ছো আহা!
ভাসিয়ে বক্ষ নয়ন-জলে!
তোমাদের মাণিক নয় তো সে;
দেবের বালক অমি এসে,
অম্‌নি র'য়ে অম্‌নি হেসে,'
অম্‌নি আবার যায় যে চলে'!
এই কাননে অমন ধারা
চিরটী কাল আস্‌ছে চলে'।
স্বরগ হ'তে কুসুম এসে
সাজায় মধু-শরৎকাল, –
সব সুষমা আবরি' ফেলে
বর্ষা-শীতের কুহেলী-জাল!
চেওনা এথা হেরিতে তারে,—
গান শোনো' তার বীণার তারে,—
দেখ্‌বে—তারে দেখ্‌বে পরে,
কাট্‌বে যখন মায়ার জাল—
ওই ওপারে ফুলের বনে,
দেখ্‌বে তারে চিরকাল।

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যোতিরিন্দ্র।

শব্দ-চিন্তা।

অতিথি। পুরাকালে বনবাসী ঋষিগণ উপবাস—তিথির অবসানে পারায়ণ (পারণা) জন্য গৃহস্থের আলয়ে সমাগত হইতেন। একাদশী আদি উপবাস তিথির অবসানে আগত বলিয়া অভ্যাগত ঋষির অ—তিথি খ্যাতি।

আপ্যায়িত। অতিথি উপনীত হইলে গৃহস্থ তাঁহাকে বিনয় সম্ভাষণে আহ্বান করিয়া তাঁহার চরণে পাদ্য-সেচনে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেন।

অর্ঘ্য। তৎপরে গৃহস্থ অতিথির পথশ্রম অপনোদন জন্য তাঁহার ঘ্রাণার্থে দূর্ব্বা ও অক্ষত দানে পূজা করিতেন।

মধুপর্ক। পথশ্রম-জাত তৃষ্ণা দূরীকরণ জন্য গৃহস্থ দধি, দুগ্ধ, তক্র, ঘৃত, শর্করা, মধু-মিশ্রণ (মধুপর্ক) দ্বারা আসনে উপবিষ্ট অতিথিকে দিতেন।

গোঘ্ন। মধুপর্ক পানে অতিথি সুস্থ হইলে নাপিত (গৃহ-ভৃত্য) অতিথির দর্শন জন্য তাঁহার সম্মুখে গরু উপস্থিত করিত। এবং অতিথির পছন্দ হইলে পশু-হত্যা হইত।

এই পশুহত্যা হইতে অতিথির "গোঘ্ন" খ্যাতি।

মহর্ষি বাল্মিকির সময়ে অতিথিকে গো নিবেদনের প্রথা ছিল। যথা :— শ্রীরাম আগমনে ভরদ্বাজ—

"উপানয়ত ধর্ম্মাত্মা গাম্ অর্ঘ্যং উদকম্ ততঃ"

অগস্ত্য-আদি মুনিগণের আগমনে শ্রীরাম

"পাদ্য-অর্ঘ্য-আদিভিঃ আনর্চ্চ
গাম্ নিবেদ্য চ সাদরম্"

বেদে বরপাত্র ও রাজা আদি পঞ্চ শ্রেষ্ঠ অতিথি নির্দ্দিষ্ট আছে। বরপাত্রকে পাদ্য অর্ঘ্য আসন ও মধুপর্ক প্রদত্ত হইলে নাপিত "গৌ গৌঃ" (গৌঃ গৌঃ) শব্দে রজ্জু ধারণপূর্ব্বক বরপাত্রকে পশু প্রদর্শন করে। ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত বরপাত্র তৎক্ষণাৎ মন্ত্র পড়েন :—

"মুঞ্চ গাম্.................."

এই বেদমন্ত্রবলে পুরাণকারগণ :—

"..................মধুপর্কে পশোঃ বধঃ"

নিষেধ করিলেন। কিন্তু হিন্দু এই নিষেধ ভঙ্গে পালন করিতেছেন। গণ্যমান্য অতিথি উপস্থিত হইলে ছাগবধ হইত, এখন মেষে টান পড়িয়াছে।

কুশল। তৎপরে আলাপ পরিচয়। কুশ সুলভ হইলেই ঋষির হোমাদি সচ্ছলে চলিত এবং ঋষি কুশ-ল সম্ভোগ করিতেন। তাই বলে,—

"ব্রাহ্মণম্ কুশলম্ পৃচ্ছেৎ"

রন্ধন সমাপ্তে ভোজ্যের উত্তম—অংশগুলি সর্ব্বাগ্রে অতিথি পাইতেন। অতিথি-সৎকারের এই নিয়ম। গোভিল গৃহ্য-সূত্রের এই সনাতন নিয়ম বঙ্গে ভঙ্গে পালিত হইতেছে।

বিধবা। ধব অর্থে বস্ত্র বা আবরণ (Coverture)। পতি বর্ত্তমানে নারী স-ধবা থাকে। এবং পতিহীন নারী বি-ধবা হয়।

দেবর। প্রাচীনকালে বি-ধবা স্বামীর কনিষ্ঠকে শয্যায আকর্ষণ করিত।

বিধবা দেবরম্ মর্যম্ আক্ৃণুতে (১০।৪০।২ঋ)

তাই মনুর মতে (৯।৬৯।৬০-৭০) বিধবা কন্যকা একটী পুত্র লাভ কাল তক স্বামীব কনিষ্ঠকে বিবাহ করিতে পাবেন। এই প্রথা হইতে স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারীর দে-বর হইয়াছেন, এখন তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহকালে নিদ্-বর বা কোল-বর হইয়া বরযাত্রে গমন করেন।

হিন্দুর জাতি-বিশেষে এখনও এই প্রথা চলিত আছে।

যিহুদি জাতির মধ্যে এ প্রথা চিব বিরাজিত আছে। তবে মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্র-উক্ত বিধির কিছু ইতব বিশেষ বাইবেলে দেখা যায়। ঐ শুন মুষা বলিতেছেন (ডিউ ২৫।৫—১০):—

যদি ভ্রাতৃগণ একত্রে থাকে এবং একের মরণ হয় এবং কোন পুত্র সন্তান না থাকে, তবে মৃতের বি-ধবা অপরিচিতকে বিবাহ করিবে না। তাহার স্বামীর ভ্রাতা তাহাতে উপগত হইবে। এবং তাহাকে স্ত্রীত্বে গ্রহণ করিবে। এবং স্বামীর ভ্রাতার কর্ত্তব্য পালন করিবে।

প্রথম সন্তান মৃতের নাম ধারণ করিবে। যাহাতে মৃতের নাম ইস্রেল হইতে বিলুপ্ত না হয়।

যদি ভ্রাতা মৃতের বিধবাকে গ্রহণ না করে, তবে সে বিধবা (নগরের) দ্বারদেশে বৃদ্ধগণের সমীপে উপস্থিত হইবে এবং বলিবে যে, আমার স্বামীর ভ্রাতা ইস্রেলে মৃতের নাম রক্ষায বিমুখ। তিনি আমাতে স্বামীর ভ্রাতার কর্ত্তব্য পালন করেন না।

তখন নগর বৃদ্ধগণ তাহাকে ডাকিবে এবং সমস্ত বলিবে। যদি তিনি উপস্থিত হইয়া বলেন যে, আমি উহাকে চাহি না।

তখন তাহার ভ্রাতৃবধূ বৃদ্ধগণের সাক্ষাতে তাহার নিকট আসিয়া তাহার জুতা খুলিয়া লইবে এবং তাহার মুখে থু দিবে। এবং উত্তরে বলিবে যে, ভ্রাতার বংশ-রক্ষায় বিমুখ ভ্রাতার এই গতি হইবে।

ইস্রেলে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবে এবং তাহার আলয়কে "জুতা খোলার আবাস" বলিবে।

(যাযু ২২।২৪ দেখ) বেদ ও মনুস্মৃতি সম্মত এই প্রাচীন প্রথা অগ্নিপুরাণ-কার এক শ্লোকে ভারত ছাড়া করিয়াছেন।

"দেবরেণ সুত উৎপত্তিঃ
মধুপর্কে পশোঃ বধঃ"

কল্পনা বলে যেমন এক ব্রহ্ম হইতে তেত্রিশকোটী দেবতা স্বর্গময় হইয়াছে।

"সাধকানাম্ হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা" (গীতা)

তেমনি সাজ সরঞ্জামে আসবাব পত্রে স্বর্গ ঢাকিয়া গিয়াছে।

অলীক। স্বর্গের নাম অলীকং পদ (Olympos) কিন্তু অলীক কথা কেহ মানে না।

আন্‌কা। স্বর্গের আনক (পটহ) হইতে আন্‌কা কথা হইয়াছে।

আজগবী। স্বর্গের অজগবী ধনু (শিবধনু) হইতে আজগবী কথা হইয়াছে। শিবচক্ষু হইতে মানব মহানিদান আবিষ্কৃত হয়।

ভগবতী শিবা শঙ্করী হইতে দুগ্ধবতী গাভী ভগবতী ও চিন ভগবতী শিবা ও শঙ্করী হইয়াছে।

স্বর্গের "মন্দারঃ পারিজাতকঃ"

ধরাধামের পাল্‌টে মান্দার।

রৌদ্র। সূর্য্যমণ্ডলের অধি-দেবতা রুদ্রদেবের (১) রুদ্রতেজ বা রৌদ্রকে আমরা সূর্য্য-কিরণ বলি।

রুদ্রদেবের বর পুত্র রাক্ষসগণও রৌদ্র নাম ধারণ করে।

রবি-রাবণ। বিশ্রবা রবির পুত্র রাবণ বটে। রবি ও রাবণ উভয়ের মূলে রব।

---

(১) "শিবাধি-দৈবতম্ সূর্য্যম্"।

লক্ষ্মী। লক্ষ্ম (কলঙ্ক) হইতে শ্রীগত পূর্ণচন্দ্র লক্ষ্মী নাম ধারণ করেন। তাই কো জাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে (চন্দ্রে দর্শ কালে) লক্ষ্মী পূজার বিধি।

অলক্ষ্মী। অমাচন্দ্র লক্ষ্ম হীন বলিয়া অলক্ষ্মী নাম ধারণ করেন। তাই অমা দিনে হল কর্ষণ নিষ্ফল বলিয়া নিষিদ্ধ। অলক্ষ্মী ও অ-হল্যা তুল্যমূল্য। তাই অমানিশাতে শ্যামাপূজার অগ্রে অলক্ষ্মী পূজা হয়।

শনি। মন্দগতি হইতে শনৈশ্চর শনি।

অশনি। দ্রুতগতি হইতে বজ্র অশনি নাম পাইল।

মঘপুষ্প। মঘা নক্ষত্রের ন্যায় শুভ্রকান্তি হইতে কুন্দফুল মঘপুষ্প নাম পাইল।

অগস্ত্য পুষ্প। অগস্ত্য তারার আকার ধারণ করে বলিয়া বকপুষ্প--অগস্ত্য পুষ্প নাম পাইল।

করতোয়া। হেমবতীর বিবাহে হর কর-নিঃসৃত তোয় হইতে করতোয়া নদীর নাম।

বাহুদা। স্মৃতিকার লিখিত মুনির বাহুদানে বাহুদা নদীর নাম।

বাশিষ্ঠী। বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম হইতে গোমতী নদীর নাম বাশিষ্ঠী হইল।

গৌতমী। গৌতম অগস্ত্য মুনির আশ্রম হইতে গোদাবরীর নাম গৌতমী।

গণ্ডকী। ক্ষুদ্র গণ্ড শৈল হইতে গণ্ডকী নদীর নাম। এই গণ্ডশৈল শালগ্রাম পল্লীর ঘাটে থাকে বলিয়া গণ্ড-শিলার নাম শালগ্রাম শিলা।

কৌশিকী। বিশ্বামিত্র-স্বসা কুশিকরাজনন্দিনী কৌশিকী নদী-রূপা হইয়া কৌশিকী নামে খ্যাত।

কাবেরী। কাবের মুনি-কন্যা কাবেরী পিতার পাপ মোচনার্থে নদীরূপা হইয়া কাবেরী নাম ধারণ করেন।

কর্ম্মনাশা। বৃত্র বধ-জনিত ব্রহ্ম-হত্যার পাপ ক্ষালনে নদী "কর্ম্মনাশা" নাম পাইল।

নর্ম্মদা। দেবগণের নর্ম্ম (ক্রীড়া) দানে খরস্রোতা মেখলা নদী নর্ম্মদা নামে খ্যাত।

অলকানন্দা। কুবেরের অলকাপুরীর আনন্দবর্দ্ধনে অলকানন্দা নাম।

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

অনাথিনী।

(গল্প।)

আপন বলিতে সারা সংসারে আমার কেহই ছিল না। বোধ হয় এ অবস্থাতেই আমি দেশত্যাগ করিয়া পাহাড়ে দেশে চলিয়া যাই। সেই হইতে দেশের সহিত আমার সকল সম্বন্ধ উঠিয়া যায়।

আমরা জাতিতে গোয়ালা। অগত্যা আমরা চিরন্তন পৈত্রিক ব্যবসাটাই অবলম্বন করিব স্থির করিলাম; কারণ আমি আধুনিক সভ্য-জগৎ সম্মত ইংরাজি বিদ্যা একেবারেই অভ্যাস করি নাই। সুতরাং 'ভাগ্যহীন মোর মত' যে কেরানীকুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার একান্ত অনুপযুক্ত, সে কথা না বলিলেও চলে। তবে চেষ্টা করিলে হয় ত জমাদারী সেরেস্তায় সরকারী মিলিতে পারিত। কিন্তু আমি সে চেষ্টাও করি নাই, আর সে সরকারীও আমার জুটে নাই।

দার্জ্জিলিংএর কাছেই একটা পল্লীর মধ্যে আমি একটা আস্তানা গাড়িয়াছিলাম। সেই স্থান হইতে নিত্য প্রাতে একটী গাড়ী করিয়া সহরের মধ্যে দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইতাম, পাহাড়ী বাঙ্গালীমহলে অল্প দিনেই আমার বেশ পসার হইয়া গেল। দুই পয়সা আয়ও বাড়িয়া গেল। সুতরাং নিত্য প্রভাতে পল্লী হইতে সহরের মধ্যে দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাওয়া, আমার পক্ষে স্নানাহারের ন্যায় একটা নৈমিত্তিক কর্ম্মের মধ্যেই গণ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

ভোর পাঁচটার সময় আমি দুধের গাড়ীতে ঘোড়া যুড়িয়া সহরে যাত্রা করিতাম। রাস্তার দুই পার্শ্বের গাছের কাল ছায়া প্রভাত-প্রায় গগনের ঈষৎ অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট দীর্ঘাকার মানব মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হইত। প্রভাতের স্বাস্থ্যময় শীতল সমীরণ আমার কানে কানে কত আশার কথা বলিয়া যাইত; আর কৈশোর ও যৌবনের মধ্যপথবর্ত্তী আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঘোড়ার রাশটা ধরিয়া বসিয়া থাকিতাম। স্বপ্নের ছবির মত কত অস্পষ্ট কথা আমার মনে হইত, মুগ্ধভাবে নীরবে বসিয়া কত কথা যে আমি ভাবিতাম, তাহার ইয়ত্তা নাই।

আমার অভ্যস্ত অশ্বটী ধীরে ধীরে পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া সহরের পথে অগ্রসর হইত। আমাকে সে জন্য কোন কষ্টই করিতে হইত না। প্রথমে

একটী দেশী হোটেল, তাহার পর পল্লী। বাবুদের বাড়ীর দোর গোড়ায় আমার নির্দ্দিষ্ট অশ্বটী আপনিই থামিয়া দাঁড়াইত। আমি সেই অবসরে আকাশের দিকে নীরবে চাহিয়া বসিয়া থাকিতাম। সহস্র কিরণমালী সূর্য্যদেব পর্ব্বতের মধ্য দিয়া পৃথিবীর উপর প্রথম দৃষ্টি ফেলিতেন,—আঃ, সে কি সুন্দর দৃশ্য। পর্ব্বতের সহস্র শীর্ষ রামধনুর মত বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিত, যেন হিমালয় রাজবেশ পরিধান করিয়া, শত শত হীরক বিশিষ্ট রাজমুকুটে মস্তক শোভিত করিয়া মহিমময় সৌম্যমূর্ত্তিতে প্রজার সুখ দুঃখ নিরীক্ষণ করিতেছেন। পক্ষিগণ নিম্নে কোলাহল করিত। তখন আমার চারণমুখ-বিনিঃসৃত রাজ আহ্বান গীতে পরিণত হইত। মুহূর্ত্তেই আবার সে মূর্ত্তি মিলাইয়া যাইত, তাহার পর থাকিত শুধু রক্তাক্ত প্রভা, আর তাঁহার সপ্তাশ্ব-বাহিত রথ। আর থাকিত—কেতুগণের বায়ুর সহিত মিলন-গীতি,—সর্ সর্, সর্ সর্।

প্রভাতের ক্ষীণ আলো পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে উঁকি মারিত। সে আবার আরও সুন্দর দৃশ্য। গাঢ় নীল পাহাড়গুলি সোণালী রঙে রঞ্জিত বলিয়া মনে হইত। এইরূপ নানা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমি আত্মহারা হইয়া পড়িতাম। এমন সময় আমার গাড়ী আসিয়া হোটেল দ্বারে দাঁড়াইত। আমার মোহ ছুটিয়া যাইত, আমি আবার কর্ম্মময় জগতে ফিরিয়া আসিতাম।

হোটেলের সম্মুখে তাহার ভৃত্য একটী টব পাতিয়া থাকিত। আমার গাড়ীর শব্দ পাইলে একজন লোক আসিত। সে টবটী ঘরে লইয়া যাইত।

একদিন এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। আমার গাড়ীর শব্দ পাইয়াও কোন ভৃত্য বাহিরে আসিল না। আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। কিন্তু সে কথা ভাবিবার আমার কোনই আবশ্যক নাই বুঝিয়া, আমি দৈনিক যেমন টবটী দুগ্ধপূর্ণ করিয়া দেই, সে দিনও তেমনি দিলাম। তাহার পর গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া গাড়ী চালাইতে উদ্যত হইলে, একটা দ্বার খোলার শব্দ পাইলাম। পশ্চাতে ফিরিতেই দেখিলাম, একটী বালিকা ধীরে ধীরে দুগ্ধ-পূর্ণ টবের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। বালিকা অত্যন্ত কৃশাঙ্গী, গৌর বর্ণ, তাহার দেহখানিতে অস্থির সংখ্যা অল্লায়াসেই নির্ণয় করা যায়। চোখ দুইটী গাঢ় নীল—ডাগর ডাগর! বয়স বোধ হয়, একাদশ বৎসরের অধিক হইবে না। তাহাকে দেখিলেই মনে কেমন একটা করুণার সঞ্চার হয়,—"আহা বেচারী!" প্রথম দর্শনেই আমার মনে হইল, লোকে বলে এবং আমি নিজেও

দেখিতেছি, দার্জ্জিলিংএ স্বাস্থ্যের রাজত্ব, তবে এ বালিকা এত কৃশাঙ্গী কেন? কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে? আবার মনে হইল,—"তবে বুঝি নতুন এসেছে? হ্যাঁ, তাই হবে।" আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আজ তুমি যে?—"

নম্র স্বরে বালিকা বলিল,—"হ্যাঁ—"

বালিকা দুগ্ধের পাত্রটী লইতে যাইতেছিল। আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—"দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমার কথা এখনো শেষ হয় নি। আচ্ছা, তুমি ছিলে কোথা, থাক কোথা?"

বালিকা তেমনি সঙ্কুচিত ভাবে বলিল,—"সংসারে আমরা মায়ে ঝীয়ে ছিলুম, এখন অভাগিনী আমি অনাথা। হোটেলের কর্ত্তা দয়া ক'রে আমায় আশ্রয় দিয়েছেন। কাল থেকে আমি এই খানেই আছি।"

বালিকার ইতিহাস শুনিয়া আমি অন্তরে বড় ব্যথা পাইলাম, মনে হইল,—"আহা বেচারী, এও তা'হলে আমারই মত নিঃস্ব,—বান্ধব-হীন।" প্রকাশ্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি জাত তোমরা?"

"গোয়ালা।"

"গোয়ালা? ঠিক জান?"

"হ্যাঁ—"

আমি আর কিছু বলিলাম না। বালিকা দুগ্ধপূর্ণ টবটী কষ্টে তুলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। আমি কিয়ৎক্ষণ তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলাম। বাস্তবিক বালিকার অদৃষ্টের ফের দেখিয়া আমার অন্তরে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল। দুরেরা বুঝিয়া কেবলই মনে হইতেছিল,—"আহা, বেচারা বড় অনাথিনী—বড় অভাগিনী।"

যেদিন হইতে আমি বালিকাকে দেখিলাম, সেইদিন সেই মুহূর্ত্তেই আমি তাহার জন্য করুণা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার চরিত্রে আর একটু পরিবর্ত্তন ঘটিল, আর প্রভাতের আলো আমার নিকট তেমন রঙ্গীন, তেমন সুন্দর ঠেকিল না। কি যেন কি একটা তাহাতে নাই।

সকলের চেয়ে আমার ভাল লাগিয়াছিল—বালিকার সেই বিষাদমাখা ডাগর ডাগর চোখ দুটা! কি করুণ সে দৃষ্টি। সারাদিনের মধ্যে কম করিয়া পঞ্চাশবার তাহার কথা আমার মনে জাগিতে লাগিল। তাহার স্মৃতি হইতে কিছুতেই আমি আপনাকে মুক্ত করিতে পারিলাম না। একটা নেশার মত সে আমার বেষ্টন করিয়া রহিল।

পরদিন আমি যখন দুগ্ধ দিতে গেলাম, সে তখন আমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, আহা বেচারা জন্মদুঃখিনী, অনাথিনী, বড় স্নেহের কাঙ্গাল! স্নেহ করিবার মত তাহার একজনও নাই! আমি দুগ্ধপাত্র পূর্ণ করিতে করিতে তাহাকে প্রশ্ন করিলাম,—"তোমার নাম কি?"

অতি মৃদুকণ্ঠে বীণার করুণ সুরের মত উত্তর হইল,—"কমলা।"

"বাঃ! কি সুন্দর নামটী। কি বল্লে? কমলা?"

বালিকা নত নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি পাত্র পূর্ণ করিয়া দিলে, সে একটু সঙ্কুচিত ভাবে সেটী তুলিয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যতা হইল। আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—"দাঁড়াও কমলা, এই লেবুটা নাও—গাছপাকা ফল!"—সেদিন আমি পথে আসিতে আসিতে একটা গাছপাকা লেবু পাইয়াছিলাম। বালিকাকে সেইটী আমার স্নেহের প্রথম উপহার দিলাম।

বালিকা সেটী আমার হস্ত হইতে সাগ্রহে গ্রহণ করিল; তাহার পর দুগ্ধের পাত্রটী লইয়া হোটেলের মধ্যে চলিয়া গেল। কি জানি কেন অজ্ঞাতে একটী দীর্ঘশ্বাস আমার হৃদয় ভেদ করিয়া শূন্যে মিশাইয়া গেল।

সেইদিন হইতে প্রায় প্রত্যহই আমি কমলার জন্য কিছু না কিছু উপহার আনিতাম।

প্রণয়-দেবতা আমাদিগের অলক্ষ্যে বসিয়া কি কল পাতিতেছিলেন, তাহা না বুঝিতে পারিলেও এটা বেশ বুঝিয়াছিলাম যে আমাদের বন্ধন,—স্নেহের বন্ধন ক্রমে গাঢ় হ'তে গাঢ়তর হইয়া আসিতেছিল। আমার আসিতে কোনদিন বিলম্ব হইলে দেখিতাম, কিশোরী তাহার করুণ দৃষ্টিপূর্ণ ডাগর ডাগর চোখ দুটী তুলিয়া আমারই আগমন-পথের দিকে চাহিয়া আছে। আমার চোখের সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিলেই ক্ষণেকের তরে নয়নের বিষাদের ভাব কাটিয়া গিয়া আনন্দদীপ্তি ফুটিয়া উঠিত! আর আমারও নীরস প্রাণের মধ্যে যে একটা আনন্দের লহর ছুটিয়া যাইত না, একথা বলিতে পারি না।

কিন্তু সারাদিনান্তে এ ক্ষণিকের মিলনও বিধাতার প্রাণে সহিল না। একদিন দুগ্ধ দিতে আসিয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও কমলার সাক্ষাৎ পাইলাম না। একবার আমার মনে হইল,—"তবে বোধ হয় তাহার কোন অসুখ হইয়া থাকিবে।" চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটা আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি? তখন একজন ভৃত্য হোটেলের দুগ্ধ লইয়া

চলিয়া গিয়াছে, তবে আর কাহাকেই বা তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিব? আর, ছিঃ! লজ্জা করে না? কেহ যদি বলে,—"তার খোঁজে তোমার দরকার কিহে? সে তোমার কেউ হয় নাকি?" তখন আমি কি উত্তর দিব? সত্যই ত সে আমার কে, যে তাহার জন্য আমি এত চিন্তিত হই? সেও কি আমার জন্য এমনি করিয়া চিন্তা করে? কে জানে।

সে দিনটা আমার নিকট নিতান্ত ব্যর্থ বলিয়া মনে হইল। কোন কর্ম্মেই ঠিক করিয়া মন লাগাইতে পারিলাম না।

পরদিন গেল,—তাহার পরদিন,—তাহার পরদিন, ক্রমে মাস কাটিয়া গেল, কিন্তু তথাপি আমি আমার নয়নানন্দদায়িনীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। আমার মনের সুখ কর্পূরখণ্ডের ন্যায় একটু একটু করিয়া উবিয়া যাইতে লাগিল। কেন তাহা কে বলিয়া দিবে?

কয়েক মাস কাটিয়া গেল। এ কয়মাসের মধ্যে একদিনও কমলার দর্শন পাই নাই। একদিন প্রাতে নিয়ম মত আমি হোটেলে দুগ্ধ দিয়া স্থানান্তরে যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছি, এরূপ সময়ে একটা কর্কশ পুরুষ-কণ্ঠ আমি শুনিতে পাইলাম। কৌতূহলী হইয়া হোটেলের দ্বারের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, একটী কিশোরী সিক্ত-নয়ন মার্জ্জনা করিতে করিতে বাহির হইতেছে, আর তাহার পশ্চাতে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে দিতে হোটেলওয়ালা স্বয়ং আসিতেছেন। আমি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম—কিশোরী আমারই নয়নের মণি 'কমলা'!

ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। একবার মনে হইল, হোটেলওয়ালাকে এক মুষ্ট্যাঘাতে ভূতলশায়ী করিয়া অবলা কমলার প্রতি অযথা অত্যাচারের প্রতিফল লই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল, তাহাতে কমলার কোন উপকার ত হইবেই না, উপরন্তু আমার শ্রীঘরবাসের বন্দোবস্তও হইয়া যাইতে পারে। কাযেই সে কর্ম্মে বিরত হইলাম।

হোটেলওয়ালা কর্কশ স্বরে কহিলেন—"খবরদার বেটী, আমার বাড়ীর ত্রিসীমানায় আর পা দিবি না। অনাথা দেখে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলুম, তার ত খুব ফল পেলুম। অমন মোটা সোণার চেনটা চুরি ক'রে নিলি। তা বেশ হ'য়েছে—আমারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে, এখন এখান থেকে বেরোও;—যে চুলোয় হয় যাও।" গজর গজর করিতে করিতে তিনি প্রস্থান করিলেন।

আমি কমলার নিকট গিয়া বলিলাম,—"চল কমল, আমার বাড়ী তুমি থাক্‌বে।"

সে অশ্রুসিক্ত নয়নে আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"কিন্তু আমি যে চোর।"

আমি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম,—"হ'তে পারে না, নিজে চোখে দেখ্‌লেও আমি তা বিশ্বাস করি না।"

সে তাহার ডাগর ডাগর চোখ দুটী আমার মুখের উপর রাখিয়া বলিল,—"কেন?"

"কেন?—কেন তা জানি না, আমার মন ব'লচে,—তুমি আমারই মত নিরীহ।"

তাহার নয়ন বহিয়া অজস্রধারে অশ্রু ছুটিল। উর্দ্ধমুখে চাহিয়া সে বলিল,—"ধন্য ভগবান, তবু এখনো একজন আমায় নির্দ্দোষ—নিরীহ মনে ক'রে,—সেই আমার যথেষ্ট।"

"আর শুধু তাই নয়, আমি তোমায় বিশ্বাস ক'রে আমার হৃদয়ের চাবি দেব, তাও স্থির করেছি।"

এবার কমলা লজ্জায় মুখ নত করিল।

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূধর ও জলধর।

গিরি কহে, "মেঘ তব ভাল বীরপণা,
লুণ্ঠিত চরণে কেন হ'য়ে জলকণা?
আশ্রিতের প্রতি আমি বড়ই সদয়,
বৃথা ডেকে মর কেন দিতেছি অভয়।"
জীমূত হাসিয়া কহে, "আমি কামচার,
মোর শব্দে জলমগ্ন মৈনাক পাহাড়;
বজ্রে তব পক্ষ কেটে করেছি অচল,
পুনঃ যদি উঠে পাখা খুঁজি অন্তঃস্থল।"

শ্রীপ্রাণবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

মাতৃত্বের পুষ্টি।

এই মোহময় জগতের মোহ-মাদকতা জীবের ধর্ম্ম-পথ রোধ করে। জীব মোহের চতুরতায় আপনাকে আপনি বুঝিতে সমর্থ হয় না। সে যে সুখের স্বর্গধাম হইতে আসিয়াছে, সে যে মহামহিমান্বিত মহারাজাধিরাজ রাজ-রাজেশ্বর পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকট হইতে এই মর্ত্ত্যধামে আসিয়াছে, ইহা তাহার স্মরণ থাকে না। সে আত্মবিস্মৃত হয়। তাহার জীবন যে পদ্ম-পত্রস্থিত জলবিম্ববৎ টলটলায়মান, তাহার জীবনের সুখ যে ক্ষণস্থায়ী, ইহা তাহার স্মরণ থাকে না। সে সংসারের অনন্ত জনস্রোতের অনন্ত কোলা-হলের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে।

তবে যে বাল্যে জননীর নিকট হইতে সুন্দর মঙ্গলময় উপদেশ লাভ করি-য়াছে, সে কালে ধর্ম্ম-পথে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। আমরা বুঝিতে পারি, বাল্যের শিক্ষা আমাদের জীবনের প্রধান ভিত্তি। চরিত্রোপযোগী সমুদয় সদ্‌গুণ বাল্যেই মানব-হৃদয়ে রোপিত হয়। মানব তাহা আবার শিক্ষার প্রভাবে মার্জ্জিত করিয়া তোলে। মাতা সেই সকল সদ্‌গুণ সন্তানকে বাল্যেই শিক্ষা দেন।

মাতা তাহা আবার তাঁহার মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন, দেশের বালিকাগণই দেশের ভাবী-সন্তানের মাতা। তাহারাই কালে সন্তানের মাতা হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিবে। তাহাদেরই হৃদয়ে মাতৃত্ব রহিয়াছে। সেই মাতৃত্ব পুষ্টির জন্য জনক-জননীর প্রধান কর্ত্তব্য, বালিকাদিগকে সৎশিক্ষা প্রদান করা।

মাতৃত্ব আর কিছুই নহে, তাহা কেবল কতকগুলি সদ্‌গুণের সমষ্টি মাত্র। স্নেহ, দয়া, পরোপকার, ভক্তি, প্রীতি, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান, শৌর্য্য, বীর্য্য, সততা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের সমবায়ই মাতৃত্ব। বাল্যে যাহাতে ঐ সকল গুণ বালিকার হৃদয়ে সুন্দর রূপে পুষ্টিলাভ করিতে পারে, পিতা-মাতার তাহাতে মনোযোগ প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন।

মনুষ্য-হৃদয় পরম কারুণিক জগৎ-পিতার মহিমায় মহিমান্বিত। তাহাতে যখন কোন পাপ প্রবেশ করে, তখন তাহা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে থাকে। স্বর্গ যেমন পাপের অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না, হৃদয়ও সেইরূপ পাপের

অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না, পাপের প্রবল অত্যাচারে হৃদয়ে নানা রোগ উৎপন্ন হয়; তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

সেই জন্যই পিতা-মাতার প্রধান কর্ত্তব্য,—যাহাতে বালিকার হৃদয় ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে চেষ্টা করা। তাহা যদি না করেন, তবে স্বর্গের ন্যায় পবিত্র হৃদয় কুশিক্ষায় নরক হইয়া উঠে।

বালিকার হৃদয় স্বভাবতঃ স্নেহ প্রবণ। সেই স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে মাতৃত্বের বীজ বপন করা অতি সহজ। বালিকা যাহাতে স্নেহ, দয়া, সরলতা, সন্তান-বাৎসল্য, ভক্তি, প্রীতি, পরোপকার, প্রেম, অনুরাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা, সাধুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি শিক্ষা করিতে পারে, তাহাই করা আমাদের প্রধান করণীয় কর্ম্ম। কারণ, উহারাই ভাবী সন্তানের মাতা। সে যদি শৈশবে ঐ সমুদয় গুণরাশি প্রাপ্ত না হয়, তবে সে কেমন করিয়া তাহা সন্তানকে শিক্ষা প্রদান করিবে?

মাতার মাতৃত্বের ন্যায় অমৃতময় পদার্থ জগতে আর আছে কি না সন্দেহ! অমৃত সেবন করিলে মানব অমর হয়, কিন্তু যিনি মাতৃস্বরূপ অমৃত সেবন করিয়াছেন, তিনি এই নর-জগতের অমর, কারণ জগিয় শোক তাপ; প্রবঞ্চনা, সত্য মিথ্যা জড়িত সংসারে পাওয়া বড়ই দুষ্কর, সুতরাং জগতে মাতৃত্বই আমাদের সুধার কার্য্য করে।

বাল্যে বালিকার হৃদয় আমাদের হৃদয় অপেক্ষা কোমল থাকে। সেই কোমল হৃদয়ে যাহাতে মাতৃস্বরূপ বৃক্ষের বীজ রোপিত হয়, তাহার চেষ্টা করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। বৃক্ষের বীজ যেমন তাহার ক্ষুদ্র কোষে আবদ্ধ থাকে ও কালে তাহা মাটিতে উপ্ত হইয়া জল, বায়ু, উত্তাপ প্রভৃতির সহায়তায় বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়, সেইরূপ মাতার সমস্ত গুণরাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকার হৃদয়ে আবদ্ধ থাকে, পরে তাহা উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি সহায়তায় মহান্ মাতৃত্বে পরিণত হয়।

শূন্য মণ্ডল যেমন সমগ্র জগতের আধার, সেইরূপ হৃদয়াকাশও সমস্ত গুণের আধার। অনন্ত গগনমণ্ডল যেমন সমস্ত পদার্থ নীরবে ধারণ করিয়া আছে, তেমনই আমাদের হৃদয়ও সবই নীরবে ধারণ করিয়া আছে। পুরুষের হৃদয় অপেক্ষা স্ত্রীর হৃদয় ধারণক্ষম। তাই রমণী নীরবে গর্ভবেদনা সহ্য করিতে সমর্থ। সেই জন্যই রমণী জাতি মাতৃস্থানীয়া।

পৃথিবী আমাদের শাস্ত্রমতে প্রাণময়ী। কিন্তু তিনি প্রাণময়ী হইয়াও

আমাদের পদতলে নীরব নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিয়াছেন, আমরা অবাধে তাঁহাকে পদদলন করিতেছি, তিনি কিছুমাত্রও বলিতেছেন না। বরং আমাদের জীবন ধারণোপযোগী সমুদয় শস্যই তাহা হইতে অপহরণ করিতেছি; কিন্তু তিনি কিছুই বলিতেছেন না। তিনি যেন আমাদের মাতা, আর আমরা যেন তাঁহার স্নেহপালিত সন্তান। সন্তানের উপকারের জন্য মাতার যতটুকু মাতৃত্ব থাকার দরকার, তাহা তাঁহার হৃদয়ে আছে; আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। তিনি নীরবে মানবকে যে স্নেহ প্রদান করেন, তাহা মাতার স্নেহ অপেক্ষা মধুর। কিন্তু আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না বলিয়া আমাদের দশা এরূপ। আমরা যে বুঝিতে পারি না, তাহার অনেক কারণ আছে।

আমাদের আর্য্যনারীগণই আদিম অবস্থায় এই মহামহিমান্বিতা সাগর-বসনা ধরার নিকট হইতে বিনয়, স্নেহ, দয়া, মায়া, ভক্তি, প্রীতি, সহানুভূতি প্রভৃতি সমুদয় সদ্গুণই শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারা জগতে মাতৃত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ দেখাইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়েও আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, আমরা যেন বালিকা-দিগকে পৃথিবী হইতে মাতৃত্ব গ্রহণ করিতে শিক্ষা প্রদান করি। পৃথিবীতে মাতৃত্বের যেমন পুষ্টি, বোধ হয় সমস্ত নারী-মণ্ডলীতে তাহার সেরূপ পুষ্টিলাভ ঘটে নাই। পৃথিবী একাধারে স্নেহময়ী, করুণাময়ী, দ্বেষশূন্যা, ক্রোধ-রহিতা,—সর্ব্বদাই যেন হাস্যময়ী। পৃথিবীর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, আত্মার পবিত্রতা সাধন করা একান্ত প্রয়োজন, কারণ ধরিত্রীর মাতৃত্ব বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে অধ্যাত্ম জগতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে হইবে।

আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচনায় হৃদয় পূত হয়। অনন্ত জগতের অনন্তত্ব বুঝিতে পারিলে, নিজকে অতি সামান্য—হেয়াদপি হেয় বোধ হয়। আকাশ অনন্ত। সেই অনন্ত গগনে আমাদের পৃথিবী অবস্থিত। সুতরাং পৃথিবীরও কিছু অনন্তত্ব আছে। তাই পৃথিবী মাতৃত্ব ও অনন্তত্বের আধার।

পৃথিবীর মাতৃত্ব বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে গেলে, তাহাদিগকে প্রকারান্তরে পৃথিবীর অসীমত্বও শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বুঝিতে পারে যে, আমরা কিছুই নহি, আমরা অনন্ত জগতের নিকট কত ক্ষুদ্র। আর স্নেহও অনন্ত। সেই অনন্ত স্নেহের বশীভূতা

হইয়াও বটে এবং উক্ত কারণেও বটে, মাতা স্বইচ্ছায় সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ করেন।

তাই, বালিকাগণ যাহাতে সহজেই পৃথিবীর মাতৃত্ব ও অনন্তত্ব বুঝিতে পারে, তাহার বিধান করা একান্ত প্রয়োজন।

বালিকার তরুণ হৃদয়ের পুষ্টি সাধন করা বড়ই কঠিন, সেই জন্য তাহার তরুণ হৃদয়ের পুষ্টি-সাধন করিতে হইলে, নিজকেও উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। সাধারণতঃ দেখা যায়, মাতাই বালিকাকে শিক্ষা দেন। সেই জন্যই মাতার বোঝা উচিত, আমরা যেমন সন্তানের মাতা, কালে উহারাও তদ্রূপ হইবে।

বালিকার হৃদয়ের ভাব মাতাই বুঝিতে পারেন। হৃদয়ে যাহাতে পাপ-স্পৃহা প্রবেশ করিতে না পারে, মাতার তাহাই করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ, হৃদয়ই মাতৃত্বের আধার। হৃদয় অপবিত্র হইলে, মাতৃত্বের মধ্যেও আবিলতার ছায়া আসিয়া পড়ে।

যাহা পবিত্র, যাহা চিরপ্রীতিপ্রদ, যাহা কামনাবিহীন, যাহা মঙ্গলময়, যাহা পুষ্পের মত সুন্দর, তাহাই আদর্শ। আদর্শ বলিলে, কোন ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষ বুঝা না; পরন্তু তাহাদের গুণসমষ্টি বুঝায়। মাতৃত্বে সকল গুণই অতি সুন্দর রূপে পুষ্টি-লাভ করিয়াছে। তাই মাতৃত্ব এত সুন্দর, এত পবিত্র, এত প্রেমময়, এত মঙ্গলময় বলিয়া জগতে আদর্শরূপে নীত।

মাতৃত্বের নিকট পাপ বা মোহ, অনন্ত মহাসাগরে ভাসমান তৃণখণ্ডের ন্যায় বেগে কোথায় ভাসিয়া যায়, কেহই তাহার উপলব্ধি করিতে পারে না।

মাতৃত্বের বিকাশে জগতের বিকাশ। মাতৃত্বের বিনাশে জগতের বিনাশ। ইহার এত সম্যক্ বিকাশ বলিয়া, জগৎও এত সুন্দর বিকশিত হইয়াছে। নচেৎ জগৎ কোন্ দিন ধ্বংসের মুখে চলিয়া যাইত!

বর্ত্তমান সময়ে মাতার মধ্যেও প্রায় স্বার্থপরতা, ঘৃণা, অহঙ্কার দৃষ্ট হইতেছে। তাহার প্রধান কারণ, মাতৃত্বের সম্যক্ পুষ্টি হইতেছে না। অধুনা যদি মাতার মাতৃত্বের সম্যক্ বিকাশ হয়, তবে মাতার স্নেহের পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা কেবল নিজ নিজ অহঙ্কারে মত্ত থাকি; বালিকা-দিগের শিক্ষার নিয়ম-প্রণালী সম্বন্ধে একবারও চর্চ্চা করি না। তাই আমাদের এত দুর্দ্দশা! আমরা যদি পুনরায় তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত

করি ও তাহাদিগকে সৎশিক্ষা প্রদান করি; তবে আবার তাহাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে পুষ্টিলাভ করিতে পারে।

বালিকাদিগকে কেবল বাসনমাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, রাঁধা প্রভৃতি শিক্ষা দিলে হইবে না; এ সকল ত আবশ্যকই, ইহার উপর লেখা পড়া শিক্ষা দিতে হইবে।

মাতার শিক্ষাদানের উপর বালিকার হৃদয়ের পুষ্টিসাধন সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সুতরাং বৎসর বৎসর বালিকাগণ সম্পূর্ণরূপে সৎশিক্ষা লাভ করিলে, আমরা কালে তাহাদের হৃদয়ে মাতৃত্বের পুষ্টিসাধন দেখিতে পাইব।

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী।

মাতৃপূজা।

কার্ত্তিকের অমানিশা ঘোর অন্ধকারে,
এলায়ে চিকুর-জাল ঘন কাদম্বিনী।
শত সূর্য্য-প্রভান্বিত মুকুট সুন্দরে
উজলি গগনতল তমসা যামিনী॥
অলক্ত রঞ্জিত পদ হর-হৃদি পরে
শ্বেত নদে বিকসিত রক্তোৎপল-সমা!
নীরদ বরণে মরি শত সুধা ঝরে
ঢালি সুপ্তা ধরা-বক্ষে অনন্ত সুষমা॥
আসিছ মা পুনঃ তুমি ভারত-মাঝারে
বৎসরের আশীর্ব্বাদ করিতে প্রদান।
হরিতে অশুভ যত, বরাভয় করে
উদ্ধারিতে দীন হীন অধম সন্তান॥
তাইতো ভারতবাসী মুছি আঁখিজল
বৎসরের দৈন্য দুঃখ শত হাহাকার
পাশরি, আনন্দ উৎসে হয়েছে বিহ্বল
পূজিতে মঙ্গলময়ী! চরণ তোমার॥
পূত স্নিগ্ধ নিরমল জাহ্নবী-সলিল
ভরি কোন ভাগ্যবান সুবর্ণ-কলসে।

অমরবাঞ্ছিত ওই চরণ-যুগল
অর্চ্চনা করিছে, মাগো মনের হরষে॥
কেহ বা পূজিছে তোমা পত্রের কুটীরে
পুষ্প দূর্ব্বা বিল্বদলে অর্ঘ্য করি দান।
অক্ষয় আশীষ তব লভিবার তরে
জননি! আকুল আজি সবার পরাণ॥
কিন্তু মা, জানি না তুমি তুষ্ট কিসে হও,
অভয় চরণ দুটী কিসের অধীন?
ভুবনমোহিনী রূপ মানবে দেখাও,
কোন ব্রতে ব্রতী নর পায় হেন দিন?
হায় মা, অধম আমি লৌকিক আচারে
সাজায়ে নৈবেদ্য, করি ছাগ বলিদান
পূজেছিনু ও চরণ, তাতে তো আমারে—
দিয়েছ তারিণী তুমি ভাল প্রতিদান॥
পূজা-উপচার সনে নিয়াছ হরিয়ে—
পরাণের শত সাধ—সুখের সংসার
ছাগ-শিশু মত, হায়! হৃদি বিদারিয়ে
তুলে নেছ জননী গো সর্ব্বস্ব আমার॥
তুমি বুঝি চাহ শুধু নির্ম্মল ভকতি,
অনাসক্ত মানবের পূত অন্তঃস্থল?
চাহ না বাহ্যিক পূজা সমাজের রীতি,
চাহ শুধু ভকতের প্রেম অশ্রুজল।
তাই যদি চাহ, তবে এস গো তারিণী
আদ্যাশক্তি সনাতনী জননী আমার।
নিদাঘ কুসুম-সম শুষ্ক হৃদিখানি
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া চরণ তোমার
পূজিব, জুড়াব দেবি! তাপিত পরাণ—
বাসনা কামনা ধীরে হবে অবসান॥

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা মজুমদার।

নূরজাহান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

মেহের চীৎকার করিয়া কহিল,—যুবরাজ, আমাকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিন ? যদি কেহ আপনাকে আমার সহিত এরূপ অবস্থায় দেখে, তবে আমারই সর্ব্বনাশ, আপনার বিরুদ্ধে কে কথা বলিতে সাহস করিবে ?

সেলিম। সুন্দরি ? সেজন্য তুমি কিছুমাত্র ভীত হইও না। আমার দেহে বিন্দুমাত্র শোণিত থাকিতে কাহার এমন সাধ্য যে সেলিমের হৃদয়েশ্বরী মেহের-উন্‌-নিসার চরিত্রে কলঙ্ক ঘোষণা করে ?

মে। সে যাহা হউক, যুবরাজ, আমাকে এখন বিদায় দিন ?

সে। সুন্দরি, তাহা হইবে না। তুমি আমার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেও হৃদয় হইতে যাইতে পারিবে না। সুন্দরি, তুমি যে আজ হ'তে আমার হৃদয়ের রাণী—প্রাণের প্রতিমা ;—আমি যে তোমা বই এ সংসারে আর কিছুই জানি না।

মে। যুবরাজ, হইতে পারে আপনি আমাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস এ ভালবাসা হৃদয়ের নয়—ইহা কেবল মুহূর্ত্তমাত্রের চিত্তবিভ্রম।

সে। সুন্দরি, আমি আল্লার নামে—খোদার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে ভালবাসি—এত ভালবাসি যে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার আমার ক্ষমতা নাই। যদি বিশ্বাস না হয়, তবে এই দেখ—দেখ তোমার জন্য আমি এই মুহূর্ত্তে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছি। এই বলিয়া সেলিম পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে তৎক্ষণাৎ একখানি শাণিত ছুরিকা বাহির করতঃ তাহা আমূল বক্ষে বসাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন।

মেহের তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হাত হইতে ছুরিকাখানি কাড়িয়া লইলেন।

মে। মাপ করিবেন যুবরাজ, এ অধীনীর ধৃষ্টতা মাপ করিবেন। আমি সত্য সত্যই জানিতাম না যে, যুবরাজের হৃদয় এই সামান্যা ভিখারিণীর জন্য

এতটা উন্মথিত হইয়াছে। যুবরাজ, আজ হ'তে আমিও—এই হতভাগিনীও—মেহের-উন্-নিসাও যুবরাজ সেলিমের—পদসেবিকা দাসী।

মেহেরের উত্তর শুনিয়া সেলিমের গণ্ডস্থল আনন্দে আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি অত্যধিক আনন্দে আত্মহারা হইয়া আরও দৃঢ়তার সহিত মেহেরের হস্ত ধারণ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মেহের বলিল, যুবরাজ, আমার পিতা-মাতা যদি আমাদের এই শুভ-সম্মিলনের প্রতিবন্ধক হন, তবে—

সেলিম মেহেরের কথায় বাধা জন্মাইয়া বলিলেন, সে ভার আমার উপর রহিল।

মেহের সেই কথা শুনিয়া আনন্দ-উদ্বেলিত নয়নে সেলিমের দিকে একবার সপ্রেম দৃষ্টি করিল। অমনি চারি চক্ষুর মিলন হইল, মেহের লজ্জাবনতমুখী হইলেন।

তখন সেলিম সেই সলজ্জা মেহেরকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করতঃ আপন বক্ষোপরি রাখিলেন। এবং তারপর—তারপর লিখিতে লজ্জা হয়, রূপোন্মত্ত সেলিম সেই বিশ্বসুন্দরীর আরক্তিম গণ্ডস্থলে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিলেন, আর একদৃষ্টে সেই সুধাংশু-বদনখানির প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। সেলিমের তখনকার ভাব দর্শনে বোধ হয়, যেন তিনি বলিতেছিলেন—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল;
লাখ লাখ যুগ হিয়া পর রাখিনু
তবু হিয়া জুড়ান না গেল।"

কিছুক্ষণ পরে মেহের উঠিয়া সেলিমের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল এবং অনতিবিলম্বে আপন মাতার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া শিবিকায় আরোহণ করতঃ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল। তখন সন্ধ্যাকাল সমাগত-প্রায়। দূরে পশ্চিম গগনে একখানি ক্ষুদ্র মেঘ হইতে বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষিত হইয়া অস্তগমনোন্মুখী রবিকে সাশ্রুনয়নে বিদায় দিতেছিল। সেলিম তাহা দেখিতে দেখিতে অশ্রু ও বিষাদ-ভারাক্রান্ত নেত্রে প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

(৫)

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। পৌর্ণমাসীর সমুজ্জ্বল কুমুদিনীনাথ একখানি সোণার থালার ন্যায় আকাশ-মধ্যস্থলে শোভা পাইতেছে। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য

নক্ষত্রসকল মিটি মিটি জ্বলিয়া আপনাদের অবস্থানের দূরত্ব ও অবয়বের ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। কচিৎ দুই একটী চকোর চন্দ্র-কিরণ-সুধা পানাশায় দূরে শূন্যমার্গে উড়িয়া বেড়াইতেছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ নীরব। কেবল মধ্যে মধ্যে কোন গৃহে সুষুপ্ত শিশুর নিদ্রা-ভঙ্গ বা ক্ষুধাজনিত ক্রন্দন, কোন বাটীর প্রাঙ্গণে দৌবারিক-কুলতিলক সারমেয়ের গম্ভীর রব এবং কোথাও বা ক্ষুদ্র লতাগুল্মের মধ্যে নিশাচর শৃগালাদি জন্তুগণের ধীর পদশব্দ শ্রুত হইতেছে। এমন সময় কে ঐ দুইজন পুরুষ-স্ত্রী গৃহের ঝুলবারান্দায় বসিয়া আছেন? গৃহের নিম্ন দিয়া নীল সলিলা যমুনা কল্ কল্ রবে প্রবাহিত হইতেছে, ইঁহারা কি তাহাই দর্শন করিতেছেন; অথবা মৃদু মন্দ মলয়ানিল উপভোগ করিতেছেন? না, তাহা নহে। এই পুরুষ ও স্ত্রীলোকটী আমাদের পূর্ব্বপরিচিত গিয়াস্‌বেগ ও তাঁহার পত্নী।

গিয়াস্ পত্নী। দেখ! দেখ! কেমন সুন্দর রাত্রি! আমি এরূপ জ্যোৎস্না-রাত্রি বড় ভালবাসি।

গি। কিন্তু একবার সেই রাত্রিটীর বিষয় স্মরণ কর দেখি, যে রাত্রিতে তুমি প্রসব বেদনায় কাতর হইয়া চলচ্ছক্তি রহিত হইয়াছিলে, সে রাত্রের কথা স্মরণ হয় কি? সে রাত্রিতে চন্দ্র আমাদিগকে কিরণ দেয় নাই—পৃথিবী বিন্দুপরিমাণ আশ্রয় দেয় নাই কেহ একবার মুখ তুলিয়াও আমাদের দিকে বারেক তাকায় নাই। কি আশ্চর্য্য! মানুষের অভাবের সময় স্বর্গীয় পদার্থপুঞ্জের ন্যায় বহিঃপ্রকৃতিও বুঝি তাহার প্রতিকূল হয়।

গি-পত্নী। আজিকার এই সুন্দর রাত্রিতে কেন সেই দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ করিতেছ? দেখ, মেহেরকে ঐরূপ ভাবে পথের মাঝে ফেলিয়া রাখা অন্যায় হইয়াছিল। দেখ না কেন, মেহেরের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৌভাগ্যও যেন দিন দিন বাড়িতেছে।

গি। হাঁ, সত্য কথাই বলিয়াছ। মেহেরকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, তাহার ভবিষ্যৎ বিশেষ সমুজ্জ্বল। সে পঞ্চদশবর্ষীয়া হইলেও কেমন গাম্ভীর্য্যময়ী ও চিন্তাশীলা। অধিক আর কি বলিব, আকবরের ন্যায় মহানুভব সম্রাট্, তোমার ন্যায় পত্নী ও মেহেরের ন্যায় কন্যা পাইয়া আমি পরম সুখী হইয়াছি।

গি-পত্নী। আমিও তোমার ন্যায় স্বামী পাইরা আপনাকে পরম ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিতেছি। কিন্তু দেখ, একটী কথা তোমাকে

বলিব বলিব ভাবিয়াও এতদিন বলি নাই। মেহেরের শীঘ্র একটা বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

গি। আমিও বহুদিন যাবৎ এই বিষয় চিন্তা করিতেছি। তুমি বোধ হয় আলিকুলী বেগের নাম শুনিয়া থাকিবে। তিনি সাহসী ও সদন্তঃকরণ-বিশিষ্ট লোক, আমি তাঁহারই সহিত মেহেরের বিবাহ দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি।

গি-পত্নী। তিনি কোন্ দেশীয় লোক?

গি। তিনি পারশ্য দেশীয় লোক।

গি-পত্নী। তবে মালিকমসুদ যে বলিয়াছিল,—আমাদের মেহের রাজ-রাণী—সম্রাটের বেগম হইবে, সে কথা ভুল! যুবরাজ সেলিম ত পূর্ব্বেই বিবাহিত হইয়াছেন।

গিয়াসবেগ পত্নীর কথায় বাধা জন্মাইয়া বলিলেন, দেখ, যুবরাজ সেলিম বিলাসী, প্রমোদপ্রিয়; সুতরাং সেলিম মোগল রাজ্যের ভাবী একচ্ছত্র সম্রাট্ হইলেও আমি কখনও তাহার সহিত মেহেরের বিবাহ দিব না। ইহাতে যদি আমাকে এ রাজ্য ছাড়িয়া আবার পূর্ব্ববৎ বনে বনে—পথে পথে বন্য পশু বা ভিখারীর ন্যায় বেড়াইতে হয়, তাহাও সর্ব্বাংশে বরণীয়।

গি-পত্নী। আচ্ছা মনে কর, যদি সেলিম মেহেরকে সত্য সত্যই সর্ব্বান্তঃ-করণে ভালবাসে—সেলিম যদি মেহের বই অন্য কাহাকেও এজগতে হৃদয় দান না করে, তাহা হইলেও কি সেলিমের সহিত বিবাহ দিবে না?

গি। অসম্ভব, তুমি কি মনে কর সেলিমের ন্যায় বিলাসী, সুরাপায়ী, স্খলিত-চরিত্র, তরুণ যুবক মেহেরকে পবিত্র ভাবে—হৃদয় দিয়া ভালবাসিতে পারে? সে যে সৌন্দর্য্যের পিপাসু—রূপের ভিখারী। যে দিন তাহার রূপ-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবে, সেই দিনই যে সে মেহেরকে ছিন্ন পাদুকার ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিবে?

গি পত্নী। তবে কি তুমি আলিকুলীর সহিত মেহেরের বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ?

গি। হাঁ, আপাততঃ তাহাই। আলিকুলী যেমনই সুশ্রী, তেমনই বীর। বীর বলিযা আলিকুলী সৈন্যগণের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জনও করিয়াছেন।

গি-পত্নী। আমি অনেক সময় তোমার মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়াছি, তিনি কি মেহেরের মত সুন্দর?

গি। না, মেহেরের মত সুশ্রী নন বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস,—মেহের তাঁহার একটু পরিচয় পাইলেই তাঁহাকে ভালবাসিবে। তিনি আমাদের ন্যায় রাজনৈতিক ব্যাপারে গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া সম্রাট্ আকবরের সৈন্যদলে যোগদান করেন। তিনিও আমাদেরই ন্যায় পূর্ব্বে দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু ভাগ্য-গুণে আজি তিনি এক সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক

এই ভাবে গিয়াস্ ও তাঁহার পত্নী সেই জ্যোৎস্না-বিধৌত রজনীতে আপন গৃহের ঝুলবারান্দায় বসিয়া মেহেরের বিবাহ-সম্বন্ধীয় কত কথা বলিলেন। তাঁহারা কথাবার্ত্তায় এতটা তন্ময় হইয়াছিলেন যে, উপরে—আকাশে যে একখণ্ড প্রকাণ্ড মেঘ চতুর্দ্দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা তাঁহাদের আদপেই ধারণা ছিল না। অকস্মাৎ বজ্রধ্বনিতে তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইলে—উভয়ে শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন।

(৬)

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন প্রাতঃকালে গিয়াস্-পত্নী ও তাঁহার কন্যা মেহের-উন্ নিসা একখানি শিবিকায় আরোহণ করিলেন। শিবিকার মধ্যভাগ মখ্‌মল্ ও সুবর্ণাদি বহুমূল্য ধাতু দ্বারা মণ্ডিত। ষোড়শ জন বাহক তাঁহাদিগকে বহন করিয়া লইয়া চলিল। রাজ-প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানাদি অতিক্রম করিয়া শিবিকা অন্তঃপুরদ্বারে উপস্থিত হইলে, বাহিকাগণ আসিয়া বাহকদিগের স্থান অধিকার করিল। শিবিকা নাগামহল ছাড়িয়া উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই প্রাঙ্গণে ভারত-সম্রাট্ আকবরের প্রিয়া মহিষী যোধবাই আজ "ভিজিয়া" উৎসব সম্পন্ন করিতেছেন। গিয়াস্-বেগ সেই উৎসবে যোগদান করিতে গেলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন শরৎকাল। বহিঃপ্রকৃতি আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত। আকাশ নীলবর্ণ—শস্যক্ষেত্র শ্যামল। স্বভাবের শোভা সন্দর্শনে আপনা হইতেই ভাবুকের চিত্তে যেন এই শ্লোক উত্থিত হয়—

"আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে;
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ—
ঝলিছে অমল শোভাতে।"

সুতরাং এমন আনন্দময় শারদীয় প্রভাতে—যে শরৎকালে বিশ্বজননী শারদীয় মাতার আগমনে বঙ্গের দীন দরিদ্র, ধনী নির্ধন সকলের মুখ আনন্দে

উৎফুল্ল হয়—ব্যথিতের ব্যথা দূর হয়—চিরদুঃখীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে, আর সরলপ্রাণা কৃষকরমণী যে শরৎকালে আগুধান্য ঝাড়িতে ঝাড়িতে পঞ্চমে গান করে, সেই সুমধুর সুস্নিগ্ধ শরৎকালে স্বয়ং দিল্লীশ্বরের অঙ্কশায়িনী কি নীরব থাকিতে পারেন? তাই রাজ-পরিবারের ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণের স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি লইয়া আজ যোধবাই "ভিজিয়া" উৎসব সম্পন্ন করিতেছেন।

প্রাতঃকাল অতি মনোহর। ধীরে ধীরে মৃদু মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিও যেন প্রেমাশ্রুতে সেই উৎসব ক্ষেত্র অভিষিঞ্চিত করিবার জন্য পতিত হইতেছে। এদিকে মোগলান্তঃপুরের তরুণী যুবতীগণ একে অন্যের গাত্রে পড়িয়া কখনও বা নৃত্য করিতেছিলেন—কখনও বা গান করিতেছিলেন—আবার কখনও বা হাস্যের কল্ কল্ শব্দে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতেছিলেন।

রাজমহিষী যোধবাই একখানি সুবর্ণখচিত সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার বয়স তখন চল্লিশের কিঞ্চিদধিক, তথাপি তাঁহার লাবণ্যরাশি দর্শনে তাঁহাকে যুবতী বলিয়া ভ্রম হয়। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাতিস্থূল—নাতি কৃশ, মুখমণ্ডল অতি সুশ্রী শারদীয় পৌর্ণমাসীর চন্দ্রের ন্যায় টল্ টলে, কুন্তল-রাশি গাঢ় কৃষ্ণ, দেখিলে একখানি চিত্রপট বলিয়া মনে হয়। সম্রাট্ আকবর তাঁহাকে যতদূর ভালবাসিতেন, আর কোন বেগমকেই ততদূর ভালবাসিতেন না।

আমাদের আখ্যায়িকোক্ত মেহের ও তাহার মাতা গিয়া যোধবাইকে প্রণাম করিলেন। মেহেরের মাতা যোধবাইএর পার্শ্বে একখানি স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিলেন এবং মেহের যুবতী স্ত্রীলোকদিগের সহিত যোগদান করিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল।

উপস্থিত যুবতীরা মেহেরের গান শুনিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে বসিয়া ঐ যুবকটী কে? চল পাঠক একবার অনুসন্ধান করি,—অন্তঃপুর মধ্যে কেমনে অন্য পুরুষ—বিশেষতঃ উদ্ভিন্ন যুবক প্রবেশ করিয়াছে।

যুবরাজ সেলিম সেইদিন প্রভাতকালে মেহের ও তাহার মাতাকে শিবিকায় আরোহণ করিয়া আসিতে দেখিয়া, ধীরে ধীরে আপনি অন্তঃপুরে আসিয়া মেহেরের সঙ্গীত, নর্ত্তনাদি শ্রবণ ও দর্শন করিতেছেন। তিনি মেহেরের সঙ্গীত শ্রবণে এতদূর মোহিত হইয়াছেন যে, কেদারার উপর ভাবাবেশে

শুইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মনে হইতেছে, তিনি যেন তেমন স্বর - তেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গী কখনও শুনেন নাই কিংবা দেখেন নাই।

যোধবাই মেহেরের সঙ্গীতে প্রীতা হইয়া তাহার গণ্ডে হস্ত বুলাইয়া বলিলেন, মেহের! তোমার যেমনি মিষ্ট স্বর, তেমনই মনোমুগ্ধকর অঙ্গভঙ্গী! তারপর তিনি মেহের-জননীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন," আহা মেয়েটী যেন একটী সোণার পুতুল! কিন্তু এমন সোণার মেয়ের যোগ্য বর পাইলে কি?

গিয়াস-পত্নী বলিলেন, কাল রাত্রে আমার স্বামী বলিয়াছেন যে, সম্রাটের সেনাবিভাগে আলিকুলী খাঁ নামে একজন সুপুরুষ সৈনিক আছেন, তাঁহারই সহিত মেহেরের বিবাহ দেওয়া স্থির হইয়াছে।

যোধবাই। আলিকুলী খাঁ খুব সুপুরুষ এবং সুদক্ষ সৈনিক পুরুষ, তাহা আমি জানি। কিন্তু যোদ্ধপুরুষেরা কখনও রমণী-প্রেমে আত্মহৃদয় বিসর্জ্জন দিতে পারে না; সেই জন্য ভাবিতেছি, আলিকুলীর সহিত বিবাহ হইলে মেয়েটী বোধ হয় সুখী হইতে পারিবে না। সে যাহা হোক্, আলিকুলীর সহিত মেহেরের পরিণয়-নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ আমার সহিত তোমাদের একবার পরামর্শ করা উচিত ছিল।

গি-পত্নী। আমার স্বামী সবে মাত্র কাল রাত্রে আমাকে এই কথা বলিয়াছেন, সুতরাং সম্রাজ্ঞীকে কেমন করিয়া আমি তাহা নিবেদন করিব? আমি স্বয়ং এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তিনি স্বামী—সুতরাং তিনি যাহা ভাল বুঝেন, আমারও তাহাতেই সর্ব্বান্তঃকরণিক সহানুভূতি।

যোধ। আমারও সেই মত। তোমার স্বামী যাহা যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তাহাতেই মত দেওয়া আমি প্রকৃত স্ত্রীর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। আশা করি মেহের সুখী হউক, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার একটী কথা আছে।

গি-পত্নী। কি কথা সম্রাজ্ঞী!

কথাটী এই—

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

অনন্ত দাসের অপ্রকাশিত পদাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৪)

কুটিলা কহয়ে আমি যাইব সংহতি।
স্থর্য্যের নিকট কিছু করিব মিনতি॥
ললিতাদি সখী-সঙ্গে কুটিলা চলিল।
কুটিলা চলিল সঙ্গে বিষম জঞ্জাল॥
বন প্রবেশিয়া ধনী কুটিলারে কয়।
এই বনে বনদেবের হয়েছে আশ্রয়॥
যত দিন সেই দেব বৈসে মোর হৃদি।
ততদিন হৈতে মোর হইয়াছে ব্যাধি॥
কুটিলা কহয়ে তবে অন্য পথে যাই।
অনন্ত কহয়ে বনে আছে সর্ব্বথাই॥

(৫)

পুনঃ সে কুটিলা বলে, সে দেব পাইবার কালে,
কি লক্ষণ করয়ে উদয়।
রাই কহে সৌরভেতে, আমোদ করে এ চিতে,
সব তনু সিঞ্চিয়ে পড়য়॥
(তখন) রাই অঙ্গ-সঙ্গ হৈতে, কৃষ্ণ গন্ধ আচম্বিতে,
আসিয়া পশিল তার নাশা।
তনুতে লোমাঞ্চ হেরে, রাধিকার পায়ে ধ'রে,
বলে রাখ হারাইলাম দিশা॥
তেঁই কহে রুদ্র বলি, দ্রুত গতি যাহ চলি,
সভয়ে পাইলে যাবে প্রাণ।
সেহ ভয়াতুর হোল, দ্রুত গতি পলাইল,
অনন্তের হরিষ বিধান॥

(৬)

সখীগণ হাসি,		কহিছে সুভাষি,
নন্দী ভুলালি ছলে।
কহে ধনী রাই,		যত কহি তাই,
শ্রীকৃষ্ণ চরণ-বলে॥
এখানে শ্রীহরি,		রাধিকা সঁওরি,
বিরহ মরমে ভোর।
সুবল যাইয়ে,		প্রবোধ করিয়ে,
ধরিল আপন কোর॥
হরি ধরি বলে,		আসিবার কালে,
দেখিয়াছি ধনী রাই।
কান্দি ঘরে গেল,		না জানি কি হোল,
এখনও মিলিল নাই॥
বন-শুক-পাখী,		ডালে বসি ডাকি,
বলে এসেছে সুন্দরী রাধা।
হেনকালে চন্দ্রাবলী,		আগমন করি,
মনেতে লাগল ধাঁধা॥
এস এস প্রাণের কিশোরী।
অধিক আদর পেয়ে,		চন্দ্রা হরষিত হয়ে,
বলে দুটী চরণেতে ধরি॥
তোমার চরণ-তল,		এই মোর ভাগ্য-বল,
তুমি মোর ভজন পূজন।
ফলিল সুখদ তরু,		পাইলাম সুখের গুরু
হৃদে ধরি করি সুসেবন॥
আর না ছাড়িব তোমা,		জগতে জানুক মহিমা,
নিরজনে কুঞ্জে লয়ে যাব।
চরণ মুছাব কেশে,		বসাইব হৃদি পাশে,
ক্ষণে ক্ষণে সর পিয়াইব॥
ধরিয়া শ্যামের করে,		লইল নিকুঞ্জ পরে,
আনন্দে করয়ে সুসেবন।

পরশে জানিল শ্যাম, হৃদে জপেন রাধা নাম,
দাস অনন্ত নিমগন॥

(৭)

মনে মনে ভাবিছেন শ্রীহরি।
যদি কুঞ্জে আইসেন কিশোরী॥
আসিয়াছেন অতি অনুরাগে।
কি করিবে দারুণ বিয়োগে॥
এ কথা কহয়ে যদি শুক।
তবে ধনী না হেরিবে মুখ॥
রাধা রাধা বলেন বনমালী।
চমকিত হৈল চন্দ্রাবলী॥
এখানেতে রাই কুঞ্জে গিয়া।
ঝুরে আঁখি বঁধু না দেখিয়া॥
ডাকিয়া কহিছে শুক শারী।
চন্দ্রাবলী লয়ে গেছে হরি॥
শুনিয়ে বিদরে ধনীর হিয়ে।
(বলেন) যমুনাতে মরিব ডুবিয়ে॥
সখী কহে অনন্ত ভজিতে।
যুকতি আছয়ে সাধিতে॥

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

কাব্যপ্রতিভায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ।

আত্ম-সংযমের জন্য অমানুষিক কঠোরতা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-বিধানার্থ একনিষ্ঠ উৎসাহোদ্যম এবং সর্ব্বোপরি বালকোচিত আত্মবিস্মৃতি-প্রবণতা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের চরিত্রগত সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। তপোবনবিহারী মুনি-ঋষিগণের ন্যায় তদীয় আচার ব্যবহারও নিতান্ত পবিত্র ও সরল ছিল। যৌবন ও বয়ঃপ্রাপ্তি সত্ত্বেও তিনি মহাকবি মিল্টনের ন্যায় সংযত ও পবিত্র-ভাবে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন। মিল্টনের ন্যায় তাঁহারও জীবনে অনেক বিঘ্ন-বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল এবং তিনিও জনহিতকর বহুকার্য্য সংসাধনে যত্নপর ছিলেন। পরিশেষে তিনিও মিল্টনের ন্যায় কোনও সুমহান্ গ্রন্থ সম্পাদনার্থ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন,—এমত ধারণা লইয়া আজীবন সাহিত্যসেবায় নিবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি স্ত্রীজাতির প্রতি কোনও অনাদর প্রদর্শন না করিয়া পরন্তু তাহাদের সহিত যে সর্ব্বতো-ভাবে সংস্রব রক্ষা করিয়া চলিতেন, এজন্য বাস্তবিকই মিল্টনের তুলনায় তিনি অনেক গুণে বেশী সুখী ও উন্নত হইতে পারিয়াছিলেন। Paradise Lost এবং Samson Agonistes প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা মিল্টন যেমন আজীবন স্ত্রী-জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তেমন করেন নাই। মিল্টন তাঁহার আপন কন্যাদিগকেই সাহিত্যক্ষেত্রে দাসীর ন্যায় মনে করিতেন এবং সর্ব্বদা ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতেন। কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার পত্নী ও ভগিনীকে নিজের মতই আধ্যাত্মিক উন্নত বিবেচনা করিতেন এবং স্বভাবতঃই তাহাদের দ্বারা স্বীয় কাব্যের সমালোচনা করাইতে ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। এমন কি, তাঁহার কাব্যের একটী উৎকৃষ্ট কবিতা "The Daffodils" তাঁহার পত্নীর উপদেশানুসারে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, এবং আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিয়াছেন। কাব্যক্ষেত্রে যে তিনি অনন্ত যশের অধিকারী হইয়াছেন, তাহারও মূলে তদীয় স্নেহময়ী ভগিনীর প্রাধান্য বিশেষরূপেই বিরাজিত রহি-য়াছে;—তাই তিনি লিখিয়াছেন :—

"She gave me eyes, she gave me ears;
And humble cares, and delicate fears;

A heart, the fountain of sweet tears;
And love, and thought and joy."

পুত্রকন্যার প্রতিও তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। সুকুমার-মতি শিশুদিগের প্রতি তাঁহার কি গভীর সহানুভূতি ছিল, তাহা তদীয় 'We are seven,' 'Lucy,' Gray,' এবং 'Alice fell' নামক সর্ব্বজন পরিচিত কবিতাত্রয়ে বিশেষরূপে পরিব্যক্ত হইলেও স্বীয় কাব্যে ভগিনী ডরোথির 'Address to a child' এবং 'The Mothers return' নামক কবিতা দুইটী সন্নিবিষ্ট করিয়া তিনি উহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বালস্বভাবের কিরূপ পক্ষপাতী ছিলেন; 'The Poet's epitaph' শীর্ষক কবিতার নিম্নোদ্ধৃত অংশনিচয়ে তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হয়। যথা,—

"But who is he, with modest looks,
And clad in homely russet brown?
He murmurs near the running brooks
A music sweeter than their own,
He is retired as noontide dew
Or fountain in a noon-day grove;
And you must love him, ere to you
He will seem worthy of your love.

*　　　　*　　　　*

But he is weak; both Man and Boy,
Hath been an idler in the land;
Contented if he might enjoy
The things which others understand."

শরীর ও মনের সমুচিত শান্তিরক্ষার্থ কঠোর নিয়মনিষ্ঠা ও ন্য
ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-চরিত্রের অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব, কিন্তু যিনি একদিন অন্তরের সহিত ফরাসীবিপ্লবের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন, তাঁহার পক্ষে এবংবিধ শান্তিপ্রিয়তা নিতান্তই বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যপরিপূর্ণ হ্রদ ও পর্ব্বতের সান্নিধ্যে আশৈশব অবস্থানে তাঁহার মনেও প্রাকৃতিক শান্তি-সৌন্দর্য্য একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে যে কোন

বিরোধী প্রকৃতি সুপ্ত ও প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিল, শৈশবে আত্মহত্যার চেষ্টাতেই তাহা বিশদরূপে প্রকটিত হইয়াছে। এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সেই সুপ্ত-প্রকৃতির সহিত ঐকান্তিক চেষ্টা সংমিশ্রিত হইয়াই তাঁহাকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের গরিমায় সমুজ্জ্বল করিয়াছিল ও স্বপ্রকাশের নিমিত্ত বিপ্লবস্পৃহায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্সের পরবর্ত্তী ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ অন্যায় বিপ্লবের অপকারিতা সম্বন্ধে অনতিকাল মধ্যেই অনেক বাস্তব শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফরাসীবিপ্লবের ফলপ্রসূত অনিবার্য্য দুঃখাবসাদের সময় তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের প্রেমে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তদনন্তর যখন রণদুর্ম্মদ নেপোলিয়নের সৈনিকোচিত স্বৈরচারিতায় ফরাসীবিপ্লবের বিষময় ফল দেখা দিল, তখন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অন্তর্নিহিত স্বদেশপ্রেম জলন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক 'To the men of kent' 'On the subjugation of switzerland' এবং 'When I have borne in memory' প্রভৃতি উপাদেয় সনেটের সৃষ্টি করিল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত তাহার 'Ode to Duty' নামক কবিতা পাঠে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, কতকগুলি অন্তর্জাত শক্তি একত্রিত হইয়াই তাঁহাকে বাহ্যপ্রকৃতির অনুশীলনে প্রণোদিত করিয়াছিল। এবং ফলে মানুষের অন্তরস্থ নৈতিক প্রবৃত্তির সহিত বাহ্য প্রকৃতির সুসঙ্গতি কিরূপে রক্ষিত হয়, নিম্নোক্ত কবিতাংশে তাহা সুচারুরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল :—

"Stern Law-giver! yet dost thou wear
The God head's most benignant grace;
Nor know we anything so fair
As is the smile upon thy face;
Flowers laugh before thee in their beds
And fragrance in thy footing treads;
Thou dost preserve the stars from wrong;
And the most ancient heavens, through thee,
Are fresh and strong."

তদনন্তর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ Church of England এর প্রতি দিন দিন অনুরক্ত হইতে থাকেন; এবং অবশেষে সামাজিক ও নৈতিক নিয়মের

অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি Reform bill (সংস্কার-নীতি) ও Catholic Emancipation (উদার-নীতি) এর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া গিয়াছেন, এবং কাম্বারল্যও অঞ্চলে যাহাতে বাষ্পীয় শকটের বহুল বিস্তৃতি না ঘটে, তজ্জন্য প্রাণপাত বিরুদ্ধচেষ্টা নিয়োগ করিয়াছেন।

মনুষ্যরূপে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, এখন তাঁহার কাব্যগত দোষগুণ বিচার করা আবশ্যক। বৈসাদৃশ্যই ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের কাব্যগত সর্ব্বপ্রধান দোষ। তাঁহার কাব্যের অনেক স্থলেই ভাব-প্রবণ কোমল কবিতায় অসার অকিঞ্চিৎকর গদ্যের ছায়া প্রকটিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ গদ্য সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে নিবিষ্ট না হইয়া কাব্যসাহিত্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—তাই তাঁহার কাব্যে এবংবিধ বৈসাদৃশ্যের রেখাপাত হইয়াছে। পদ্য ও গদ্যের মধ্যে ভাষাগত তেমন কোন পার্থক্য নাই, এমত ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল; এবং এমন কি পোপ, বায়রণ প্রভৃতি কবির কাব্যকেও তিনি কৃত্রিমতা-দোষ-দুষ্ট মনে করিতেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্ভারে পরিপূরিত ভূভাগে নিরন্তর অবস্থান করায় যে সকল দরিদ্রলোকের হৃদয় প্রকৃত সরলতার আধারস্বরূপ হইয়াছে; তাহাদিগের পক্ষে যে মানবোচিত মৌলিক ভাবরাশি স্বাভাবিক, তাহাই চিত্রিত করিতে তিনি নিপুণভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন, প্রত্যেক কবিতার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া সৃষ্টি হওয়া উচিত; এমন কি, তিনি নিজের সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন,—"I wish to be considered as a teacher or as nothing." আদর্শ কবিরূপে বিশেষ কোন কার্য্য সম্পাদনার্থ তাঁহার জন্ম হইয়াছে, আজীবন তিনি এমত ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া গিয়াছেন, এবং তজ্জন্যই জীবনের প্রত্যেকটী ঘটনা, মনের প্রত্যেকটী চিন্তা গাম্ভীর্য্যের তুলিকায় অতিরঞ্জিত করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের জ্ঞান ও কল্পনা তাঁহার জন্মভূমির নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে নিবদ্ধ ছিল—ইহাও তাঁহার কাব্যগত অন্যতম দোষ। এমন কি, যখন তিনি সুদূর-দেশে পরিভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন, তখনও তাঁহার কল্পনা ও মন স্বদেশের নদনদী ও পাহাড় পর্ব্বতের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থাকিত। যখনই তিনি কোন কবিতা রচনায় নিবিষ্ট হইতেন, তখনই তাহার উপাদান সংগ্রহার্থ তাঁহাকে উইণ্ডারমিয়ার ও হেলভেলিনের দিকে তাকাইতে হইত।

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের আর একটী দোষ এই যে, তাঁহার কাব্যে পবিত্রপ্রেমের সুখশীতল স্পর্শ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। জীবনে তিনি একটী মাত্র প্রেমবিষয়ক কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও নিজ সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল না। তাঁহার কাব্যে প্রেমের কথার নিতান্ত অভাব, এই জন্য উহা সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয় নাই। মিল্টন ও টেনিসনের ন্যায় ওয়ার্ডস্ওয়ার্থও নিতান্ত অ।সি ক ছিলেন। "Betty Foy's troubles" লিখিয়া তিনি কবিবর বায়রণের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, কিন্তু যদি তাঁহার রসজ্ঞান থাকিত, তবে নিশ্চয়ই বায়রণ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া লিখিতেন না যে,—

"Till who view the Idiot in his glory
Conceive the bard the hero of the story."

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কাব্যে যে কেবল দোষই ছিল তাহা নহে, উহাতে গুণও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার ভাষায় যেরূপ অনাবিল প্রাঞ্জলতা পরিলক্ষিত হয়, অন্য কাহারও ভাষায় তদ্রূপ হয় না। কঠোর সুস্পষ্ট প্রকৃতি-পরায়ণতার সহিত চরম সত্যের সংমিশ্রণ তাঁহার কাব্যকে গৌরব-মাল্যে বিভূষিত করিয়াছে। ম্যাথিউ আরনল্ড সত্যই বলিয়াছেন যে,—

Nature herself seems to write for him with her own bare, sheer, penetrating power, * * * His expression may often be called bald, as for instance, in the poem of Resolution and Independence, but it is bald as the bare mountain-tops are bald, with a baldness which is full of grandeur," বিরাট ব্যোমের উন্মুক্ত তলে দাঁড়াইয়া, প্রকৃতির নগ্নসৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার একনিষ্ঠ প্রকৃতি-উপাসনার ফল। তাহার উক্তি অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও টেনিসনেরই ন্যায় ভাবপ্রবণ। অপ্রমত্ত গাম্ভীর্য্য তাঁহার কাব্যের অন্যতম বিশেষত্ব। মানবের জন্য মানবের সহানুভূতি, বাক্শক্তিহীন প্রাণীর প্রতি অনুকম্পা, নির্জ্জীবে সজীব-জ্ঞান, স্পষ্ট এবং প্রকৃত স্বরূপ-বর্ণনা প্রভৃতিও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কাব্য-কুশলতার অপূর্ব্ব নিদর্শন।

শ্রীবেণীমাধব দত্ত।

কে তুমি চপলে ?

ঘন কাদম্বিনী-কোলে
　　কে তুমি চমকি যাও,
খেলায়ে কনক-প্রভা
　　চকিতে কোথা লুকাও ?

দিগন্ত অবনী ঘেরা,
　　মসীবর্ণ নীলিমায়,
আঁধার তরঙ্গে যেন,
　　ধরাখানি ভেসে যায়।

বিষাদে প্রকৃতি সতী,
　　অঞ্চল বসনে ঢাকি ;
বিমল বদন-খানি,
　　যেন কি বিষাদ মাখি।

না হেরি চাঁদিমা-হাসি,
　　না হেরি তারার হার ;
আজি প্রকৃতির প্রাণে
　　সুগভীর হাহাকার।

ঘুচিতে বিষাদ তার,
　　তাই কি চকিতে চাও ?
খেলায়ে কনক-আভা
　　পলকে কোথা লুকাও ?

নিবিড় আঁধার-রাশি,
　　পলকে কি মুছে যায় ?
আবরে ধরণী-অঙ্গ
　　সুগভীর নীলিমায়।

বিষাদ কালিমা-মাখা,
　　গভীর আঁধার প্রাণ,
উদাস, বিভ্রান্ত, ক্লান্ত,
　　অবসাদে অবসান।

আঁধার সে হৃদি মাঝে,
　　ঝলকি নয়ন-কোণে

আকুলি হৃদয়, মরি—
কি খেলা খেলাও প্রাণে ?

দূরে কি আঁধার তায়,
নিভে কি যাতনানল ?
চকিতে বাড়ায় শুধু
জ্বালাময় আঁখিজল !

বাড়ে গো পিয়াসা হৃদে,
আকুল দীরঘ শ্বাস,
জেগে রয় চিরতরে
প্রাণময় হা হুতাশ !

জীবন বসন্ত ভাতি,
নির্দ্দয় নিদাঘ আসি,
দহি দাবানল সম,
করে সে মরুভূরাশি।

চপলে ! লুকায়ে মেঘে,
ঝলকি প্রকৃতি প্রাণে,
ঢালিয়া বিষাদ-রাশি,
কি সুখ উপজে মনে ?

কেন বা ধরায় আসি,
নিবসি নয়ন-কোণে,
আকুলে কাঁদাও কত
বিষাদ-আঁধার প্রাণে,

একটী কটাক্ষ তোর
মরি কি আবর্ত্তময় ;
জীবনের সুখ শান্তি
ক্ষণেকে হরিয়া লয়।

বুঝি গো দীধিতি ওই
মেঘে, নয়নের কোণে,
দহিতে লুকায়ে রও
প্রকৃতি, মানবগণে।

শ্রীচারুচন্দ্র মজুমদার

বিষ্ণুপুর-রাজ্য-পরিদর্শন।

বসন্ত কালটা বড় মধুর। চারিদিকে নূতন নূতন গাছে সবুজ সবুজ পাতা-গুলা মাথায় নিয়ে যেন আজ রাজা, তা'দের স্ফূর্ত্তি দিবার জন্য বরুণদেব মাঝে মাঝে তাঁর করুণার এক এক কণা দান কচ্ছেন; পবনদেব তাদের সঙ্গে নেচে নেচে কত আলাপ পরিচয় কচ্ছেন, বন্ধুত্বটা যেন অনেক দিনেরই! শ্রীমতী প্রকৃতি রাণী রাজার উপযুক্ত মাল্য, সাজ সজ্জা দিয়ে তাদের মান রক্ষা কচ্ছেন। আজ বনস্থ বৃক্ষরাজি যেন ধীরে ধীরে স্ব স্ব মস্তক উত্তোলন ক'রে নিজ নিজ কর্ত্তব্য গ্রহণ করিতেছে। তা'দের মাঝে কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ সেনাপতি ইত্যাদি।

এতকালে অজ্ঞানান্ধকার যেন বসন্তের মৃদু সমীরণে দূর হইয়া গিয়াছে; শ্রান্তি, ক্লান্তি, বিষাদ, ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি জীব-হৃদয়-দগ্ধকারী রিপুসকল বসন্তের জাগরণে ভয়ে পলাইয়াছে;—তরুরাজি আজি উন্নত ও স্বাধীন। ঘুমই যেন জীবগণকে অধিক মুগ্ধ করিতে সমর্থ, সে কথা ত সবাই বলেন; যখন ঘুম ভাঙ্গে—তখন জড়তা দূর হয়, মন প্রফুল্ল হয়, হৃদয়ে যেন স্বতঃই একটা স্বাধীনতার বিকাশজনিত আনন্দের উৎস সারা প্রাণের মধ্যে ছুটিতে থাকে, তখন জীব কর্ত্তব্য পথে ধায়, বিচারশক্তি হৃদয়ে বিরাজ করিতে থাকে, তাই সাধুগণ নিদ্রাভঙ্গের পর সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এ নিদ্রা রাত্রিভাগের, দিবাভাগের নহে; দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া আর "সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা" উভয়ই সমান, সুতরাং সে নিয়ম এ স্থানে প্রযোজ্য নহে। আজ তরুগণ অরণ্যে জাগিয়াছে, বসন্তের খোলা বাতাস সুবাস দিয়ে তা'দের মাতিয়ে তুলেছে, তা'দের আনন্দ দে'খে আরণ্য পক্ষিগণও সে আনন্দে যোগ দিয়াছে, তাই কোকিল, পাপিয়ার "কুহু" রবে বনভূমি প্রফুল্লিত; ভ্রমর, মধুমক্ষিকার "গুন্ গুন্" শব্দে লতাস্থিত পুষ্পনিচয় তালে তালে নৃত্য করিতেছে; ভ্রমরেরা তা'দের সঙ্গে প্রীতির কত খেলাই খেলিতেছে,—সে খেলা দেখিয়া শ্যামল-ক্ষেত্রের কৃষিজীবীরাও আনন্দিত মনে ধান্যপূর্ণ গো-যান চালাইয়া স্ব-গৃহাভিমুখে ফিরিতেছে। মোট কথা, এখন আনন্দ সকল দিকেই—জলে হংস সারসের আনন্দ, স্থলে অরণ্যরাজি পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গ সকলেরই আনন্দ। বঙ্গে লক্ষ্মী-দেবীর আগমনে সারা বাঙ্গলা

জুড়ে যে মায়ের অর্চ্চনার জন্য আয়োজন হইতেছে, ধনী দুঃখী সকলেই আজ আনন্দসাগরে সাঁতার কাটছেন, বাকি তবে কে? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা, কাহারও গলার ফাঁস কেটেছে, কেউ এখনও জীবন্তে মরার মত সে কালের প্রতীক্ষা করিতেছেন। যিনি এ পরীক্ষা-ক্ষেত্র হইতে নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ যাহাই হউক না কেন, এখন তাঁহাকে আমরা "মুক্ত" বলিতে পারি। এ মুক্তি যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল; কিন্তু আগমনের প্রতীক্ষা করা বড়ই বিষম—বড়ই চিত্ত উন্মাদক! ভুক্তভোগীই এ রসাস্বাদনে উপযুক্ত ব্যক্তি, অন্যত্র "বাব্যমন্তব্যম্"।

আমরা ঐ ভুক্তভোগীদের শ্রেণীভুক্ত। বসন্তের শেষাশেষি আমরা এ দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হ'ল! সারা বছরের পড়া ও চিন্তার মধ্যে থাকা মানুষের পক্ষে কি বিষম! প্রাকৃতিক প্রীতি হইতে দূরে থাকিয়া অজ্ঞানান্ধকারে ডুব দেওয়া জীবের পক্ষে কি ক্লেশকর নহে? বিশেষ যাঁদের এ অধ্যয়ন কেবল অর্থোপার্জ্জনের পথ-প্রদর্শক, জ্ঞানার্জ্জনে আদৌ অবসর বা ঈপ্সা নাই, সে যেন জীবন্তে নরকভোগ।

বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জ্জন মানবকে মনুষ্যত্বে উন্নীত করে বটে, কিন্তু আমরা কি তাহা ঠিক হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করি? আত্মজ্ঞান ও প্রচার কি আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য? কখনই নহে; এ সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন, অধিকাংশ স্থলেই কিন্তু "পাস্" করাটা একটা টাকা রোজগারের পথ। অবশ্য বিদ্যাশিক্ষা না হইলে এখনকার দিনে এক পা নড়া যায় না, এখন কেন, জীবনকে জীবন্তের মধ্যে চালাইতে গেলে বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জ্জন প্রধান অবলম্বন; কিন্তু কই, তা হইতেছে কৈ? আমরা ছাত্রজীবনে কত কষ্ট, কত পরিশ্রম, কত কাণ্ড করিয়া জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দিই, তাহার পর ছাত্রজীবন ত্যাগ করিয়া সাংসারিক কর্ম্ম-কর্তৃত্ব গ্রহণ করি, সে পদ কত দায়িত্বপূর্ণ, তাহা চিন্তা করিবার অবসর পাই না, আবার পাইলেও সে ভাব মনে উদয়ও হয় না, তখন স্বার্থপরতার বিষ-বহ্নি মানবহৃদয়কে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করে—কোথায় বা সে আত্মোন্নতি, আর কোথায়ই বা সে পরোপকার? হায়! সবই তখন এ নর-জীবন হইতে ক্রমে ক্রমে মুছিয়া যায়; অর্থাভাব, অসহায়, অক্ষমতা ইত্যাদি কত গুণই মনুষ্য-হৃদয়কে অধিকার করে; কিন্তু যিনি প্রথম হইতেই এ সকল অনুভব করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার ও আপত্তি কখনও ভ্রমেও হৃদয়ে উদয় হয় না; কারণ পূর্ব্ব হইতেই

ঐ রোগের ঔষধ পড়িতে থাকে; কাযেই সংগ্রামের পূর্ব্বেই সে রোগ কাটিয়া যায়, তখন তিনি সংসার-সংগ্রামে জয়ী হ'ন,—সুখ শান্তি সবই এ জীবনে আসে; এতদ্ব্যতিরেকে যে দুঃখ, তার ত প্রমাণ দেখিতেছিই, কিন্তু আমরা এমনি মুগ্ধ যে, সে চিন্তা করিতে হৃদয়ে একতিল স্থানও দিই না। যাই হোক, মনুষ্য-জীবনে আত্মোন্নতি ও পরোপকারই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

অতঃপর আমরা কয়জন বন্ধু বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে কিছুদিনের অবসর লইয়া কোথায় যাইব ভাবিতে লাগিলাম। আর একটা কথা, আমরা পল্লী-গ্রামবাসী; সহরে সুখস্বাচ্ছন্দ্য যতই হউক না কেন, খোলা মাঠ, আম কাঁঠালের বাগান ও খড়ের ঘর, পুকুরের জল, পাখীর গান আমাদের বড়ই ভাল লাগে। এখানকার (কলিকাতার) বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, গাড়ী, কলের গান, স্কোয়ার, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ইত্যাদি কৃত্রিম পদার্থগুলি যেন আমাদের হৃদয়কে জ্বালাইতে থাকে; তবে উপায় নাই, শুধু কেবল "যো দিয়া দন্‌ৎ সো দেগা চানা" যিনি বিপদ দিয়াছেন, তিনিই উদ্ধারের উপায় করিবেন, এই ভাবিয়া এখানে আছি। যখন তিনি উপায় করেন, তখনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে গমন করি।

বাস্তবিক পল্লীই প্রকৃতির লীলাভূমি। পল্লীর বিবিধ বিচিত্র বৃক্ষরাজি, নেত্ররঞ্জন-ক্ষেত্রশোভিত-শস্যশ্যামলতায় নিসর্গ-রূপসীর বিলাস-চঞ্চল সুশোভন পদবিক্ষেপ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। পল্লীর মন্দবাতান্দোলিত বৃক্ষ-পত্রের অস্ফুট মর্ম্মর নিস্বনে ও পল্লীপ্রান্ত-বাহিনী স্বচ্ছতোয়া তটিনীর অবিরাম উচ্চারিত অব্যক্ত কুলু কুলু ধ্বনিতে প্রকৃতি দেবীর সুধা-সঙ্গীত শ্রবণ-গোচর হয়, অবিরল ফুল্ল-কুসুম-পরিমলবাহী মৃদুল হিল্লোলে তাহারই অমৃত-স্পর্শ অনুভব করা যায়। পল্লীর দেবালয়ে সান্ধ্য আরতির বাদ্য ও পুরমহিলার শঙ্খধ্বনি, ক্ষুদ্র দীপালোক প্রকৃতি দেবীর বিজয় গাঁথা হাসিয়া হাসিয়া গাহিয়া থাকে। পল্লীর এমন সরস সদানন্দ-মিশ্রিত পৃথ্বী-উদ্ভূত সন্তানগণ যে জীব-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? সরলতা, দয়া, প্রেম যে তা'দের হৃদয় ঢাকিয়া থাকিবে, এ ত প্রকৃতি-সিদ্ধ। সেই জন্য আজও এত দুর্দ্দিনে, এত নররক্তপিপাসু তাণ্ডবকারিগণের বিকট নৃত্য ধরাতলে সংঘটিত হইলেও পল্লীভূমিতে—ভারতের পল্লীভূমিতে সে স্রোত এখনও সমভাবে উপনীত হয় নাই। এখনও প্রকৃত মনুষ্যত্ব তা'দের হৃদয়ে অনেকাংশে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু সে কতদিন থাকিবে? একটু গোমূত্র

সংযোগে যেরূপ কলসপূর্ণ দুগ্ধ নষ্ট হয়, তদ্রূপ এই জনগণের আচার ব্যবহারে শীঘ্রই সে মনুষ্যত্ব তা'দের লোপ পাইবে। তাই আমরা আজ ভারতের ভাবী হিতাকাঙ্ক্ষিগণকে আহ্বান করিতেছি, যদি এখনও ভারতের সম্মান, ভারতীর গৌরব, এদেশবাসীর মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে শস্যশ্যামল ভারতের পল্লীভূমে আগমন করিয়া সে কার্য্যে ব্রতী হউন। ধর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্র পল্লী, সহর নহে। সহর বিলাসের আশ্রয়, কিন্তু সে বিলাস-বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থ এক ভারতের পল্লীভূমি, সুতরাং তাহাকে সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করিতে হইবে। তৎপরে সে স্রোত সহরে আসিবে। মনুষ্য-হৃদয়েই জ্ঞানের বিস্তার হয়, পশুতে সে কার্য্য সমাধা হয় না। সে প্রয়াসও জলে জলবিম্বের লয়প্রায়। সুতরাং মানুষ করা যদি আজ ভারতের উদ্দেশ্য হয়, তবে মানুষের হৃদয় চাই, সে হৃদয় পল্লীগ্রামে, সহরে নাই। তাহার প্রমাণ আমরা নিম্নেই দিতেছি, পাঠক! অনুগ্রহ পূর্ব্বক লক্ষ্য করুন?

আমরা প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করিব, কিন্তু বিধাতার কি উদ্দেশ্য জানি না, আমাদের এক বন্ধু আমাদের অজ্ঞাতসারে তাঁ'দের দেশে যাইবার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এমন কি, আমরা এখান হইতে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্তও সে কথা জানি নাই। তাহার পর রাত্রি ৮॥০ টার সময় যখন সকলে একত্র মিলিলাম, তখন শুনিলাম আমাদের যাত্রা হইবে অন্যত্র। আমি উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কোথায় যাইব?" তখন আমার সেই বন্ধুটী ও তদ্দেশবাসী এক-জন ভদ্রলোক একখানি কাগজ আমার হাতে দিলেন। আমি দেখি, তাহাতে লেখা আছে "বিষ্ণুপুর"। গাড়ী রিজার্ভ হইয়াছে, এখানি তাহারই রসিদ। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম—কোথায়"পুরী" আর কোথায় "বিষ্ণুপুর।" আমি তখন বন্ধুর উপর জুলুম করিয়া সেখানকার জল, বায়ু, স্বাস্থ্য প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বন্ধুটী হাসিয়া উত্তর দিলেন, "বেশ ভাল, গেলেই বুঝ্‌বে।"

যাহা হউক, সে রাত্রি আমরা নানারূপ গল্পগুজবে কাটাইলাম। পরদিন প্রত্যূষে (২৬এ চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩২০) আমাদের রওয়ানা হইতে হইবে। যদিও যাত্রার ফের হইল, তথাপি হৃদয় আরও নাচিতে লাগিল যে, এবার পুরীর বদলে বন্ধুর দেশ দেখা হইবে, তা' মন্দ নয়—এ একটা সৌভাগ্য বটে।

আমাদের মন এতই উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল যে, পাছে ঘুম না ভাঙ্গে এজন্য

ঘড়িতে এলার্ম্ পর্য্যন্ত দিয়া আমরা শয়ন করিয়াছিলাম। যখন ৪টা রাত্রি, এলার্ম বাজিল, আমরা তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া পাঙ্গপাট গুছাইয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। গাড়ী ঠিক ৭টার সময় হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিল। আমরা আমাদের জিনিষপত্র ট্রেণে তুলিয়া লইলাম। এখানে বলা আবশ্যক, আমাদের গন্তব্যপথ বেঙ্গল নাগপুর রেল পথাভিমুখে। গাড়ী ছাড়িতে তখনও প্রায় আধঘণ্টা বাকি, আমরা স্ফূর্ত্তির সহিত স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলাম। ক্রমে গাড়ী ছাড়িবার সময় হয় হয়, এমন সময় গাড়ীতে এত ভিড় হইল যে, লোক শেষে বসিতে না পাইয়া দাঁড়াইয়া রহিতে লাগিল। অথচ গাড়ীগুলি এমন অসুবিধাজনক যে, বড় বড় গাড়ী—এক একটা গোয়ালের মত, কিন্তু বাহির হইবার পথ দু'টী। সে ভিড়ে গাড়ী হইতে নামা দায়। যাহা হউক, এইরূপে গাড়ীপূর্ণ করিয়া ৭—৩০ মিঃ সময়ে ট্রেণখানি ছাড়িয়া দিল। গাড়ীতে যাত্রী নয়, যেন কোটরগত ছারপোকার দল সারি দিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ক্রমে গাড়ী—"রামরাজাতলা" ষ্টেশনে আসিয়া হাজির হইল। তখন কতক লোক নামিল, কিন্তু যা' নামিল তা'র চারিগুণ লোক গাড়ীতে আরোহণ করিল। শেষে যখন "সাঁতরাগাছি" ষ্টেশনে গাড়ী আসিল, তখন লোক এত সারবন্দি যে উঠা দায়। কতকগুলি লোক ঠেলে গাড়ীতে উঠিল, একটী ভদ্রলোক'ত গাড়ী ছাড়া পর্য্যন্ত পাঁচ মিনিট গাড়ীর পাদানিতে দাঁড়াইয়া ছিলেন, লোক এত দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, সে গোয়ালের ক্ষুদ্র দরজা দু'টী বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তিনি অনেক কাকুতি মিনতির পর শেষে গাড়ীর ভিতরে স্থান পান। এইরূপ ভাবে সাতটী ষ্টেশন পার হইয়া "উলুবেড়িয়া"য় আসিয়া তবে ভিড় কমিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এত কাণ্ডে কি বি, এন, রেলের সুনাম হয়? অথচ "খড়গপুর" জংশনে টিকিট চেকারদের তিনবার টিকিট দেখার তলবে অস্থির! টিকিট না কিনিলে দোষী, কিন্তু টিকিট কিনিয়া যে এত লোক দাঁড়াইয়া চলিল, তাহার জন্য দোষী কে? অথচ বি, এন্. রেল কোম্পানীর এই অসুবিধা পুনঃ পুনঃ কাগজে দেখিতেছি, কিন্তু কোন প্রতীকার নাই কেন? ই, বি, এস্, আর কি ই, আই, আরের মত গাড়ী করিলে কি হয় না? আমরা গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে দৃষ্টি-সংযোগ করিতে অনুরোধ করি। আরও শুনিলাম, এ লাইনে রাত্রের গাড়ী নাকি ভাল, কিন্তু দিনে যারা চড়ে, তা'রা কি পয়সা দেয় না? যদি দেয়, তবে এ ব্যবস্থা কেন?

তৎপরে আমরা ক্রমে লোকের এই দুর্দ্দশা দেখিবার দায় হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া "মেদিনীপুরে" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এদিককার ষ্টেশন-গুলি অনেক লম্বা। চারিদিকে বেশ নানা ফুলের গাছ, আমগাছ, সাবুগাছ, তা'দের তলে জল দিবার জন্য বেশ আল বাঁধা, ফুলে চারিদিক আলোকিত। পাতাবাহারও মধ্যে মধ্যে আছে। প্রথম প্লাটফরম, তারপর রাস্তা, তা'রপর এক সার গাছ, তারপর রাস্তা, তারপর ফুলের গাছ ও রেলের বেষ্টনী। এর মাঝে মন্দিরের মত দু'দিকে চূড়াধারী কাঠের খোদিত ষ্টেশনের ইংরাজী, বাংলা ও ফার্সীতে লেখা নাম। ষ্টেশন মাষ্টারের অধি-কাংশ ঘর টিনের ও টাইলের, কেবল জংশনের ঘরগুলিই পাকা। মোটামুটি ষ্টেশনগুলির দৃশ্য বড় সুন্দর। ষ্টেশনের অধিকাংশ কর্ম্মচারীই নাগপুরী। এই রেল লাইনের দৃশ্য বড়ই মনোরম। প্রথমেই শোণ, তারপর কংসাবতী দামো-দর প্রভৃতি বহু নদ নদীই এই লাইনের মাঝে থাকিয়া ভারতের পবিত্রতার পরিচয় দিতেছে। নদীর উপর রেলওয়ে পুলও বহুদূরব্যাপী। দামোদরের বন্যার জল জমীর চারিধারে এখনও নিকটস্থ অনেক খানা ডোবা পূর্ণ করিয়া আছে। আবার লাইনের দু'ধারে বহুদূর পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Hillock, গাড়ী এক এক জায়গায় যেন পাতালপুরীর মত দু'দিকে পাহাড় ভেদ করিয়া চলিতেছিল। ঐ পাহাড়গুলির অধিকাংশই বালি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর জমিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। পাথরগুলির রং এঁটেল মাটির মত ও ফাটা ফাটা। তার উপর চারিধারে বড় বড় শাল-বন। শুনিলাম, ঐ শাল-বাগানগুলি প্রত্যেক ৩।৪ বৎসর অন্তর ৩।৪ হাজার টাকায় বিক্রয় হয়। প্রকৃতি হইতেই এ বনের উৎপত্তি। উপরে নীলাকাশ, নিম্নে ভারতের নানা নদী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী, শাল, পিয়াল, কাঁওল (পাকা গাবের মত একপ্রকার ফলের গাছ) বন, শ্যামল ধান্যের ক্ষেত্র; ধানগুলি কাটিয়া লইয়া গিয়াছে,—আছে কেবল তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিম্ন গুচ্ছ-ভাগ। জগতের সর্ব্বত্রই এমনি; কি নর-জগতে, কি বৃক্ষ-জগতে, সর্ব্বত্রই জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া চলিয়া যায়, থাকে তাহার স্মৃতি, সে কেবল তাহার পরিচয় দিবার জন্য জগতে থাকিয়া যায়। যিনি মনুষ্য, মনুষ্যত্বই যাঁহার সমুদয় হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তিনিই এ জগতে চির-বিদ্যমান থাকেন, তাঁহার এ দেহতরি লয় হইলেও তাঁহার কীর্ত্তি-বিজড়িত স্মৃতিপট অনন্তগগনে চির জাজ্বল্যমান থাকে। সেই জন্যই ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কবি স্কট্ একদিন গাহিয়াছিলেন—

Breathes there the man with soul so dead,
Who never to himself hath paid,
This is my own, my native land.!

*   *   *

If such there breath, go, mark him well!
For him no minstral raptures swell,
High though his titles, proud his name,
Boundless his wealth as wish can-claim,
Despite those likes, power, and helf,
The wretch, concentred all in self,
Living, shall forfeit fair renown,
And, doubly dying, shall go down
To the vile dust, from whence he sprung,
Unwept, unhonoured, an unsung.

হৃদয়হীন মনুষ্য যে অকালেই লোকচক্ষু হইতে অন্তর্হিত হয়। সুশোভন নয়নরঞ্জন অট্টালিকা, বলিষ্ঠ অশ্বযুক্ত যান, অসংখ্য ভৃত্য, সুন্দর ধনরত্নপূর্ণ প্রকোষ্ঠ ও নবনীতবৎ অনুপম দেহ;—সকলই এ জগতে থাকিয়াও তাহার উপযুক্ততা প্রদর্শন করে না। কারণ যে জিনিষ, সে যদি তাহার উপযুক্ত কর্ম্ম সাধন না করে, অম্ল যদি তিক্ত হয়, মিষ্ট যদি কটু হয়, তবে তাহারা যেমন স্ব স্ব উপাধিভ্রষ্ট হয়, তদ্রূপ ঐ সর্ব্বরত্নভূষিত-নরকুলতিলকও এ জগতে 'নর' আখ্যা হইতে ভ্রষ্ট হয়েন।

মঙ্গলময় বিধাতা প্রতিনিয়তই আমাদের দেখাইতেছেন যে, স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই তোমাদের কর্ম্ম, আর সেই কর্ম্ম সাধন করিতেই তোমরা জন্মিয়াছ। যদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম-চ্যুত হও, তাহা হইলে তোমাদেরও এমনি পতন ঘটিবে। কিন্তু কই, আমরা কি তাহা একবার ভাবি, না তদনুরূপ কার্য্য করি? যদি করিতাম, তবে "এ জগতে সুখ নাই, এ জীবনে সুখ নাই, হায়! সারা জীবন কষ্ট করিয়াই মরিলাম" ইত্যাদি এ সকল আক্ষেপ আর কখনও আমাদিগকে করিতে হইত না। হায়! দিন দিন আমরা কি অন্ধই না হইতেছি! মঙ্গলময়ের বিধান সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতেছি, তবুও আমাদের চক্ষু প্রস্ফুটিত হয় না, অথচ আমরা অহঙ্কার করি, আমরা কত জ্ঞানী, কত সুখী!

এই সকল দৃশ্য দর্শন দ্বারা আমরা মঙ্গলময়ের এই লীলা স্পষ্টই অনুভব করিতে লাগিলাম। আমাদের মধ্যে সকলেরই সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা ছিল; তখন একজন গাহিতে লাগিলেন,—

ধন, ধান্য, পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক (সে যে) সকল দেশের সেরা;
সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা,
এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবেনাক' তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার "জন্মভূমি!"

* * * *

এই গানটী গাহিয়া তিনি মাতৃভূমির যাবতীয় সৌন্দর্য্য ও গুণপণা আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে গাঁথিয়া দিলেন। সে সঙ্গীত সে সময় আমাদের হৃদয়কে যে কি মাতৃ-প্রেম-রসে আপ্লুত করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। যিনি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ দ্বারা কি আনন্দ, কি প্রেম ও প্রীতি লাভ করা যায়। আমরা বঙ্গবাসী সকলকেই এইরূপ অবকাশমত এ ভারতের অনন্ত উপাদান সংগ্রহ ও সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে অনুরোধ করি। ভাব-জগতে রাজত্ব করা অপেক্ষা দর্শন ও অনুভূতিই অধিকতর আনন্দদায়ক।

এইরূপ নানাপ্রকার আনন্দদায়ক মনোহর দৃশ্যসমূহ দর্শন করিতে করিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আহারাদি ট্রেণেই করিলাম, কারণ, পূর্ব্ব হইতেই আমাদের খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া সঙ্গে লইয়াছিলাম, ভক্ষণ কাওই কেবল বাকি ছিল, তা এই বাষ্পীয়যানেই সারিয়া লইলাম। জলও ষ্টেশনেই পাইলাম, সুতরাং আমাদের উদরদেবও নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা করিতেছিলেন।

অতঃপর বেলা ১২॥০ টার সময় আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশনটী "বিষ্ণুপুর" নামেই খ্যাত। গাড়ী থামিল, আমরা ট্রেণ হইতে নামিলাম। আমাদের বন্ধুটীকে দেখিয়াই ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার আলাপ-পরিচয়ে আমরা বেশ প্রীত হইয়াছিলাম। এখানে গাড়ী পাঁচ মিনিট থামে, সুতরাং সে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া অগ্রসর হইল, আমরাও আমাদের জিনিষ পত্র অশ্বযানে উঠাইতে আদেশ দিলাম। আমাদের যাত্রার বিষয় পূর্ব্ব হইতেই-

বন্ধুটী ষ্টেসনমাষ্টারকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সুতরাং কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। তবে এখানে অধিকাংশই গোযান, দু'চার খান অশ্বযানও পাওয়া যায়; সেগুলি প্রায়ই পূর্ব্ব হইতে অধিকৃত থাকে, কাযেই অশ্বযানের আশা পথিককে ত্যাগ করিয়া—গোযানের ব্যবস্থাই করিতে হয়।

ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় একজন শিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও সদ্‌গুণশালী ভদ্রলোক। আমরা পরে জানিলাম, তিনি পূর্ব্বে দশ বৎসর গভর্ণমেণ্ট ষ্টীমার সার্ভিসে কার্য্য করিয়াছিলেন। সে সময় তিনি ম্যাণ্ডেলাই, পেগু প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। সে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নয় বৎসর যাবৎ বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যতৎপরতা ও মহত্ত্বতার প্রমাণ-স্বরূপ একটী ঘটনা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম।

আমরা যে দিন ওখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করি, সে দিন একজন রেলওয়ে সিগনালার মত্তাবস্থায় আফিসে হাজির হন। সে সময় একটী সংবাদ টেলিফোন দ্বারা ঐস্থানে আসিতেছিল, কিন্তু তিনি তখন পূর্ণ বিকৃতমস্তিষ্ক-অবস্থায় ঐ টেলিফোন ধরেন এবং একটী কথা সুস্পষ্ট ধারণা করিতে না পারিয়া, কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ দ্বারা টেলিফোনেই সংবাদদাতাকে গালি বর্ষণ করেন। তাহা শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় তাঁহাকে আফিস হইতে বাহির করিয়া স্নান করিতে আদেশ করিলেন, সে টলিতে টলিতে চলিয়া গেল। লোকটীর বয়স হইযাছে, পাকা চুলে কলপ দিয়াছেন, তবুও রোগ গেল না। লোক-পরম্পরা শুনিলাম, মাষ্টার মহাশয় এইরূপ নেশা প্রভৃতির ঘোর শত্রু। তিনি নিজে ত স্পর্শ করেনই না, এমন কি, অধীনস্থ সামান্য কুলী হইতে আসিষ্ট্যাণ্ট কাহাকেও উত্তেজক দ্রব্য পান বা ভক্ষণ করিতে দেন না। আমরা ইহা দেখিয়াছি যে, এরূপ কর্ম্মজীবী লোক আজকাল প্রায় পনের আনা নেশার বশীভূত, বয়সে কম বা বেশী জ্ঞান নাই, ওরূপ রেল বা ষ্টীমার সার্ভিসে কার্য্য দ্বারা ঐ গুণজাত ও চরিত্র পূর্ণমাত্রায় নষ্ট করিয়া অসহ্য রোগাক্রান্ত হয়; কিন্তু এই ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের চরিত্রে ঠিক তাহার বিপরীত দেখিলাম, তিনি ব্রাহ্মণ ও উন্নত চরিত্রের লোক। তাঁহার সঙ্গিগণও ঠিক তদ্রূপ; তবে উপরোক্ত ব্যক্তি নবাগত। তিনি কুৎসিত ব্যবহার দ্বারা ঐ ব্যক্তির উপর এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, ঐ দণ্ডেই তাহাকে "ডিস্‌মিস্" করিতে পারিতেন এ ক্ষমতা তাঁহার ছিল। কিন্তু তাঁহার মনুষ্যত্ব আছে, তাই তিনি আমরা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "ও লোকটী আজ তিনদিন

আসিয়াছে, তা'র মধ্যেই এই কাণ্ড। আমি এখনি ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারি, কেবল দিতেছি না—ওর পরিবারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া। ও'র ত কোন জ্ঞান নেই, নইলে আজ বুড়ো বয়সেও চুলে কলপ দিয়ে মদ খেয়ে এরূপভাবে ব্যাড়ায়! ও'কে দূর কর্‌লে ত ও'র কিছু ক্ষতি হ'বে না, হ'তে হ'বে কি ওর পরিবারবর্গ খেতে না পেয়ে মর্‌বে। সেই জন্যেই আমি এখনও কিছু কর্‌চিনে, দেখি আরও দু'একদিন।"

বাস্তবিক সেই দণ্ডেই তাহার কুৎসিত ব্যবহারের জন্য টেলিফোন্ করা হইল, তাহাতে উপর হইতে তাহার জন্য আরও ২।১ বার দেখিতে অনুরোধ হইল।

হায়! দেশের কি দুর্দ্দিন! চরিত্রহীন হইলে মানুষের এমনি মনুষ্যত্ব লোপ পায়! যাহার প্রতি তাহার স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি সকলে চাহিয়া আছে, যাহার অভাবে তাহাদের উদরায় মিলা ভার, সে আজ কি পশু হইয়া তাহাদের প্রতি প্রীতি, প্রেম, স্নেহ সকলি বিসর্জ্জন দিয়া অসার কামতৃপ্তির জন্য বৃদ্ধ বয়সেও কুৎসিত বৃত্তি দ্বারা আনন্দ লাভ করিতেছে!

কিন্তু আমরা মাষ্টার মহাশয়ের ক্ষমা সূচক মহদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া এতদূর বিস্মিত হইলাম যে, এ সংসর্গের মধ্যেও যে এমন দুর্লভ রত্ন থাকে, তাহা এই আমাদের প্রথম দৃষ্টিগোচর হইল। তাঁহার উদার হৃদয় ও মহৎ কর্ম্ম-সাধন দ্বারা সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করে। ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

অতঃপর আমরা অশ্বযানে আরোহণ করিয়া ষ্টেশন হইতে বাঁধা রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। একপোয়া রাস্তা পার হইয়া বিষ্ণুপুর নগরে আমাদের গাড়ী প্রবেশ করিল। রাস্তার দু'ধারে দোকান, মাঝে বালুকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-খণ্ডমিশ্রিত সুন্দর রাস্তা। এইরূপ কয়েকটী দোকান অতিক্রম করিয়া কোর্টের পার্শ্বে আমাদের গাড়ী উপস্থিত হইল। এখানে কোর্ট দুইটী, একটী ফৌজদারী, অপরটী দেওয়ানী। দেওয়ানী আবার তিনটী মুন্সেফ দ্বারা পরিচালিত হয়। বাঁকুড়া জিলায় বিষ্ণুপুর একটী সব্‌ডিভিসন্। কোর্ট অতিক্রম করিয়া বরাবর পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে আমাদের গাড়ী চলিতে লাগিল। শেষে থানা, মিউনিসিপ্যাল অফিস, মিউনিসিপ্যাল দাতব্য চিকিৎসালয়, বাজার, মেয়ে স্কুল প্রভৃতির নিকট দিয়া অর্দ্ধঘণ্টা সময় অতিবাহিত করিয়া আমাদের গাড়ী বন্ধুর বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বন্ধু সাদরে আমাদিগকে তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন। আমাদিগকে দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়েরা সকলেই অতিশয় প্রীত হইলেন। সে দিন আর কিছু দেখা হয় নাই, কেবল আহারাদিতেই কাটিয়া গেল।

পরদিবস বৈকালে জলযোগ সারিয়া আমরা দেশ পরিদর্শনে বাহির হইলাম। এখানে আমরা দিন কুড়ি ছিলাম; কথা ছিল আট দিনের, কিন্তু বন্ধুর আত্মীয়বর্গের অনুরোধে ও ছুটীর মরশুম বলিয়া এতদিন থাকিতে বাধ্য হইলাম। ইহার মধ্যে পাঁচদিন আগ্রহ সহকারে নানা স্থান ও নানা অরণ্যপূর্ণ দেবালয় দেখিয়া বেড়াইয়াছিলাম। বক্রী কয় দিবস কোন কার্য্য উপলক্ষে ভ্রমণ করা হইয়াছিল; কি জন্য তাহা পরে বলিব। এক্ষণে ওখানকার দ্রষ্টব্য বিষয় ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বিষ্ণুপুর একটী কেল্লা। চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকা ও কঙ্কর মিশ্রিত উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত ঢেউ খেলাইয়া সারা বিষ্ণুপুরটীকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার ধারে ধারে লম্বা খাত, অধিকাংশ সময়ই তাহা জলপূর্ণ থাকে। ইহার চতুর্দ্দিকেই একটী না একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। এদেশে উহাকে "বাঁধ" বলে। ঐ বাঁধগুলির জল যেমন স্বচ্ছ, তেমনি সুস্বাদু। এই বাঁধগুলির মধ্যে নিম্নে কয়েকটীর নাম উল্লিখিত হইল—

লাল বাঁধ,
কৃষ্ণ বাঁধ,
কালিন্দী বাঁধ,
যমুনা বাঁধ,
পোকা বাঁধ প্রভৃতি।

ইহার মধ্যে "লাল বাঁধের" জলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহা এখানকার মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃক কেবল পানীয়ার্থেই ব্যবহৃত হয়, কেহ উহাতে স্বয়ং বা গো, মহিষাদি স্নান করাইতে পারে না। অধিক দিনের রোগাক্রান্ত রোগিগণের পক্ষে শেষে এই বাঁধের জলপানই রোগনিবারণের একমাত্র ঔষধ বলিয়া চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয়। এ'টী এদেশের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত।

"কৃষ্ণ বাঁধটী"ও বৃহৎ ছিল, তবে এখন সংস্কার অভাবে শৈবালপূর্ণ হইয়া জলের বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়াছে। ঐ বাঁধের জল এক্ষণে নদীর আকারে পরিণত হইয়া দামোদরে মিশিয়াছে। এখানকার অধিবাসিগণ ইহার তীরেই শবদাহ কার্য্য সমাধা করে। এ'টী এখানকার উত্তর সীমান্তে অবস্থিত ও রাজ-



তপস্বিনী গৌরী

'কৃতাভিষেকাং হুতজাতবেদসং ত্বগুত্তরাসঙ্গবতীমধীতিনীম।
দিদৃক্ষবস্তামৃষয়োঽভ্যুপাগমন্ ন ধর্মবৃদ্ধেষু বয়ঃ সমীক্ষ্যতে॥"

কুমারসম্ভবম্।

ENGRAVED & PRINTED BY
ACME PRINTING & PROCESS WORKS.
nherst St. Calcutta

বাটীর নিকটবর্ত্তী। ঐ শবদাহ স্থানে "শ্মশান-কালীর" একটী বৃহৎ মন্দির আছে। ঐ বিগ্রহ পাষাণ নির্ম্মিত ও বিষ্ণুপুররাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার কিছু দূরে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত রথ আছে, শুনিলাম উহা রাজাদের সময় চালিত হইত। এখন তাহার চক্রগুলি মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়াছে। এখান হইতে দক্ষিণদিকে দৃষ্টি করিলে একটী বৃহৎ বালুকাময় ঢিপি দৃষ্ট হয়, ঐ স্থলে বিষ্ণুপুররাজের তিনটী কামান আছে। শুনিলাম উহা শারদীয় পূজার সময় ব্যবহার করা হয়। তথা হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইলে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্বার। উহার মধ্য দিয়া যাতায়াতের দু'টী খিলান ছিল, একটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—অপরটী আছে। ঐ ভগ্ন ভাগের অংশ দিয়া উহার উপরে উঠিবার একটী সিঁড়ি ছিল, তাহার কতক অংশ আজিও বিদ্যমান আছে। তাহার মধ্য দিয়া গমন করিয়া যাইলে একটী খাত ও তদুপরি ক্ষুদ্র সাঁকো, উহা পার হইয়া একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃহৎ ও দ্বিতল-সমান উচ্চ গেট। এইটী রাজবাটীর প্রবেশ-দ্বার। এর দু'দিকে দুই বৃহৎ কপাট ছিল, বর্ত্তমানে সে কপাটও নাই, আর কিসের দ্বারা যে উহা নির্ম্মিত ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় না।

তাহাতে বৃহৎ অর্গল ব্যবহৃত হইত। তাহার প্রমাণ স্বরূপ আজিও দেওয়ালের দু'ধারে গর্ত্ত ও আটকাইবার জন্য লৌহনির্ম্মিত এক একটী লৌহ ফাঁস বিদ্যমান আছে। এই গেটটী দ্বিতল ছিল। প্রথম তলে দেওয়ালের গাত্রে কতকগুলি ফোকর আছে, ঐ ফোকর গুলি দিয়া শত্রু আগমনের সময় গুলি ছোড়া হইত। উহা এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে, গেটের ভিতরে শত্রুর গুলি প্রবেশের সাধ্য নাই, অথচ তাহারা তাহাদের মারিতে পারিবে। আরও দেখিলাম, একতল হইতে দ্বিতলের উপর উঠিবার একটী সিঁড়ি আছে; ঐ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া শত্রুগণের আগমনাদি নিরীক্ষণ করিতে পারিত। এইখান হইতে দেখিতে পাইলে গোলা, গুলি বর্ষণ করিত ও তিনটী দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিত। কিন্তু যদি তাহাতে অকৃতকার্য্য হইত ও শত্রুগণ গেটের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাইত, তখন তাহারা নিম্নতলে আসিয়া ঐ ফোকর দিয়া গুলি বর্ষণ করিত। এইরূপ ভাবে ঐ খিলানে দ্বারের তিনটী কপাটের চি[illegible] আছে। প্রথম দ্বারটী শুনিলাম অনেক দিন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত এইটী আছে, তন্মধ্যে শেষোক্তটীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঐ সকল দ্বারগুলি সর্ব্ব সৈন্যসমাবৃত থাকিত। প্রথম দ্বারে শত্রু জয়ী হইলে দ্বিতীয় দ্বারে যুদ্ধ করিত

হইত, সেখানে যদি দোষী হইত, তখন এই শেঠ দ্বারে শূল করিতে হইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই দ্বারের উত্তর ভাগে ঐ ফাঁকগুলি ও সৈন্যদের ভিতরে গৃহ ছিল, ঐ গৃহের ছাদ বিনা কড়ি ও বরগার সাহায্যে প্রস্তুত। যদিও উহার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়াছে, তথাপি বাকী অংশ দেখিলাম—কেবল দেওয়ালের পূর্ব্ব পশ্চিম দু'ধারে কড়ির মত মোটা আঙ্গুল দশ লম্বে ইষ্টক সজ্জা, তাহার উপর দ্বিতলের মেজে, সেও প্রস্থে পাঁচ হাত, লম্বে দশ বার হাত হইবে। কেমন করিয়া যে রহিল ইহাই আশ্চর্য্য! এই গেটটী লম্বে ৩০।৪০ হাত হইবে। ইহার দু'দিকে দু'টী দ্বার ও মধ্যেও কবাট ব্যবহারের মত প্রস্তুত করা হইয়াছে। এ'টীর এক ছাদ ভিন্ন অন্য সকল গঠনগুলি বৃহৎ বৃহৎ এদেশীয় প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। ঐ মধ্যের দ্বারটী। চৌকাঠ লৌহ-নির্ম্মিত। সম্ভবতঃ আর দু'টীও ঐরূপ হইবে। এই গেটের মধ্য দিয়া রাজবাটী আসার মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, উহা উত্তরদিক হইতে পূর্ব্বদিকে "লাল বাঁধ" পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, পূর্ব্ব রাজবাটীর কিছুই বিদ্যমান নাই; কেবল কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত একটী সামান্য অট্টালিকাই রাজবাটী বলিয়া কথিত।

এই রাস্তা দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে একটু যাইলে "মৃণ্ময়ীর" মন্দির। ঐ দেবী দুর্গা—লক্ষ্মী-গণেশাদি-বেষ্টিত শারদীয়-প্রতিমা।

প্রতিমাটী মৃত্তিকানির্ম্মিত ও সুন্দর কারু-কার্য্যপূর্ণ। ইঁহার উপরি-ভাগে বৃষসমেত ব্যোমকেশ অবস্থিত। মায়ের মূর্ত্তি বড়ই মনোহর। গলে মৃত্তিকানির্ম্মিত মাল্য যেন সদ্য প্রস্ফুটিত মল্লিকা মালার ন্যায় শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এই প্রতিমার পশ্চিম ভাগে লক্ষ্মীর পাদদেশে "মহারাজ শ্রীনীলমণি সিংহ" এই কথা লেখা আছে। ঐ মন্দির একটী পূজার দালান বিশেষ; অনুমানে বোঝা যায়, ঐ বিগ্রহ অন্যূন এক শত বৎসরের হইবে। এখন উহার অবস্থা ভগ্নপ্রায়। কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতির হস্তপদাদি ভগ্ন হওয়ায় মৃত্তিকা ও খড় দর্শন করা যাইতেছে। শুনিলাম, দেবীর মূর্ত্তি পুরাতন, তবে মুখটী নূতন, উহা জনৈক বিকৃতমস্তিষ্ক রমণী-কর্ত্তৃক ভগ্ন হয়, পরে এই নূতন মুখটী বসান হইয়াছে। এই মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির, তাহাও ভগ্নাবস্থায় আছে। রাজবাটীর চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি উচ্চ উচ্চ কারুকার্য্য-সুশোভিত দেব-মন্দির, উহার কয়েকটীতে বিগ্রহ আছে, কয়েকটী শূন্য অবস্থায় ভগ্ন হইতে বসিয়াছে। এখান হইতে পূর্ব্বদিকে কিছুদূর যাইলে বামভাগে একটী উচ্চ

চতুষ্কোণ স্তম্ভ দেখা যায়, ঐটী "গুমগড়" নামে খ্যাত। উহার গায়ে একটী নালা আছে, নিম্ন হইতে ওটী কি তাহা বুঝা যায় না, আমরা ব্যগ্র হইয়া নিকটবর্ত্তী একটা তেঁতুল গাছে উঠিয়া দেখিলাম, উহা একটী চৌবাচ্চা-বিশেষ। উহার গভীরতা প্রায় ১০ হাত—সম্ভবা প্রায় ১৫ হাত হইবে। এক্ষণে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাসে পূর্ণ। শুনিলাম, উহাতে একটী ফোয়ারা ছিল। জল পরিষ্কৃত হইয়া ঐ ফোয়ারায় আসিয়া, পরে রাজবাটীর স্নানের জন্য কলের জলের ন্যায় রাজবাটীতে সরবরাহ হইত। এবং সেই অভিপ্রায়েই গাত্রে একটী জল বাহির হইবার নালা আছে। কেহ কেহ বলেন, উহাতে গুরুতর অপরাধীদের নিক্ষেপ করা হইত; কিন্তু তাহা কেমন করিয়া হইবে? যাহার গভীরতা এই, উচ্চতাও রাস্তা হইতে একতল সমান, তাহা হইতে যে পলায়ন সম্ভবপর নয় তাহা তর্কবিরুদ্ধ, বিশেষ সে কালে। উহার গাত্রে লেখা আছে—"শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ।" সম্ভবতঃ উনিই উহার প্রতিষ্ঠাতা।

উহা অতিক্রম করিয়া আরও অগ্রসর হইলে একটী খাত ও উচ্চ পাড় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ পাড় অতিক্রম করিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইলে এখানকার এন্‌ট্রেন্স স্কুল ও বোর্ডিং দেখা যায়। সেখান হইতে পশ্চিম দিকে বরাবর একটী পাড়—পার হইলে একটী বৃহৎ ময়দানে আসা যায়। ঐ স্থানে একটী বৃহৎ দেবালয় আছে। উহাকে "রাসমঞ্চ" বলে। ওটী নিয়ে খিলান গাঁথা, দৈর্ঘ্যে—৫০।৬০ হস্তেরও ঊর্দ্ধ হইবে, প্রস্থে হাত কুড়ি বাইশ হইবে। ইহার দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম কেবল খিলান করা ফোকর ও উপরে এক একটী চূড়া, এই চূড়াবেষ্টিত মন্দিরের মধ্যভাগে একটী বৃহৎ কারুকার্য্য-শোভিত চূড়া অবস্থিত। পার্শ্বের চূড়া কতক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আছে কেবল মধ্যের "গম্বুজটী।" শুনিলাম, বিষ্ণুপুর-রাজকর্ত্তৃক ৩৬০টী বিষ্ণু-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, রাসের সময় ঐ বিগ্রহগুলি এখানে আনাইয়া রাসলীলা করিতেন। শুধু যে এই ৩৬০টী মন্দিরই বিষ্ণুপুর-রাজ্যে আছে তাহা নহে, এতদ্ব্যতীত রাজগণকর্ত্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যয়ে বিষ্ণুপুরের চতুর্দ্দিকে, বহু শিব প্রভৃতির মন্দির আছে। রাজার উদ্দেশ্য ছিল, যেখান হইতেই আসুন বা গমন করুন, দেব-দর্শন হইবেই হইবে। আরও শুনা যায়, ঐ সকল মন্দিরে প্রত্যহ দীপদানের জন্য দৈনিক এক মণ সর্ষপ তৈল ব্যয়িত হইত। এবং ঐ দেবালয়ের মাল্যদান প্রভৃতি কার্য্যের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাসভূমি, জলাশয় ও কিছুন্‌কম একশত বিঘা জমী দান করিয়া এখানে বাস করান। এক কথায় রাজা

কর্ত্তৃকই ইহারা প্রতিপালিত হইত। এখানকার যত অধিবাসী আছে, সকলেই বিষ্ণুপুররাজ-কর্ত্তৃক এককালে পোষিত হইয়াছিল ও আজ সেই নিষ্কর জমী, বাগান, বাগিচা সুখে ভোগ দখল করিতেছে। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা কুড়ি হাজার। এই রাজ-বংশ বীরশ্রেষ্ঠ বীর হাম্বির সিংহ হইতে উদ্ভূত। শুনা যায়, বীর হাম্বির একজন পরাক্রান্ত হিন্দুস্থানী লোক ছিলেন। এক সময়ে চৈতন্য দেবের কতকগুলি বৈষ্ণব গ্রন্থ গাড়ী বোঝাই হইয়া পুরী অভিমুখে যাইতেছিল, হাম্বির-দল তাহা ধন-রত্ন মনে করিয়া কাড়িয়া লইয়া হাম্বিরের নিকট আনয়ন করে। ওদিকে বৈষ্ণবগণ চৈতন্য দেবকে পুরীতে সংবাদ দান করেন; তখন তিনি তাঁহার কয়েক জন প্রধান শিষ্যকে তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহাদের আগমনে ও সেই অমৃত মাখা ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া হাম্বির এতদূর প্রীত হয়েন, যে তিনি তদ্দণ্ডেই বৈষ্ণব-মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরম বৈষ্ণব হয়েন এবং দেশের উপকারার্থে ও বিষ্ণুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনার্থে—আপনাকে নিয়োজিত করেন। এই অভাবনীয় ঘটনাই বিষ্ণুপুর-রাজ-বংশের বৈষ্ণব ধর্ম্মে আস্থা প্রদানের ও মনুষ্যত্ব দানের প্রধান কারণ। শেষে তাঁহারা এতদূর বিষ্ণুভক্ত হয়েন যে, মহাত্মা রাজা রামকৃষ্ণের সময় বিষ্ণুপুরবাসী সকলকেই দিবাভাগে স্নানের পর কিছুক্ষণ হরিনাম জপ করিয়া অন্ন গ্রহণ করিতে হইত। রাজা স্বয়ং তাহা অনুসন্ধান করিতেন। একবার ঘটনাক্রমে এক জালিক দ্বিপ্রহরের সময় মৎস্যাদি ধৃত করিয়া ফিরিয়া আসে, ও স্নানান্তে—হরিনাম জপের জন্য তাহার স্ত্রীকে মালা আনয়ন করিতে বলে, তাহাতে সে বলে, "আর ব্যাগার দিয়া কায নেই, খেয়ে দেয়ে মালা নিয়ে খুব রাজার ব্যাগার দিও।" তদুত্তরে জেলে বলিল, "না, রাজা টের পেলে এখনি মুণ্ড ছেদন করবেন, তাতে কায নেই, একবার নিয়ে এস, ব্যাগারটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে খাই।" অগত্যা জেলেনী তাহা আনিল, সে বার কতক জপ করিয়া ভাত খাইল। দৈবযোগে রাজা ছদ্মবেশে নগর পরিদর্শনার্থ বহির্গত হইয়া ঐ কথা শুনিতে পান এবং পর দিবস তাহাকে রাজ সভায় ডাকাইয়া সমুদায় জিজ্ঞাসা করেন, ব্যাচারা জেলে ভয়ে সব বলিয়া ফেলে। তখন রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, এটা ব্যাগার মনে কর! বেশ তোমার খাবার দাবার জন্যে অত বেলা হয় তাই— "হরিনাম জপ" ব্যাগার, আচ্ছা আজ থেকে তোমার সংসারের সকল ব্যয়ভার আমি নিলাম, তুমি সারাদিন এমনি করিয়া আমার ব্যাগার দিবে।"

রাজার কথা শুনিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় পুলকিত হইল ও সে বহুবার রাজাকে প্রণাম করিল এবং আজীবন হরিনাম জপ করিয়া কালে একজন মহৎ লোক হইয়াছিল। এই ঘটনায় শেষে উক্ত জপাদি "রাজা রামকৃষ্ণের ব্যাপার" বলিয়া প্রচলিত হয়। এই জলাশয়াদি সমস্তই বিষ্ণুপুর-রাজকর্ত্তৃক খনন করা হয়।

পূর্ব্বে যে সকল দেবালয়ের কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে এই "রামকৃষ্ণ"ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অপরগুলিও নিতান্ত কম নহে, উচ্চে এক একটী মন্দির ত্রিতল সমান উচ্চ ও খিলান করা। ইহার মধ্যে খড়ের ঘরের মত গাঁথা "যোড়া মন্দির" বড় সুন্দর। বিখ্যাত সুবর্ণ-নির্ম্মিত কলিকাতার "মদন গোপাল" বিগ্রহও ইঁহাদের। ঐ সকল মন্দিরের নিকট ভোগের ঘর, সেবাইতের ঘর, নাট-মন্দির প্রভৃতি ছিল, আজ তাহা ধ্বংসোন্মুখ।

ঐ রাসমঞ্চ দেখিয়া আবার আমরা এই রাস্তায় আসিয়া লাল বাঁধের ধারে আসিলাম। লালবাঁধ দেখিয়া একটু দক্ষিণে "কালাচাঁদের" বাগান যাইতে পথিমধ্যে শুনিলাম, রাজাদের দু'টী বৃহৎ কামান পড়িয়া আছে। ঐ দু'টীর নাম দল ও মাদল। ব্যগ্র হইয়া তাহা দেখিতে গেলাম, গিয়া দেখি,—একটী বালুকা ঢিপির পরপারে রাস্তার ধারে আম্রতলে তাল-বৃক্ষের কাণ্ডের ন্যায় বৃহৎ একটী কামান পড়িয়া আছে, উহার নাম দল; অপরটী নিকটবর্ত্তী একটী পুকুরের মধ্যে পড়িয়া আছে। ঐটী লম্বে প্রায় ১৫ হাত, প্রস্থে এক হাত, উহার গভীরতাও আধ হাত হইবে।

শুনিলাম, গভর্ণমেণ্ট উহা কেল্লায় লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন; কিন্তু এত ভারি যে হাতীতেও তাহা গাড়ীতে উঠাইতে পারে নাই, কাযেই তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে হইয়াছে। আরও শুনিলাম যে, ঐ কামান দু'টীর দেবতার ন্যায় নিত্য পূজাদি হইত। আজও গ্রামবাসী সকলে তাহাতে সিন্দুর দান করিয়া থাকে। যেমন স্থানটী ফোর্ট ছিল, তেমনি চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ কামান, সৈন্যশ্রেণী, অস্ত্রশস্ত্র বিষ্ণুপুরকে শত্রু-হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিত। যে কামানগুলি সহজসাধ্য, সেগুলি গভর্ণমেণ্ট কেল্লায় আনিয়াছেন, আছে কেবল "দল মাদল" এবং পূর্ব্বোক্ত কামান তিনটী। এ দেশবাসী ঐ সকল বালুকা ও প্রস্তর-জমান ঢিপিগুলিকে "মুচ্ছা" বলিয়া থাকেন। ঐ কামানের নিকটে "নন্দলাল" ও "কালাচাঁদ" প্রভৃতির তিনটী মন্দির আছে। মোট কথায়—বিষ্ণুপুরের চতুর্দ্দিকে মাঠে মাঠে সর্ব্বত্রই দেবালয় বিরাজমান।

এখান হইতে ফিরিয়া লাল বাঁধের উত্তর দিয়া একপোয়া রাস্তা অতিক্রম করিলে পিয়াল, গাঁওল, বৈঁচি ও শালবন-সমাকীর্ণ একটী উচ্চ পাড়, দেখিলে পুষ্করিণীর পাড় বলিয়াই বোধ হয়। উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে একটী মন্দির ও তৎসংলগ্ন একটী বৃহৎ প্রস্তর-বেষ্টিত বক্রসোপান-শ্রেণী-সুশোভিত পুষ্করিণী, এটীকে লোকে "গোলগড়" বলে। ঐ পুষ্করিণীর গভীরতা যদিও আজ অনেক পূর্ণ হইয়াছে, তথাপি এক বাঁশের কম নহে; আমরা পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্পষ্ট বুঝিলাম। শুনিলাম এটীর নিম্নভাগে গুপ্তগৃহ ছিল, যদি জীবনসংশয় বিপদ উপস্থিত হয়, তখন রাজপুরমহিলারা এই মন্দির ও পুষ্করিণীর নিম্ন-গৃহে আশ্রয় লইবেন ও রাজগণ যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইবেন। এজন্য রাজবাটী হইতে একটী সুড়ঙ্গদ্বার এই মন্দির পর্য্যন্ত ছিল। তাহা বর্ত্তমান অধিকারিগণ সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহেন। উপরে কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের জন্য ঐ মন্দির ও পুষ্করিণী প্রভৃতি ছিল। আরও শুনা যায়, নবাবের আক্রমণে বিষ্ণুপুররাজ যখন পরাজিত হ'ন, তখন বহুমূল্য যাবতীয় ধন সম্পত্তি ঐ পুষ্করিণীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন। যাহা হউক, মন্দিরের চারিধার বহুদূর-ব্যাপী মুচ্‌চা-বেষ্টিত ও অধুনা জঙ্গলাকীর্ণ।

আমরা পাঁচদিন ঐ সকল দর্শন করিলাম, কিন্তু একটী কারণ বশতঃ এখানকার বিশেষ ইতিহাস সংগ্রহে অনাস্থা জন্মিল। এত সুন্দর দেবভূমি—যাহা "গুপ্ত বৃন্দাবন" নামে অভিহিত, সেখানকার লোক আজ আধ্যাত্মিক জগতে এত হীন কেন?

আমরা অনুসন্ধানে জানিলাম, রাজার বংশধর এখন কেহ নাই। শেষ রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারীর পুত্র বলপূর্ব্বক এই রাজ্য অধিকার করেন। রাজার দুই স্ত্রী ছিলেন। ছোট রাণীর ষড়যন্ত্রেই ঐ ব্যক্তি রাজ্য অধিকারে সমর্থ হন এবং বড় রাণীর সত্বলোপ করিবার চেষ্টা করেন। গরিবের হস্তে ধন পড়িলে যেমন হয়, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল; ঐ ব্যক্তি চরিত্র-হীনতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজ্যের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয়াদি করিতে লাগিলেন। অনেক স্থলে এরূপভাবে বন্ধক রাখিলেন যে, শেষে নিলামে ৫।৭ টাকায় এক শত বিঘা জমী বাগান সমেত বিক্রয় হইতে লাগিল। প্রভু মদনগোপালও সেই দায়ে পড়িয়া বাগ্‌বাজারের মিত্রদের হাতে বন্ধক পড়িলেন। নিজের সম্পত্তি নয়—পরের, যত যায় যত থাকে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করাই প্রধান কর্ম্ম, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। তিনিই উক্ত মৃণ্ময়ীর গাত্রে লিখিত নীলমণি

সিংহ। যে যেমন লোক, সহচরও তেমনি হয়, সুতরাং বিষ্ণুপুরবাসী অনেকেই তাঁহার ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়া নিজেরাও তাহা আরম্ভ করিল। কেহ কেহ সে অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। এ আজ একশত বৎসরের কথা। উত্তরোত্তর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কনিষ্ঠা রাণী ও নীলমণি সমচরিত্রের লোক হইলেন। দেবালয়ের বিগ্রহসকল একটী গৃহে আসিয়া একত্রীকৃত হইল, দেবালয় ভাঙ্গিয়া জঙ্গলপূর্ণ হইতে লাগিল। এই সকল কুৎসিত ব্যাপার বিষ্ণুপুররাণীর মজ্জাগত হইল, কিন্তু "অতিদর্পে হতা লঙ্কা"! একদা নীলমণি মত্তাবস্থায় ব্যাঘ্র শিকারে বহির্গত হইলেন, কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকে গুলিপূর্ণ পিস্তল লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নিজ বক্ষে প্রবেশ করিল—নীলমণির ইহলীলা সাঙ্গ হইল! তারপর? তারপর দু'পক্ষে দলাদলি বাধিল, অবশিষ্ট বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তাহাই উভয়ে ভাগ করিয়া লইলেন। দুই রাণীর দু'টী পক্ষ হইল, লোকজন সবই পৃথক্। এখন উভয় পক্ষে বিবাদ চলিতেছে, এক পক্ষ রাণী শ্রীমতী প্রসন্নকুমারী দেবী, অপর পক্ষ নীলমণি সিংহ; কোন পক্ষেই কেহ উত্তরাধিকারী নাই, গভর্ণমেণ্টও সত্ব প্রমাণ না করিয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণ ও ডিক্লারেসন্ দিতেছেন না; এখন বলিতে কি, রাজবংশের বার্ষিক আয় আড়াইশত টাকা। অতি দীন অতি হীনাবস্থায় চলিতেছে, সুবিধা—বর্ত্তমান কর্ম্মচারীদের, স্ত্রীলোক কে কি দেখে, দু'দিকেই লুট হইতেছে।

বিষ্ণুপুরের এত গৌরব, এত কাণ্ড সব গিয়াছে, লোক এখন ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও অধার্ম্মিকের চূড়ান্ত এবং মোকদ্দমা-বাজ হইয়াছে। ঘরে খড় নাই, কিন্তু প্রত্যহ সকাল হইতে বারটা পর্য্যন্ত কোর্টে আছে, প্রত্যেকের নামে ৪।৫টা মোকদ্দমা আছেই। এমন লোক নাই যে মোকদ্দমায় নাই। কতকগুলি লোকের পেশাই সাক্ষ্য দান করিয়া রোজ ।০, ৵০, ॥০ পাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা; কিসে পরের ধন ফাকি দিয়া লইব, দিবারাত্রি এই চেষ্টা। কেহ কাহারও দায়ের সময় অর্থ সাহায্য করিলে, পরে তাহা প্রত্যর্পণ করার ব্যবস্থা এদেশে নাই; তাগাদা করিলে দিবে না, তখন বাধ্য হইয়া মোকদ্দমা করিতে হয়। জমীর ধানের ভাত খায়, আর ব'সে ব'সে মোকদ্দমা করাই কায। আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, কোর্টে এত উকীল—দু'পয়সা রোজেও তাঁ'রা খাটেন! এটী প্রত্যক্ষ ঘটনা।

দেশে যদিও একটী ইংরাজী উচ্চ বিদ্যালয়,—একটী মাইনর স্কুল, মিশনরী-

দের একটী মাইনর স্কুল, একটী বালিকা বিদ্যালয় ও দু'একটী পাঠশালা আছে; কিন্তু স্থান কুৎসিত বলিয়া শিক্ষার অত আড়ম্বর সমস্তই লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া তৈলহীন দীপবৎ মিটি মিটি জ্বলিতেছে। গরিব, অসহায়-দিগের দেখিবার ও তাহাদিগের বিনা বেতনে শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। শিক্ষিত উকীল মণ্ডলী, মোক্তার মণ্ডলী, অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক সবই আছেন, কিন্তু দেশের গতি ফিরাইতে কাহারও স্পৃহা নাই। যাহাদের লইয়া আমাদের এত বিলাসিতা—এত আড়ম্বর চলিতেছে, সেই শ্রমজীবী কৃষকগণের সন্তান-সন্ততিও আজ অর্থাভাবে লেখা-পড়া শিখিতে পারিতেছে না; ইচ্ছা থাকিলেও দারিদ্র্য-দোষ মানবের চিরশত্রু।

দুঃখের কথা বলিতে কি, আমরা যখন ঐ সকল মহাশয়দিগের নিকট একটী শ্রমজীবি-নৈশবিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে উল্লেখ করি, তখন তাঁহারা স্পষ্টই বলিলেন,—"দেশে যে মুটে মজুর আক্রা, তাহাতে যদি তা'দের আরও শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে মজুর মুটে মেলা ভার হইবে; তখন আর বাঁচ্‌তে হ'বে না। আর দেখ্‌তেও পাওয়া যাচ্ছে, যে চাষার ছেলে, সে যদি ইংরাজী লেখাপড়া শেখে, তখন সে চাষ বাস ছেড়ে না খেতে পায় সেও ভাল, তবু লাঙ্গল চষা তা'র দ্বারা হ'বে না—বলি এই ত শেষে দাঁড়াবে? কলুর ছেলে লেখাপড়া শিখে বামুনের উপর চাল্ চাল্‌বে, এই'ত তোমাদের শিক্ষার কাণ্ড? ইত্যাদি।"

তদুত্তরে আমরা বলিলাম,—"মহাশয়! সে'ত ভালই, যখন মুটেরা মোট বওয়া ছাড়্‌বে, তখন আমাদের এ আলস্যটা যা'বে; আমরা তখন আপনা-আপনিই মোট বইবো। দ্বিতীয়তঃ যা বল্লেন, সেটা চাষার কেন—ভদ্রলোকের ছেলেদেরও এমন ঘট্‌ছে, এ যে শিক্ষার দোষ। কিন্তু আমরা'ত তা' কর্‌ব না,—আমরা ইচ্ছা করি, সকলকেই সাধারণ ইংরাজী, বাঙ্‌লা, অঙ্ক শিক্ষা দিয়ে তা'দের যাহার যে ব্যবসা, সেই ব্যবসায় কিসে পয়সা রোজগারের উপায় হয়, তাই করা এবং গোড়া হ'তে তেমনি ধরণের বই পড়ান। আপনি যা' বল্লেন, সেটা ইংরাজী শিক্ষার Rust বা মরিচা। আমরা ওঁদের সদ্‌গুণ নিতে জানি না, জানি দোষ নিতে—সে দোষ কা'র? শিক্ষকও তা' আমাদের বুঝান না, কাযেই আমরা ইংরাজী শিক্ষার পর এক একজন পাকা খোস নবীশ ইংরাজ হই, জ্ঞান হউক বা না হউক তা'তে আসে যায় না। এখন বলুন, যদি ঐ রকম শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে উপকার কি হয় না?

তা'তে তাঁরা বল্লেন, "বাবা! যা' বোঝ কর, আমরা বুড়ো হাবড়া—আমাদের টান ক্যানো? নিজেরা পার,—কর, বেশ, আমাদের দ্বারা কিছু হ'বে না।"

আমরা তাঁহাদের কথা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমরা বিদেশী, আমাদের পক্ষে তাহা সম্ভবপর কি না, তাহাও একবার ভাবিলেন না, অথচ ইঁহারা এদেশের মধ্যে শিক্ষিত, বয়োবৃদ্ধ ও ধনাঢ্য।

যাহা হউক, ভগবানের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আমরা ঐ স্থানের কয়েকজন উৎসাহী লোক লইয়া একটী "শ্রমজীবি-নৈশবিদ্যালয়" স্থাপন করিলাম। দেখিতে দেখিতে ছাত্রসংখ্যাও খুব বাড়িতে লাগিল। আমরা আমাদের জনৈক বন্ধুর উপর বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিলাম। এক্ষণে বন্ধুবরের চেষ্টায় ও ভগবানের অনুগ্রহে আরব্ধ কার্য্য উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিলে আমাদের সমধিক আনন্দের সীমা থাকিবে না।

জনৈক পরিদর্শক।

কোজাগর-নিশি।

মেঘময়ী বরিষার তন্দ্রা-অলসতা,
আশ্বিনের পৌর্ণমাসী প্রফুল্লবারতা
ঘুচা'য়ে— সরা'য়ে দেছে। গন্ধে রূপে রসে
শেফালী সরোজবালা মৃদু মন্দ-হাসে
মেলেছে নয়ান! চেয়ে দেখি চারি-ভিতে
কুললক্ষীকুল দিইতেছে হাতাহাতে
চারু আলিপনা; আজি সারা গেহময়
কমলা চরণ-চিহ্ন! সাজিভরা পুষ্পচয়!
বিশ্বভাণ্ডে ভরি' সুধা—ওকে হাস্যময়ী,
আসিছ—নামিছ—মৌনগানে মধুময়ী
ভাসাইয়া দশদিশি? বরিব তোমারে
আজি নব-উন্মেষিত হৃদি-পদ্ম-পরে!
সুমঙ্গল আগমন মহোৎসবে তব
শুভ্র কোজাগর-নিশি জাগিয়া রহিব!

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

হৃদয়-কবচ।

আজ দশ বৎসর অতীত হইল, সে আমাকে অন্ধকারে ফেলিয়া চিরতরে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছে।

আমি কেবল তাহারই জন্য মণিহারা ফণির প্রায়। মণিটীর অভাবে আমার আশা-প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে আমার এই অতুল সম্পত্তিতে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। বিষয়-বাসনা আর ভাল লাগে না, উহাতে জলাঞ্জলি দিয়াছি। আমি এখন অশান্তিময় সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত না হইলে, অশান্তিময় দুস্তর সমুদ্র হইতে তীরে উঠিতে পারিব না। আমি সেইজন্য বড়ই বিমর্ষ,—মুখে হাসি ফোটে না,—আড়ম্বরপূর্ণ কার্য্যে যোগদান করিতে ইচ্ছা করে না,—হৃদয় মরুভূমি-প্রায় হইয়াছে।

আমি একদা নীরবে একখানা কেদারায় হেলান দিয়া, সজলনয়নে, নিবিষ্টান্তঃকরণে, কাহারও পূর্ব্ব স্মৃতি উদ্ঘাটন করিতে, আমার হৃদয়-কন্দরে চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং দর দর ধারায় অশ্রুরাশি নিঃসৃত হইয়া বক্ষদেশ প্লাবিত করিতে লাগিল। ইহাতে পূর্ব্বস্মৃতি উদ্ঘাটন করা দূরে থাকুক, বরং চারিদিক্ হইতে দুঃখরাশি ভীমবেগে উপস্থিত হইয়া মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক আমাকে গ্রাস করিতে লাগিল। আমি উহার যন্ত্রণায় বড়ই বিব্রত এবং শোকার্ত্ত হইয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইলাম। বহিশ্চক্ষু অন্ধ হইল,—কোন জিনিষও আমার নেত্রদ্বয়-সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে নীত হইল না। ক্রমশঃ শোকরাশি ভীষণ হইতে ভীষণতর আকৃতি ধারণ করিয়া, আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিল। শোকের আধিক্য হওয়াতে, আমি পাগলের ন্যায় প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলাম এবং সময় সময় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম।

তৎপর এ অভাগার কি হইল, আমাদের প্রিয় পাঠকপাঠিকাবৃন্দ শুনিতে বোধ হয় একান্তই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন। আমি যাহার জন্য বিব্রত এবং শোকার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; সে আর কেহই নহে,—আমার জীবনের সাথী "রজনী।"

অনন্তর যৎপরোনাস্তি বিষাদিত এবং ব্যথিত হইয়া সেইখানে একখানা

কৌচের উপর শয়ন করিলাম এবং আমার জীবনের সঙ্গী সেই রজনীর সহিত পুনর্ম্মিলনহেতু মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলাম। যম কি এখন এই হতভাগার প্রতি মুখ তুলে চাহিবেন? তিনি কি এতই অনুগ্রহ করিবেন যে, আমি তাহার সহিত পুনর্ম্মিলনে সমর্থ হইব? ইত্যাকার চিন্তালহরী আমার হৃদয় মধ্যে আলোড়িত হইতে লাগিল এবং সংসারের প্রতি ক্রমেই বিরাগ ও বিদ্বেষ জন্মিতে লাগিল,—উহা আগাছাপূর্ণ উদ্যানবৎ বোধ হইতে লাগিল। সময় সময় ইচ্ছা হয়, হলাহল পান করিয়া জীবন-জ্বালা নির্ব্বাণ করি। আত্মহত্যা! আত্মহত্যা যদি পুরুষ-সমাজে একান্ত দোষণীয়, ধর্ম্মশাস্ত্র-বিগর্হিত, তথাপি আত্মহত্যা করিব। পুরুষ-সমাজে আমার নামে কলঙ্ক রটাইব। আমার গর্হিত কার্য্যে যদি পিতৃপুরুষগণ কলঙ্কিত হন, তথাপি পশ্চাৎপদ হইব না।

বিষের কৌটা হাতে করিলাম। আমি উহা বহুদিন পূর্ব্বেই সযতনে কৌচের নিম্নভাগে একটী ক্যাস বাক্সে রাখিয়াছিলাম। অদ্য সেই কৌটা বাক্স হইতে আমার হাতে আসিল। কৌটা হাতে করিলাম বটে,—কিন্তু হস্তদ্বয় স্পন্দিত হইতে লাগিল এবং উহা স্খলিত হইয়া ভূমি চুম্বন করিল;—সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি ঈদৃশ ব্যাপারে বড়ই ভীত হইলাম এবং আকস্মিক বর্ত্তমান ঘটনার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। আমার কর্ণকুহরে কে যেন মৃদু বারি বর্ষণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল;—"ছি তুমি বড়ই চঞ্চল; তুমি কি করিতে যাইতেছ? আত্মহত্যা? সে যে গুরুতর পাপ; তাহা কি তুমি বিদিত নহ? সাবধান! ক্ষান্ত হও! এ বীভৎস কাণ্ড হইতে নিবৃত্ত হও! তুমি যাহার জন্য শোকাচ্ছন্ন, ব্যথিত, বিষাদিত এবং মৃত্যুপথে দাঁড়াইয়াছ, তাহাকে সত্বরেই দেখিতে পাইবে।"

এতাদৃশ আশ্বাস বাণী শ্রবণ করিয়া, আমি অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হইলাম। আমার মনোমধ্যে নানাপ্রকার সন্দেহের উদ্রেক হইতে লাগিল। কে এমন বাণীর দ্বারা আমাকে বিপথ হইতে পথে আনয়ন করিল? এমন কোন্ দয়াল পুরুষ আছে যে, আমার মরম ব্যথায় ব্যথিত, আমার বিষণ্ণ বদন হেরিয়া বিষাদিত, আমাকে শোকাচ্ছন্ন দেখিয়া শোকাভিভূত হইতে পারে? তবে কি আমার—সেই—'রজনী'—দয়াপরবশ হইয়া প্রেতমূর্ত্তিতে আমাকে সাবধান করিয়া গেল?

কৌচের উপর শায়িত অবস্থায়, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে,

নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম এবং নিদ্রিতাবস্থায় যাহা দেখিলাম, তাহা আমার কৃশ, জীর্ণ, শোকাচ্ছন্ন শরীরকে ক্রমেই সতেজ, বলিষ্ঠ এবং আনন্দিত করিয়া তুলিল।

জ্যোৎস্না রাত্রি। আমি নির্ম্মল আকাশ-তলে, একটী প্রশস্ত উদ্যান-মধ্যস্থিত শ্বেত প্রস্তর দ্বারা বাঁধান একটী সরসী-তটে দণ্ডায়মান। সরসীর চতুষ্পার্শ্বে ফল-পুষ্প শোভিত। বকুল, মাধবী, যুঁই, মল্লিকা, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পনিচয় বিকশিত হইয়া, মনোহর গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিতেছে। সুখস্পর্শ মলয়ানিল মৃদুল হিল্লোলে প্রবাহিত হইয়া, কুসুম-সম্ভার দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপৃত করিতেছে। মধুমক্ষিকাসকল মধুর গুণ গুণ রবে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করিয়া, মধু আহরণ পূর্ব্বক বনস্পতিচয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। বিহগকুল বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া, সময় সময় মধুর ঝঙ্কার প্রদান করিয়া, শ্রোতৃবর্গের আনন্দ বিধান করিতেছে। শশধরের পূর্ণ জ্যোতিঃ সরসী-বক্ষে পতিত হওয়ায়,সরসী মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতি দেবী যেন ফল-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া, তাঁহার রূপের বিমল ছটায় জগৎ মুগ্ধ করিতেছেন। এরূপ মনোহর দৃশ্য অবলোকন করিয়া, আমার নয়ন মন পরিতৃপ্ত হইল। সুখস্পর্শ মলয়ানিলের মৃদুমন্দ প্রবাহে, আমার অসীম স্ফূর্ত্তি এবং আনন্দ বর্দ্ধন হইতে লাগিল। আমার শরীর ক্রমেই পূর্ব্বাপেক্ষা সবল ও বলিষ্ঠ বোধ হইতে লাগিল। আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, সরসীতটে পায়চারি করিতে করিতে, বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম। তৎপর কোন কারণ বশতঃ আমি মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে নেত্রদ্বয় পরিচালিত করিবামাত্র, উত্তর আকাশে, অতিদূরে, একখণ্ড রজত-সদৃশ উজ্জ্বল শুভ্রমেঘ অবলোকন করিয়া, বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। এই মেঘ-খণ্ডের আকস্মিক আবির্ভাবের কোন কারণ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। ক্রমেই ভাসমান হইয়া, নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। উহা ক্রমাগত আমার সম্মুখীন হইতেছে বলিয়া, আমি বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইলাম। আমার শরীর অবসন্ন এবং অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল।

উহা কি আমার মাঙ্গলিক কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত? না আমাকে সঙ্কটাপন্ন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছে? এই দুইটীর মধ্যে, কোনটীই সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। অবশেষে মেঘখানি অবি-

সম্বেই আমার নিকটস্থ হইবে বিবেচনায়, আমি অনন্যোপায় হইয়া শিরে হস্তার্পণ পূর্ব্বক, স্বীয় অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে, অপঘাত মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া, সরসী-তটে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, সেই রজত-সদৃশ শুভ্র মেঘখানি যেন সহাস্য বদনে, আমার নিকট-বর্ত্তী হইয়া, আমাকে অভয় প্রদান করিতেছে! এতাদৃশ ভাব অবলোকনে আমার হৃদয়ে কিছু আশার সঞ্চার হইল। আমি তখন সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, একাগ্র চিত্তে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই অভয়দাতার সহাস্য বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আমি অনিমেষ লোচনে, সেই রজত-সদৃশ শুভ্র মেঘখানির পরিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে, বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইলাম। সুন্দর মেঘখানি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, মৃদুমন্দ বাতাসে নৃত্য করিতে লাগিল। ইহার নৃত্যের তুলনায়, শিখিগণের নৃত্যও পরাজয় স্বীকার করে। মেঘখানি আমার অনতিদূরে অবস্থান করিয়া, শূন্যে মৃদুমন্দ বাতাসে দোদুল্যমানাবস্থায় নানাপ্রকার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। ঐ সমস্ত ভাব ক্রমে ক্রমে আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়া, আমাকে প্রেম-সমুদ্রের বক্ষদেশে আনয়ন পূর্ব্বক, উহার বীচিমালার মৃদু স্পন্দনে আমার হৃদয়ে এক অপার্থিব আনন্দের সঞ্চার করিল। আমার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বদনে ক্রমেই হাসির রেখা প্রকাশ পাইল। যখন এতাদৃশ প্রেম-পূর্ণ আনন্দ-স্রোত, আমার হৃদয়-সমুদ্রে প্রবাহিত হইতেছিল, তখন সেই মেঘখানির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। শুভ্র মেঘখানি শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া, অপূর্ব্ব উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রদান করিতে লাগিল। উহা পূর্ব্বাপেক্ষা শতাধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত এবং পরিষ্কৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই পরিবর্ত্তনশীল শুভ্র মেঘখণ্ডের প্রতি বিস্ফারিত নেত্রে অবলোকন করিতে করিতে তন্মধ্যে দেবগুণ-সমন্বিত, দিব্য তেজঃপুঞ্জ একজন মহানুভব ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলাম। আমি সেই উদার অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট মহানুভব ব্যক্তির সম্মুখে, নির্নিমেষ লোচনে, স্পন্দনশূন্য হইয়া, চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম।

আমি যেন এই মহানুভব ব্যক্তির সুন্দর ভাবপূর্ণ মুখখানি কোথাও দেখিয়াছি। ইহা আমার নিকট বহুদিনের পরিচিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই মুখখানি আমার প্রিয় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া স্মৃতিপথে উদয় হইতে লাগিল। সেই মুখখানি যে আমার জনৈক প্রিয়তম

বন্ধুর, ইহাতে আর কোনই সংশয় রহিল না। তৎপর আমার সেই হৃদয় ধনকে হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক, হৃৎকন্দরে শান্তিবারি সিঞ্চন করিবার নিমিত্ত, হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া আবেগ-ভরে, সেইদিকে ছুটিলাম। আমার হৃদয়মণিকে প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিবার জন্য আমি যতই অগ্রসর হইতেছি, উহা ততই পিছনে সরিয়া যাইতেছে। আমি ঈদৃশ বিস্ময়কর ব্যাপারে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এতাদৃশ ঘটনার কোন কারণ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। তথাপি প্রাণের আবেগে, হৃদয়ের ধনকে প্রাপ্ত হইবার আশায় প্রাণপণে ছুটিলাম—আমার আশা নিরাশায় পরিণত হইল। পক্ষান্তরে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত এবং অবসন্ন হইয়া, মাতা বসুমতীর ক্রোড়ে উপবেশন করিলাম। তৎপর দেখিলাম, আমার হৃদয়ের ধন পূর্ব্বে আমার নিকট হইতে যতদূর ব্যবধানে অবস্থান করিতেছিল, এখনও ঠিক ততদূর ব্যবধানে অবস্থান পূর্ব্বক আমার প্রতি প্রেম কটাক্ষপাত করিয়া, আমার মানস-ক্ষেত্রে নানাপ্রকার প্রেম-বীজ বপন করিতে লাগিল।

ইহাতে আমি চঞ্চল না হইয়া, ধীর প্রকৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক গভীর গবেষণার সহিত তাহার বিষয় লইয়া, আলোচনা করিতে লাগিলাম এবং তাহার ভাবভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। মোহান্ধকার ক্রমেই আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইল। এতক্ষণে দেখিলাম,—আমার হৃদয়-মণি শূন্যে দণ্ডায়মান, আর আমি বসুমতীর-ক্রোড়ে। পাঠক-পাঠিকাগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই মহানুভব ব্যক্তি আর আমার হৃদয়-ধন—একই ব্যক্তি—সেই 'রজনী'।

তৎপর সে আমাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, ঈষদ্ধাস্য বদনে সাগ্রহে কি যেন বলিবার নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত নিকটে আগমন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল— "তুমি এখনও স্মৃতি-কবচ বক্ষে ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছ? তুমি এখনও আমাকে পাইবার নিমিত্ত, আশা রাণীকে তোমার হৃদয়ে স্থান দিতেছ? তুমি এখনও তোমার ঈদৃশী আশা ফলবতী হইবার জন্য, মৃত্যুকে আশ্রয় করিতেছ? সে যাহা হউক, আমি তোমারই প্রাণের আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে স্বর্গচ্যুত হইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছি; তোমার সহিত আমার মিলন অসম্ভব। কারণ তুমি ইহলোকে,—আমি পরলোকে। তোমার সহিত পুনরায় মিলন হইবার মাত্র দুইটী উপায় আছে। হয় তোমাকে মর্ত্ত্যলোক

পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে আগমন করিতে হইবে ; না হয় আমাকে স্বর্গলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে গমন করিতে হইবে। তবে এস্থলে আমাকেই স্বর্গলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে গমন করিতে হইল। আমি তোমার প্রেমপূর্ণ ভালবাসার আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে, একদণ্ডও স্থির থাকিতে পারিতেছি না। তুমি যেন চুম্বক লৌহের ন্যায় আমাকে সজোরে তোমার দিকে আকর্ষণ করিতেছ। তোমার ভালবাসার কি মোহিনী শক্তি! তুমিই আমার একমাত্র প্রকৃত বন্ধু! যদি কেহ সংসারে আমার উপকারী ব্যক্তি থাকে, যদি কেহ আমার মরম ব্যথায় ব্যথিত হইতে পারে, যদি কেহ আমার বিপদে সহায় হইয়া প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে, যদি কেহ আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারে,—তবে সে একমাত্র 'তুমি'। যাও! তুমি ফিরে যাও; আমি তোমার পূজ্যাস্পদ মাতৃ-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমাকে ভ্রাতৃরূপে লাভ করিব। আমি তোমার সম্মুখে, আমার হস্তস্থিত এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা আমার বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি ছেদন করিতেছি। যে দিন আমি তোমার গৃহে ভূমিষ্ঠ হইব, সেই দিন তুমি আমার বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুল ছেদিত দর্শন করিয়া, আমি যে তোমার সেই—'রজনী', তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে"।

এই কথাটী শেষ পর্য্যন্ত উচ্চারিত হইতে না হইতেই আমার সেই—'রজনী' অন্তর্হিত হইল।

আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। আমি আমার সেই কৌচের উপরে অর্দ্ধমানাবস্থায় পূর্ব্ববৎ শায়িত রহিয়াছি। আমি যে অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয় স্বপ্ন দেখিলাম, ইহা কি সত্য? আমি কি আমার হৃদয়ধনকে পুনরায় ফিরিয়া পাইব? স্বপ্ন 'ত' অলীকও হইয়া থাকে; তবে কি ইহা আমার অলীক স্বপ্ন?

আমি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম এবং আমার হৃদয়-রাজ্যে আশা-নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাত হইতে লাগিল। স্বপ্ন-দর্শিত ঘটনাগুলি সফল করিবার মানসে, আমি আমার হৃদয়-রাজ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, উঁহাদের চরণসেবায় নিযুক্ত হইলাম এবং আমার হৃদয়-মণিকে ফিরিয়া পাইবার জন্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া, ঐকান্তিক মনে, ভগবৎ-সকাশে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। তৎপর আমি একদিন আমার

মাতৃমুখ-নিঃসৃত একটী অপূর্ব্ব স্বপ্নের কথা শ্রবণ করিয়া, আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। তিনি বলিলেন—"আমি গত রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় দেখিলাম, শারদীয় পূর্ণচন্দ্র যেন হাসিতে হাসিতে আমার দিকে অগ্রসর হইল এবং আমার জঠরে প্রবেশ করিবামাত্র আমাকে অনির্ব্বচনীয় শান্তি প্রদান করিতে লাগিল। তৎপর কিসের যেন একটা শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।"

ইহা শ্রবণ করিবামাত্র আমার বুঝিতে আর বাকি থাকিল না। আমার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় প্রীতির সঞ্চার হইতে লাগিল। দশমাস দশদিন অতীত হইলে, আমি একটী নবজাত কুমারকে ভ্রাতৃরূপে প্রাপ্ত হইলাম। সূতিকা-গৃহের দরজায় দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলাম, নবজাত শিশুটীর বামহস্তের কনিষ্ঠা-ঙ্গুল ছেদিত রহিয়াছে। এতদ্দর্শনে আমি সাতিশয় আনন্দিত হইলাম। স্বপ্নের কথা যে অক্ষরে অক্ষরে ফলিবে, এরূপ ধারণা আমার মনোমধ্যে পূর্ব্বে কখনও স্থান পায় নাই। আমি আমার প্রাণের বন্ধু সেই 'রজনী'কে অগ্র ভ্রাতৃরূপে প্রাপ্ত হইয়া, উহাকে আমার 'হৃদয়-কবচ' করিয়া রাখিলাম।

শ্রীপীতাম্বরচন্দ্র চৌধুরী।

সংসার মরীচিকা।

শৈশবে বুঝিতে নারি যৌবনের সুখ,
যৌবনে না বুঝি আমি বার্দ্ধক্যের দুখ;
বৃদ্ধকালে মৃত্যুতরে হয় অভিলাষ,
সংসারে প্রবেশকালে কত ছিল আশ!
ভেবেছিনু পাব আমি কতই যে সুখ,
পেতেছি এখন শুধু নিত্য কত দুখ,
এসে দেখি ঝঞ্ঝাটের বোঝা শুধু মাথে,
দারুণ ভাবনা সদা থাকে মম সাথে।
এ জীবনে কভু আমি ভাবি নাই এত।
ঘেরে শত দুঃখে, হলে শৈশব অতীত॥

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

শিক্ষার দোষ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নৈশ-সম্ভাষণ।

আকাশ হইতে ধরাতলে জ্যোৎস্নাধারা নামিয়া আসিয়াছিল, তাহার আলোক মাখিয়া প্রকৃতি রাণী সৌন্দর্য্যপ্রতিমা সাজিয়া খল খল হাসিতে-ছিলেন। হাসিতে দিগন্ত উজ্জ্বলীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল।

সে দিন কৃষ্ণাদ্বিতীয়া—এই মাত্র অন্ধকার অপগত হইয়াছে। শাশুড়ী ও বধূ জ্যোৎস্না-পুলকিত বারেণ্ডায় আসিয়া বসিয়াছে,—রন্ধন গৃহের কায সারিয়া, আহার সমাপ্ত করিয়া বধূ শাশুড়ীর জলপানের দুগ্ধ, ইক্ষু গুড় ও দুটী মুগের অঙ্কুর ভিজা লইয়া গৃহে যাইতেছিল; শাশুড়ী বলিলেন—"বেশ আলো আছে—এই খানেই দে মা, হাওয়া বড় ভাল লাগছে। ঘরে গরম।"

বধূ শাশুড়ীর জল খাবারের পাত্রখানি তাঁহার সম্মুখে নামাইয়া দিয়া, তারপরে আরও কিছু কায করিয়া আসিয়া শাশুড়ীর নিকটে বসিয়াছিল, এবং শাশুড়ী জলযোগ করিতে করিতে গল্প করিতেছিলেন, বধূ তাহা শুনিতেছিল ও প্রয়োজন হইলে উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতেছিল।

সহসা প্রাঙ্গণের জ্যোৎস্নার তরল আলোকের উপর ল্যাণ্ঠেনের তীব্রোজ্জ্বল আলোকপাত হইল। শাশুড়ী-বধূ চমকিয়া সে দিকে চাহিলেন,—শরহস্ত ব্যাধ-সন্দর্শনে তরুকোটরস্থ পক্ষীণীকুলে যেমন কাঁপিয়া চমকিয়া, ভীত ও উত্তেজিত হইয়া উঠে, শাশুড়ী বধূ তেমনই হইয়া উঠিলেন। ল্যাণ্ঠেনধারী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। শাশুড়ী বধূ চিনিয়াছিলেন—সে হীরালাল।

বধূ তাড়াতাড়ি সে পাপচক্ষুর অন্তরালে গৃহমধ্যে চলিয়া গেল। শাশুড়ী উত্তেজিত কণ্ঠে, পরুষ স্বরে বলিলেন—"কি গো, রাত্রে আমাদের বাড়ী কেন?"

হীরালাল—দাম্ভিক হীরালাল—অসংযমী হীরালাল—পাপী হীরালাল মুহূর্ত্তে বুঝিয়া লইল, ইহারা সহজ লোক নহে। মুহূর্ত্তে মনে করিয়া লইয়া, সবিশেষ আয়াস স্বীকার না করিলে শ্যামার নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া

আসিয়াছি, তাহা প্রতিপালন হইবে না। মুহূর্ত্তে তাহার পাপ চিত্তে উদয় হইল, যে রত্নের জন্য হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে—যাহার জন্য এত করিতেছি—যাহাকে লাভ করিতে না পারিলে, আমার শিক্ষা দীক্ষা সকলই বৃথা—,সে রত্ন—সে অমূল্য ধন শরীরপাত করিয়াও লাভ করিতে হইবে। সে একটু এদিক ওদিক করিয়া বলিল,—"রাত্রে কি আসিতে নাই ?"

অবিচলিত কণ্ঠে ননির মা বলিলেন,—"না।"

হীরা। কেন ?

ন-মা। কি প্রয়োজন ?

হীরা। প্রয়োজন না থাকিলে কেহ আসে না।

ন-মা। না,—প্রয়োজন থাকলেও আমাদের পুরুষ মানুষ বাড়ীতে নাই—কাযেই আসতে নাই।

হীরা। তাতে কোন দোষ নাই।

ন-মা। তোমাকে সে শিক্ষা দিতে হবে না—তুমি এস না।

হীরালালের মুখের উপর এমন কথা বলিযা নিজের কাঁধের উপর মাথা রাখিতে সমর্থ হয, এমন কেহ সে গ্রামে আছে কি ! সহসা হীরালালের মনে এই গভীর চিন্তার উদয হইল।

যেমন এই চিন্তার উদয় হইল, তেমনই মীমাংসা হইয়া গেল। মীমাংসা এই হইয়া গেল যে, কার্য্যোদ্ধারের জন্য সে বড় মৃদু পন্থা অবলম্বন করিয়াই এতটা গোল পাকাইয়া ফেলিয়াছে। সেই জন্যই সে মুখের উপর সামান্য একটা বিধবার নিকটে এত অপমানের বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনিয়া লইল।

তখন সে দৃঢ় কণ্ঠে ব্যঙ্গের স্বরে বলিল,—"না না, আর আমি তোমাদের বাড়ী আসিব না। এমন কত রাত্রে বউকে সঙ্গে লইয়া তোমায় আমার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে যাইতে হইবে। তখন বুঝিতে পারিবে, হীরালাল পদার্থটা কি ?"

দপ্ করিয়া দাবানল জ্বলিল। হু হু করিয়া আগ্নেয় গিরির প্রস্রবণ ছুটিল। ননির মাতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—তাঁহার মুখে চোখে সর্ব্বাঙ্গে ক্রোধের রক্ত-রাগ ফুটিয়া পড়িল। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কিরে ছোট লোকের বেটা, ছোট মুখে বড় কথা ! তোর সাত পুরুষের খবর আমি জানি—আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তুই যে কথা বল্‌লি, ভগবান তার শাস্তি দেবেন—তোর মুখে কুড়ি হবে—পোকা প'ড়বে—খসে প'ড়বে।"

হীরালাল ব্যঙ্গ-গর্ব্বের কঠোর হাসি হাসিয়া বলিল,—"বামনাই রেখে দাও বুড়ী—হয় বউ দেবে, নয় বিষয়ের মায়া—গ্রামের মায়া ছাড়্‌তে হবে।"

ন-মা। কেন, তুমি আর তোমার বাবা কি গ্রামের লাট সাহেব? দেশে কি মানুষ নাই—জগতে কি ধর্ম্ম নাই—উপরে কি দেবতা নাই?

হীরা। সব আছে,—দেখে নিও, হীরুর ক্ষমতা কত।

ন-মা। তুইও দেখে নিস্—এই বুড়ো বামুনের মেয়ে তোর শ্রাদ্ধ কেমন ক'রে করে।

হীরা। কে কাহার শ্রাদ্ধ করে, তা দেখিস্ বুড়ী।

ন-মা। তোর সাত পুরুষের শ্রাদ্ধ আমরাই ক'রেছি, তোর শ্রাদ্ধ আমরাই কর্‌ব। তুই আমার বাড়ী থেকে এখনি বের—নইলে ঝাটায় তোর মুখ ছিঁড়ে দেব।

হীরা। যাইতেছি,—কিন্তু মনে রাখিস্ বুড়ী—দিন রাত্রি কাঁদিয়াও এ কার্য্যের—এ কথার—এ গালাগালির প্রতিকার হবে না।

তখন ননির মাতা নিজ মস্তকের চুল ছিঁড়িয়া, চীৎকার করিয়া, নানাবিধ কথায় হীরালালকে অভিশপ্ত করিতে লাগিলেন। হীরালালও তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় কিয়ৎক্ষণ গালাগালি দিয়া তারপরে বাড়ী চলিয়া গেল।

তখন বধূ আসিয়া শ্বাশুড়ীকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে লইয়া গেল।

ননির মাতা বধূর যত্নে শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন বটে,—কিন্তু কি প্রকারে যে এই অপমানের প্রতিশোধ লইবেন, তাহার স্থির করিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন।

শ্বাশুড়ী নিদ্রিতা হইতেছেন না,—পিশাচের কথায় নিতান্ত অপমানিত ও মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাতে বধূ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল,—শ্বাশুড়ীকে বিবিধ প্রকারে প্রবোধ দিল। তারপরে বলিল,—"তোমার ছেলেকে পত্র লেখ, তিনি বাড়ী এসে যা হয় করুন।"

শ্বাশুড়ী বলিলেন,—"তাকে লিখে কি হবে। সে বিদেশে থাকে,—সেখান থেকে একথা শুনে কেবল ব্যথা পাবে বই ত নয়। সকাল হোক, আমি ওর বাপের কাছে যাব—পাড়ায় পাঁচ জনের কাছে যাব—ওর শ্রাদ্ধ কোর্‌ব, তবে ছাড়্‌ব।"

বধূ বলিল,—"তবে তাই করিয়ো, এখন ঘুমাও। মন খারাপ হয়েছে—রাত্রি জাগিলে অসুখ কোর্‌বে। রাত্রি বোধ হয় এখন বারটা।"

শ্বাশুড়ী। হাঁ, আমার একটু ঘুম আসছে—আমি ঘুমাই ; তুমিও ঘুমাও।

বধূ সন্তুষ্ট হইয়া নিজ শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল, এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

শ্বাশুড়ী বধূকে প্রতারণা করিয়াছিলেন, কেননা তাঁহার আদৌ নিদ্রা আসিতেছিল না। কিসে হীরালালের পতন হইবে, কিসে হীরালালকে এই অপমানের প্রতিশোধ দিতে পারিবেন, সেই চিন্তাতেই তাঁহার দেহ আগুণ হইয়া গিয়াছিল। তবে তাঁহার নিদ্রা আসিতেছে, একথা না বলিলে বধূ ঘুমায় না—তাই বলিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইলেন, নিজে কিন্তু হীরালালের দুর্ব্ব্যবহারের দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

হীরালালের মাতা।

মনির মাতা পরদিবস অতি প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। অন্য দিন প্রাতঃসন্ধ্যাদি প্রাতঃকালেই সমাপ্ত করিতেন, সে দিন আর তাহা করিলেন না। কারণ, তাঁহার প্রাণের মধ্যে তখন ক্রোধের ভীষণ বহ্নি জ্বলিতেছিল,—এ জ্বালা কথঞ্চিৎ উপশমিত না হইলে, ইষ্টচিন্তনে কখনই আনন্দ লাভ হইতে পারে না। অতএব তিনি স্থির করিয়া বসিলেন, আগে হীরালালের অপমানের প্রতিশোধ লইয়া আসিয়া, তৎপরে জপ-তপ যাহা কিছু করিতে হয় করিব। কিন্তু তখন বধূ উঠে নাই বলিয়া বাটী হইতে যাইতে পারিতেছিলেন না। একটু পরেই বধূ উঠিল।

শ্বাশুড়ী বলিলেন,—"মা, তুমি সদর দরোজা বন্ধ রাখিয়া ঘরের কায কর, আমি একবার পোড়ার-মুখোর বাবার কাছ থেকে আসি।"

বধূ শ্বাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। স্পষ্টতই বুঝিতে পারিল,—তাহার শ্বাশুড়ীর সারারাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এবং নরপিশাচের বাক্য-বাণে সে হৃদয় দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কাতরে বলিল,—"মা, অত উতলা কেন হইতেছ? কুকুরের কামড় হাঁটুর তলায়।"

শ্বাশুড়ী কষ্টোচ্চারিত কণ্ঠে কহিলেন,—"অসহ্য হ'য়েছে মা, বড় অসহ্য হ'য়েছে। ছোট মুখে বড় কথা! আমি বিদ্যানন্দ চক্রবর্ত্তীর বেটার বৌ—আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভাগ্যি বোসের পৌত্তুর কি না ঐ সকল কথা ব'লে গেল। যে বেটাদের একসময় গাঁয়ের লোকের সঙ্গে সমাজ-সামাজিকতা ছিল না। থাক্‌তো আ'জ তোমার শ্বশুর, তবে ওর বাবার নাম ভুলিয়ে দিত। যাক্,—আমি একবার দেখে নেব, বেটার বাবার কটা মাথা।"

আর তিনি অপেক্ষা করিলেন না। অবমানিতা ব্যাঘ্রীর ন্যায় লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। বধূ বিষণ্ণ মনে সদর দরোজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়া বাড়ীর মধ্যে সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্তা হইল।

তখন কেবল বালারুণ-কিরণে পল্লীর শ্যামল বৃক্ষশীর্ষ স্বর্ণ বর্ণ ধারণ করিয়াছিল,—কেবল কৃষকপল্লী হইতে কৃষকেরা বলদ ও লাঙ্গল লইয়া মাঠে গমন করিয়াছিল,—কেবল রাখালেরা গ্রাম্য পথে গাভী বৎস লইয়া গোষ্ঠ-যাত্রা করিতেছিল,—কেবল কৃষক-বধূকুল কুম্ভ-কক্ষে জল আনিতে শ্যামসুন্দরের দীঘিতে গমন করিতেছিল এবং ভদ্রমহিলারা স্নান করিয়া গৃহে ফিরিতেছিল, আর ভিখারিণীকুল "জয় রাধে" বলিয়া টুক্‌নী হস্তে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

হীরালালের মাতা কেবল স্নান করিয়া আসিয়া, রকে দাঁড়াইয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিতেছিল, এবং হীরালালের যুবতী স্ত্রী পার্শ্বের গৃহে নবপ্রসূত শিশুর মুখে স্তন্য দান করিতেছিল।

ম্লান মুখে উত্তেজিত ভাবে তত সকালে পুরোহিত ঠাকুরাণীকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, হীরালালের মাতার কেমন একটা সন্দেহ হইল। বলিল,—"আসুন, মা ঠাকরুণ আসুন; অনেক দিন পায়ের ধুলা প'ড়ে নাই। আমার খোকার কপাল প্রসন্ন,—সে সবে আ'জ আট দিন জন্মেছে, এর মধ্যে কুলপুরোহিত-ঠাকুরাণীকে ভক্তি-ডোরে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছে।"

ননির মাতা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। হীরালালের মাতার জ্ঞান হইল, সে নিশ্বাস যেন প্রলয়ের পূর্ব্বের ঝঞ্ঝাবায়ু। বড় ভাল জ্ঞান হইল না—কে জানে তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন কেমন একটা ভয়ের বিপুল উত্তেজনা জাগিয়া বসিতেছিল।

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুখখানা অত ভারি কেন মা? সব ভাল ত?"

ননির মাতা কর্কশ কণ্ঠে—উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—"যে দৈত্য তুমি গর্ভে ধ'রেছ মা, তার আর ভাল থাক্‌বো কি !"

তাড়াতাড়ি আর্দ্র বস্ত্রখানি রকের উপর ফেলিয়া দিয়া, একখানি কম্বলের ছোট আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া, হীরালালের মাতা বলিল,—"বসুন মা, সব শুন্‌ছি, আপনি কার কথা বোলছেন,—হীরুর কি ?"

ননির মা। বসিব না—হয় তোমরা এর প্রতিকার কোরবে, আর নয় আমি তোমার বাড়ী আত্মহত্যা কোরবো—তবে ছাড়বো। ওমা, আমি বিদ্যানন্দ চক্রবর্তীর বেটার বৌ—আমাকে কি না—

হীরালালের মাতা ছুটিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণীর চরণ দুইটী চাপিয়া ধরিল। হীরালালের মাতা—সদ্যঃস্নাতা—কেবল আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে—তখনও আর্দ্র কেশরাশি পৃষ্ঠে পড়িয়াছিল—সেগুলি ঘুরিয়া আসিয়া ননির-মাতার চরণ স্পর্শ করিল। বলিল—"মা, মা ;—হীরু অবোধ—আপনি তাহাকে শাপ দিবেন না। একটু ধানের অঙ্কুর বেরিয়েছে। আট দিনের শিশু—ব্রাহ্মণের—বিশেষতঃ কুলপুরোহিত-ঠাকুরাণীর শাপে সে গলিয়া যাবে। আপনি রক্ষা করুন।"

ন-মা। এমন লক্ষ্মী বউর পেটেও কি অমন দৈত্য জন্মে। সে যা' ব'লেছে—যা' ক'রেছে—আর যা' করবে ব'লেছে—তার প্রতীকার না করলে আমি গোবরের শিব পূজা করবো—মা কালীর কাছে ধন্না দেব—মাথা খুঁড়ে রক্ত বার কোরবো।

হী-মা। একটু অপেক্ষা করুন—আমি কর্ত্তাকে ডাকাই, তিনি এলে আপনি সব বলুন—নিশ্চয় প্রতিকার কোরবেন। আপনারা কুলপুরোহিত—আপনাদের সঙ্গে কি কোন রকম অন্যায় আচরণ শোভা পায়।

দাসীকে বলিল, "শীঘ্র কর্ত্তাকে ডেকে আন্।" দাসী তখনই চলিয়া গেল।

হীরুর মা ননির মাতার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসনে উপবেশন করাইল। ঝটিকা উঠিবার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন গম্ভীর ভাব ধারণ করে,—ননির মাতা তেমনই গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিলেন। হীরুর মাতা কি একটা কায সমাপ্ত করিয়া আসিবার জন্য গৃহান্তরে গমন করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পিতার গুণগ্রাহীতা।

হীরালালের পিতা সীতানাথ বসু গ্রাম্য তহশীলদার। তাঁহারই বাড়ীর অদূরে—গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে 'হাটখোলার' মধ্যে জমীদারের কাছারীবাড়ী। কাছারীতে তিন খানি ছোট বড় খড়ের ঘর—একখানিতে তহশীলদার মুহুরী ও পাইক পেযাদা লইয়া প্রজাগণের নিকটে খাজনা আদায় করেন,—সুতরাং সেই গৃহটীই 'খাস কাছারী'। দ্বিতীয়খানি অপেক্ষাকৃত একটু উত্তমরূপে নির্ম্মিত—দরোজা জানেলাদ্বারা সুরক্ষিত। তাহাকে 'মালঘর' বলা হয়। ঘরেব মধ্যে একটা লৌহসিন্ধুক ও দুইটা কাঠের আলমারিরা আছে। এই গৃহে আদায়ী টাকা ও কাগজ পত্র থাকে। এবং জমীদার মহাশয়েরা বা তাঁহাদের সদর কর্ম্মচারিগণ যখন কাছারী পরিদর্শনে আসেন, তখন সেই গৃহে অবস্থান করেন। তৃতীয গৃহখানি ক্ষুদ্র এবং বাঁশের বেড়া ও দরমার দুয়ারে সজ্জিত তাহা রন্ধন-গৃহ। বিদেশী তহশীলদার থাকিলে বা জমীদার কিম্বা সদর-কর্ম্মচারী আসিলে তথায় রন্ধনাদি কার্য্য সুনিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

সীতানাথ প্রত্যুষে উঠিয়া কাছারীতে গমন করিতেন। হীরালাল বেলা আটটার সময় শয্যাত্যাগ করিতেন, তারপরে প্রাতঃকৃত্য সমাধা, চা' পান ও প্রাতভ্রর্মণ করিয়া কাছারীতে গমন পূর্ব্বক পিতার কার্য্যে সহযোগিতা করিতেন।

ননির মাতা বাহিরে কম্বলাসনে গম্ভীর-ম্লান অথচ ক্রোধ-কালিমা মাখা মুখে বসিয়াছিলেন; পার্শ্বের গৃহ হইতে হীরালালের মাতা তাহা দেখিতেছিল, এবং এক একবার তাহার মনে হইতেছিল, ঠাকুরাণীকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে, হীরু তাঁহাদের কি অনিষ্ট করিয়াছে। কেন এই প্রভাতকালে অভিশাপের আগুণে তাহার অনিষ্ট করিতে আগমন করিয়াছেন? ব্রাহ্মণের মেয়ে—বিশেষতঃ কুলপুরোহিতের স্ত্রী—তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে পড়িলে কি হীরুর বা তাহার ঐ নবজাত শিশুটীর মঙ্গল হইতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না—বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল। বিবর মধ্যে সাপিনীর গর্জ্জন শুনিয়া রিক্ত-হস্তা কুলমহিলা যেমন দূর হইতে চাহিয়া দেখে—নিকটে আসিতে সাহস করে না, হীরালালের মাতাও তেমনি দূরে থাকিয়া দর্শন করিতেছিল,

অগ্রবর্ত্তিনী হইতে পারিতেছিল না। ভয়—হীরু কি করিয়াছে—জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি হীরুর অপরাধ বর্ণনা করিতে গিয়া পাছে অভিশাপ দিয়া ফেলেন। দোহন-করা দুগ্ধ গাভীস্তনে ফিরিয়া গেলেও যাইতে পারে—বৃন্ত-বিচ্যুত কুসুম বৃন্তে পুনর্যোজিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণের মেয়ের অভিশাপের আগুণ একবার জ্বলিয়া উঠিলে আর নিবিবে না। দশরথ ত 'কুলদগ্ধ হ'তে পারে ব্রহ্মাগ্নির' ভয়ে বিশ্বামিত্রের করে রামলক্ষ্মণকে দান করিয়াছিলেন। কাযেই স্বামী না আসা পর্য্যন্ত সে কার্য্যব্যপদেশে আসিতে পারিতেছে না, এই ভাণে গৃহের বাহির হইতেছিল না।

তবে সে অবস্থায় অধিকক্ষণ তাঁহাকে থাকিতে হইল না, দাসীর নিকটে সংবাদ পাইয়া সীতানাথ বাটী আসিলেন।

রকের উপর পুরোহিতঠাকুরাণী উপবিষ্টা দেখিয়া নিম্ন হইতেই প্রাণায়াম করিলেন। পুরোহিতঠাকুরাণী সবিশেষ কোনরূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন না—গলা ঝাড়িলেন মাত্র। সীতানাথ উঠিয়া উপরে আসিলেন। স্বামী-সন্দর্শনে অনেকটা আশ্বস্তা হইয়া হীরালালের মাতা দ্রুতপদে তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন আরও দুই একটী স্ত্রীলোক সেখানে আসিল। পার্শ্বের বাড়ীর দীনু দত্তের বিধবা বর্ষীয়সী ভগিনী সারদা, একটী শিশু ভ্রাতষ্পুত্র ক্রোড়ে করিয়া কি কার্য্যব্যপদেশে সে বাড়ীতে আসিয়াছিল, সেও অদূরে দাঁড়াইল।

সীতানাথ একটু হাসিয়া নম্রস্বরে বলিলেন,—"সকালে বৌ ঠাকুরুণের চরণ ধূলিতে অধমের বাড়ী পবিত্র হইয়াছে—আজ সুপ্রভাত।"

উত্তেজিত অথচ অভিমানের সুরে ননির মাতা বলিলেন—"সে দিন কি আর আছে সীতানাথ? এখন তোমরা বড় লোক। তুমি গাঁয়ের তহশীলদার—তোমার ছেলে যা' ব'লে এসেছে—তা' তুমি শুনেছ কি না—জানি না। জানাতে এসেছি—হয় প্রতিকার কোরবে, নয় আমি দেবতার কাছে ধন্না দেব—সমাজের সকলের কাছে বলে দেখ্‌বো—তোমার পুরুত বন্ধ ক'র্‌ব।"

গৃহিণী ভীত চকিত নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন। আরও কিঞ্চিৎ নম্রস্বরে সীতানাথ বলিলেন,—"হীরুর কথা ব'লছেন?"

ন-মা। হাঁ সেই পিশাচের কথাই বল্‌চি। তার পাপে তোমার বংশ ছারখার হবে।

গৃহিণী চমকিয়া উঠিলেন। পার্শ্ব দণ্ডায়মানা বামা পিসি বলিলেন—"ওমা, সে কি গো! হীরুর মত ছেলে দশ খানা গ্রামে মিলা ভার।"

বামাপিসী সংপ্রতি কযেক খণ্ড পূতিকাদণ্ডের প্রত্যাশায় সে বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছিল।

সীতা। হীরু আপনার কি অনিষ্ট করিয়াছে?

তখন অনলবর্ষী স্বরে খাজনা আদায়ের ভার গ্রহণ হইতে গত কল্যকার শ্যামা-সংবাদ ও নৈশ-সম্ভাষণ পর্য্যন্ত সকল কথা বিস্তৃত ভাবে এবং সঠিকরূপে ননির মাতা বর্ণনা করিলেন।

শুনিয়া বামাপিসী দ্বিগুণ পূতিকাদণ্ড প্রাপ্তির আশায় আশান্বিত হইয়া সে কথার ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। সারদা কোলের নগ্ন শিশুটী মাটিতে নামাইয়া দিয়া বলিল—"এও কি সম্ভব!"

সীতানাথও বলিলেন,—"অসম্ভব! হীরু আমার সে প্রকৃতির লোকই নয়। তাহার অনেক গুণ বৌঠাকরুণ;—দয়া, ধর্ম্ম, পরোপকার—আমাদের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। কোথায় কোন্ দেশে দুর্ভিক্ষ, সেখানে চাঁদা পাঠায়, কোথায় জলে ডুবিয়া মানুষ মরিতেছে, সেখানে চাঁদা পাঠায়, সভা-সমিতিতে টাকা পাঠায়। কত ভাল ভাল কেতাব পড়ে। হীরু আমার"—

ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া ননির মাতা বলিলেন,—"তবে কি আমি আমার কুৎসার কথা তোমার নিকটে মিথ্যা করিয়া বলিতে আসিলাম?"

সারদা ব্রীড়াবনত বদনে বলিল—"তা কি সম্ভব! একটা কিছু ঘটনা এর মধ্যে আছেই।"

সীতা। ভাল, আমি হীরুকে ডাকাইতেছি।

পার্শ্বে সীতানাথের মধ্যমা কন্যা তরঙ্গিণী দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল—"দাদাকে ডাকব?"

সীতানাথ বলিলেন—"ডাক্‌ত।"

তরঙ্গিণী দৌড়িয়া গেল। পার্শ্বের ঘরে বসিয়া হীরালালের স্ত্রী সমস্ত শ্রবণ করিল; পাছে স্বামীর এই মহাপাতকের অভিসম্পাত আসিয়া তাহার নব প্রসূত খোকার মস্তকে পতিত হয়, এই জন্য সে খোকাকে টানিয়া কোলে তুলিল এবং মাতৃ-অঞ্চলের অক্ষয় কবচের মধ্যে তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

ভক্তির কথা।

বেদ পাঠে বা গ্রন্থার্থ ধারণা দ্বারা বা বহু শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। মহাত্মা রামকৃষ্ণ দেব বলিতেন "শাস্ত্র পড়ে ধর্ম্ম শেখা, ম্যাপে যেন কাশী দেখা" তাঁহাকে পাইবার জন্য যে বড়ই কাতর হয়, তিনি তাহাকে বরণ করেন। তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, কেন না তিনি ভক্তবৎসল। তুমি নীচ হও বা উচ্চ হও, শূদ্র হও বা ব্রাহ্মণ হও, তাঁহার ভেদ-দৃষ্টি নাই। তাঁকে ডাকলেই তিনি আসেন। তাঁর ছোট বড় বিচার নাই। "অতেব ব্রাহ্মণ কিম্বা চণ্ডাল দুরাচার, কৃষ্ণের সরকারে নাই জাতির বিচার" ভগবান ভক্তময়, ভক্তই তাঁর সর্ব্বস্ব। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন "ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। নচ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্" ॥ হে উদ্ধব! তুমি যেরূপ আমার প্রিয়তম, আত্ম-যোনি ব্রহ্মা, মহাদেব, প্রিয়তমা লক্ষ্মী এবং মদীয় নিজ আত্মাও সেরূপ প্রিয় নহে। তিনিই সত্য নিত্য, দেহাদি অনিত্য, এই স্থির বিশ্বাস রাখিয়া, যে তাঁহার কৃপাপাত্র হইতে চায়, কৃপাপাত্র হইবার জন্য তাঁহার আজ্ঞাগত কার্য্য করে, স্বতঃই তাহার জ্ঞান সমুদ্ভূত হয়। কৃপাপাত্র হইবার জন্য আজ্ঞা-ধীনে কর্ম্ম করাই নিষ্কাম কর্ম্ম। নিষ্কাম কর্ম্মই ভক্তিযোগ।

ভক্তিযোগে জ্ঞান সমুদ্ভূত হইলে সাধক প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন,— তিনি প্রভু আমি দাস। যখন এই ভাব হৃদয়ে রাখিয়া কেহ তাহাতে চিত্ত ধারণা করে তাঁহার উপাসনা করে, তখনই ভক্তির কার্য্য করা হয়। চিত্ত! বিচার করিয়া দেখ, নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে হইলে পূর্ব্বে সাধারণ জ্ঞানরূপ দৃঢ় বিশ্বাস চাই। পরে বিশ্বাস হইতে স্বরূপ জ্ঞান দৃঢ় হইয়া জ্ঞানের পরিপাক হইলেই তাহার সহিত একটা সম্বন্ধ নিশ্চয় হইয়া যায়। তখন ক্রমে বৈরাগ্য, বিবেক, শ্রদ্ধা, স্মরণ, মনন, ধ্যান, লালসা ইত্যাদি শক্তির বিকাশ হয়, ইহাই প্রবুদ্ধ হওয়া। তবেই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। চিত্ত! কাতর হইয়া তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি উদয় হন। মাহাত্মা রাম-প্রসাদ বলিয়াছেন "ডাক্ দেখি মন ডাকার মতন, কেমন কালী থাক্‌তে পারে"।

কিন্তু দেখো চিত্ত! কোন মতলব করিয়া হরিনাম করিও না। অর্থাৎ অন্য কিছু করিতেছ, কিন্তু হরিনাম করিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিতেছ; এরূপ করিও না।

এ জগতে অনেক প্রকার সাধক আছেন। এক প্রকার লোক আছে, যাহারা এই প্রকৃতির অধীন যে তাহারা আপনাদিগকে ভাল করিবার জন্য পশু পক্ষীর মত কোন চেষ্টা করেন না, ইহারা বড়ই অধম।

দ্বিতীয় প্রকারের লোক, চুরি হইয়া গেলে যাহাতে আর চুরি না হয়, তজ্জন্য সাবধান হয়, ইহারা সাধক মনের প্রত্যাহার করে ঠেকে শিক্ষা লাভ করে। ইহারা নীতি-জগৎ পর্য্যন্ত উঠিতে চেষ্টা করে। আর এক প্রকার ব্যক্তি আছে,—যাহারা অন্য লোকের চুরি হইয়াছে শুনিলেই সব বুঝিতে পারে এবং পূর্ব্ব হইতেই সদা সর্ব্বদা জাগিয়া থাকে, সর্ব্বদা চিত্তকে পূজা, ধ্যান, জপ, সমাধি অভ্যাসে এত নিযুক্ত রাখিয়া দেয় যে, তাহাদের চিত্ত আর প্রকৃতির হাতে পড়িয়া রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হয় না। তাহারা সর্ব্বক্ষণেই তাঁহার সেবা, তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা, তাঁহার সাজ-সজ্জা, তাঁহার স্থান তাঁহার জন্য আয়োজন এই সব লইয়া মনকে পূর্ণ আনন্দে এবং উৎসাহে পূর্ণ করিয়া রাখে, চিত্তের অন্য দিকে যাইবার বিষয় ভোগ করিবার যো থাকে না, ইহারাই ধার্ম্মিক।

চিত্ত! যাহাতে ধর্ম্ম জীবন লাভ করিতে পার, যাহাতে রাগদ্বেষ আর তোমায় উৎপীড়ন না করিতে পারে সেই অভ্যাস কর। "বলত বলত বলি যাই, হরতে লাগাবহ ভাই" ঠিক হইয়া যাইবে; সর্ব্বদা লাগিয়া থাক। সর্ব্বদা ডাক। তুমি নীচ হও বা দুরাচার হও, ক্ষতি নাই অভ্যাস আয়ত্ত কর।

"করত করত অভ্যাস জড়মতি হ্যায় সুজান, রসতি আরৎ যাৎসে শিলপর পড়ত নিশান" স্মরণ ভিন্ন তোমার কোন কর্ম্ম নাই—স্মরণ কর কিন্তু মনে ভুলে মুখে ডেক না। তুমি নিয়ম রক্ষার জন্য সকাল সন্ধ্যে উপাসনা করিতে বস, খুব জাঁক জমকে পূজার সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে শিব পূজা করিতে করিতে বল, ভাই মেয়েটা অনেক দিন গিয়াছে, তার খবর পাই নাই, নমঃ শিবায় নমঃ। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপিতে জপিতে ভাব, তাই ত তাড়াতাড়ি চলিয়া এলাম, বৌমাকে ছুটী ডাল ভিজাইতে বলিলাম না, গিন্নি কি ছাই রাঁধিব? চিত্ত! একে স্মরণ বলে না।

যোগিবর কবির বলিয়াছেন—

"মালাতো করমে ফিরে, জিহ্বা ফিরে মুখ্ মাহি,
মনুয়া তো চৌদিশ্ ফিরে, ইয়োতো সমীরন নাহি।"

কেমন করিয়া স্মরণ করিতে হইবে, তিনি বলিয়াছেন—

আঁখড়িয়া ঝাঁইপড়ি, পন্থ নিহারি নিহারি।
জিওড়ি আঁছালা পড়ে, রাম পুকারি পুকারি॥
নয়নগুণে ঝাড়ি লইয়া, রংহট্ বহে নিশি যাম,
পাপিয়া যেঁও পিয়া পিযা করে, কব্‌রে মিলেঙ্গো রাম।

এমনি করিয়া ডাক নিশ্চয়ই সে আসিবে। সে তোমায় কতই ভালবাসে। সে তোমায় একক্ষণও ছাড়িয়া থাকে না, কিন্তু তুমি তারে চাও না, তুমি তারে ভুলিয়া কত যত্নে খুটি নাটি কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাক। তাই সে অভিমান করিয়া তোমায় দেখা দেয় না, হায় মূর্খ চিত্ত। তুমি এ জগতের ছুটো মিষ্ট রুষ্ট কথা শুনিয়া ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইও না। তার মতন আদর করিতে কেহ জানে না, তার মতন ভাল বাসিতে কেহ তোমায় পারে না। তুমি ঘুমাও, সে সারারাত নীরবে বসিয়া বসিয়া তোমায় বীজন করে, তবুও তোমার মোহ ভাঙ্গে না। সে কত ব্যথা পায়, তুমি ত বুঝ না। সে কিছুই চাহে না, ধন, রত্ন, রূপ, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি কিছুই চাহে না। চায় সে সমগ্র প্রাণ—শুধু প্রাণের ভিখারী। ঐ শুন সে কত আদর করিয়া তোমায় বলিতেছে, তুমি অন্য কিছু ভাবিও না, তোমার সুখ, দুঃখ, ভয়, ভাবনা যাহা কিছু আছে, আমায় দাও, আমায় দিয়া তুমি—নিশ্চিন্ত হও। তোমার যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, আমি ভারবাহী ভারীর ন্যায় বহন করিয়া আনিয়া দিব। তোমায় কিছুই বলিতে হইবে না। তুমি শুধু অনন্য চিত্তে আমায় স্মরণ কর।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

বল চিত্ত! এত ভালবাসা তুমি কোথায় পাইয়াছ? চিত্ত! কাতর হইয়া তাহাকে ডাকিলেই সে উদয় হয়। কিন্তু কাতরতা অজ্ঞানীর হয় না এবং মুক্তেরও হয় না। অজ্ঞানীর মত প্রাণকে কাতরতা অবজ্ঞা করিতে শিখাইও না। অজ্ঞানী হইয়াও যে বলে, আমার ভয় নাই। যে মিথ্যা কথা কয় সে মূঢ়। চিত্ত! তুমি মূঢ় হইও না। নিজের অবস্থা দেখ কাতরতা আপনিই আসিবে, নিজের বিপদ বুঝিতে চেষ্টা কর। নিজের বিপদ বুঝিলেই

তখন আপনা হইতেই বলিতে হইবে, "ন গতি র্বিদ্যতে নাথ ত্বমেব শরণং প্রভো।"

তখন বলিবে "ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরুঃ পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ। কুসংসারপাশপ্রবদ্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।"

মৃত্যু সংসার-সাগর নাই বলিলেই সব হইল না। সকলে মরে আমিও মরিব, সকলে দুঃখ পায়, আমিও পাই, যখন সময় হইবে তখন ভাল হইবে। এ সব মূর্খের কথা।—এ সব লোক বড়ই মূঢ়। তার কৃপায় কি না হয়? নিজের পুরুষার্থ লইয়া মৃত্যু-সংসার পার হইতে চেষ্টা কর, পূর্ণমাত্রায় পুরুষার্থ প্রয়োগ কর, যখন দেখিবে তাহাতেও হয় না; তখন তুমি কাতর হইবে, তোমার অভিমান চূর্ণ হইবে, তখনকার কথা—

"সাধব হাস পরিণাম নিরাশা
তুঁহু জগতারণ দীন দয়াময়
অতএ তোঁহারি বিশোয়াসা"

তখন তুমি তাঁর কৃপাপাত্র। তিনিই পুরুষার্থ রূপে তোমার মধ্যে উদয় হইবেন, বিশ্বাস রাখ আত্মাই সুখ আত্মাই জ্ঞান। স্থায়ী আর কিছুই নাই, জ্ঞানের বিষয়ও আর কিছুই নাই। দেহ আত্মা নহে, আত্মা সচ্চিদানন্দ গুরু-মুখে শ্রবণ কর। শুনিতে শুনিতে ঐ কথাই শাস্ত্রে দেখিতে দেখিতে বিশ্বাস দৃঢ় হইল। তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয়। একেবারে চিত্ত তাহাতে না রাখিতে পার, তাহার প্রীতির জন্য কর্ম্ম কর। নিষ্কাম কর্ম্ম—অনুষ্ঠান করিতে করিতে দেখিবে, যখন বেশ করিয়া উহা অভ্যাস করিতে পারিবে, তখন বিষয় আসিলেও কোন কর্ম্ম হইবে না। মনে মনেও ভগবানের জন্য কর্ম্ম হইবে। ইহাই অভ্যাসের ধর্ম্ম। সকল সময়ে সকল কর্ম্মে ভগবানের পূজা করিতেছি, ইহা দৃঢ়াভ্যস্ত হইলে চিত্ত রাগদ্বেষাদি শূন্য হইবে। বিষয় সম্পর্ক থাকিলেই না রাগদ্বেষ। যদি দেখ মন, বিষয় অভ্যাস ছাড়িতে পারিতেছে না। তখন শমদমাদি অভ্যাস করিবে, তবেই সর্ব্ব কর্ম্ম ন্যাস হইবে। আমি দাস তুমি প্রভু, এই ভাব পরিপুষ্ট হইলে ক্রমে অপরোক্ষ জ্ঞানে আসিতে পারিবে। তাঁর কর্ম্ম করিতে যখন বড়ই আনন্দ বোধ হয়, তখন অন্য কর্ম্ম হয় না। মনে হয় তুমি আমার দেহকে উৎসাহে পূর্ণ করিয়া চালাইয়া লইতেছ। তুমিই করিতেছ, আমি কিছুই নই; তখন আমি ভুলিয়া তোমা-কেই আমি করিয়া ফেলিবে। তোমা ভিন্ন আমার পৃথক্ সত্তা নাই, এই

ভাব দাঁড়াইবে। যে তুমি বিনা প্রয়োজনে কার্য্য কর, সেই তুমি লোক-শিক্ষার্থ আমাকে তুমি করিয়া কার্য্য করাইয়া লইতেছ, তখন আমি তুমি ভেদ থাকে না। যে তুমি নিত্য সত্য আনন্দস্বরূপ বিরাজ করিতেছ, তুমিই তখন থাকিবে, আমি তুমি হইয়া যাইবে, তুমি আমি ভেদ থাকিবে না, ইহাই অপরোক্ষ জ্ঞান—ইহাই অবিদ্যা নিবৃত্তি, ইহাই পরমানন্দ-প্রাপ্তি বা মোক্ষ।

জনৈকা বঙ্গমহিলা।

সমুদ্র-দর্শনে।

কি ভীষণ কোলাহল শোনা যায় দূরে,
পার্থ কি করিয়া জয়
অমর অসুর-চয়
লভিয়া বিজয় নাম আসিয়াছে ফিরে?
অথবা সুভদ্রা-সুতে,
ঘিরিয়া কি সপ্তরথে
করিছে ভৈরব নাদে ভীষণ সংগ্রাম?
তার কি এ কোলাহল হয় অবিরাম?
(এ, যে) শুধু হেরি নীল জল কোলাহলময়,
গরজি গরজি রোষে
আকাশে রয়েছে মিশে
ছুটে আসে শ্বেত শুভ্র ফেন শিশুচয়,
একিগো কল্লোলময় সাগর দুর্জ্জয়?
অবিশ্রান্ত কোলাহল উদ্দাম উচ্ছ্বাস
(এ, যে) সীমাশূন্য রেখাশূন্য সিন্ধুজলোচ্ছ্বাস।

শ্রীমতী রেণুকণা দত্ত।

শিক্ষক ও শিক্ষা।

মানুষ যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখনই সে সর্ব্ববিদ্যায় পারগ হইয়া উঠে না। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল অবশ্যই থাকিবে। তবে তাহা মায়ার আবরণে আবৃত থাকে মাত্র।

মানুষ যতই বড় হইতে থাকে, যতই জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই মায়ার আবরণ কাটিয়া যায়। তারপর যখন জ্ঞানের শেষ সীমায় উপনীত হয়, তখন হিন্দুমতে মুক্তি এবং বৌদ্ধমতে নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে।

মনুষ্যের উন্নতি অবনতি—স্বর্গ নরক—বন্ধ মুক্তি প্রভৃতি শিক্ষার উপর সর্ব্বতোভাবে ন্যস্ত।

জ্ঞান অতিবিশুদ্ধ অতিপবিত্র—'নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্র মিহবিদ্যতে'। আমরা দেখিয়া শুনিয়া স্পর্শাদি করিয়া, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পঞ্চ প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি।

জগতে আপনা হইতে কিছু হয় না, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অসম্ভব। জ্ঞানও সেইরূপ অজ্ঞানতা হইতে আসিতে পারে না। আমার ঐ কথাটী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানী শিক্ষকের নিকট হইতেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। যাহারা অজ্ঞানী, তাহারা জ্ঞান দিতে অসমর্থ।

আজকাল বাজারে সংবাদ পত্রের ছড়াছড়ি। অনেকেই নামের প্রত্যাশায় শিক্ষকতার ভাণ করিয়া লম্বা লম্বা প্রবন্ধ লিখেন। লিখেন ত মাথামুণ্ড;—সকলেই ফেঁউ ফেঁউ করিতেছেন, তিনিও গোলে হরিবোল দেন। যত কৃত্রিমতা সমস্তই প্রবঞ্চনা অর্থাৎ যাহা কিছু কৃত্রিম তাহাই মিথ্যা—অসত্য এবং যাহা কিছু অকৃত্রিম, তাহাই সত্য।

যাহা হউক, আমাদের আলোচনার বিষয় শিক্ষক-নির্ব্বাচন। আমরা দেখাইয়াছি যে, মানুষের ভবিষ্যৎ তাহার শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে।

এ ক্ষেত্রে সুশিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা যে কতদূর, তাহা সকলেই অনুভব করিতেছেন। এ শিক্ষক মানে কেবল বিদ্যালয়ের পড়াধরা শিক্ষক নয়। এ শিক্ষকের প্রয়োজন সকলের, আমি তোমার নিকট শিখিব; কি শিখিব? না যাহা তোমার গুণ বা দোষ।

এইখানেই একটী কথা। মনে করিয়া রাখা দরকার। মানুষ ইচ্ছা করিয়া দোষ করে না বা অন্ততঃ সে দোষ করিতে ইচ্ছা করে না। যাহারা পাপ

করে—তাহারা কার্য্য গতিকে করিয়া ফেলে মাত্র। ইহার ব্যতিক্রমও যে হয় না, এমন নহে। শিক্ষককে সর্ব্বতোভাবে অনুকরণই শিক্ষা।

শিক্ষককে অনুকরণ করিলে তাঁহার গুণসমূহ যেমন আমাতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ দোষসমূহও আমাতে অলক্ষিত ভাবে আসিয়া পড়ে। আমরা ইহার বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারি না অথবা বুঝিয়াও বুঝি না, কিম্বা বুঝিয়াও এড়াইতে পারি না। কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন জোর করিয়া তাহাদিগকে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়।

সংসারে অন্তঃসার-বিহীন বাচাল পণ্ডিতের অভাব নাই। রামকৃষ্ণ তাই বলিতেন "গুরু মিলে লাখ শিষ্য নাহি মিলে এক।"

কথাটা ঠিক। সকলেই বলে পাপ করিও না। কিন্তু পালন করে কচিৎ দুই এক জন।

এরূপ শিক্ষকের প্রয়োজন, যিনি নিজে নিজ উপদেশ সমূহ পালন করেন।

শ্রীজানকীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সাধনা।

বহুকাল একাসনে একস্থানে বসি
কঠোর তপস্যারত আছে যোগিবর ;
একমনে একভাবে সারা দিবা-নিশি
মধুময় রাম নাম জপে নিরন্তর।
কত জল, কত ঝড় প্রলয়-হুঙ্কারে
মথিত করিয়া গেছে শীর্ণ দেহখানি,
তবু কভু কোন এক মুহূর্ত্তের তরে
কঠোর সাধনা ছাড়ি ওঠে নাই মুনি।
কত দীর্ঘ বর্ষ গেছে, তবু একাসনে
সমভাবে বসি যোগী জপিতেছে নাম ;
বাহ্য-জগতের শব্দ নাহি পশে কাণে,
নাহি মনে মুক্তি ভিন্ন অন্য কোন কাম।
বল্মিক করেছে গ্রাস সারা অঙ্গখানি,
তবু মুখে উচ্চারিত রাম রাম ধ্বনি।

শ্রীললিতকুমার সিংহ।

১১শ ভাগ। (Registered No C 344.) অগ্রহায়ণ, ১৩২১।

অবসর

মাসিক পত্র



শ্রীলালবিহারী দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা, ৯২নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর প্রেস" হইতে

শ্রীপঞ্চানন মিত্র দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷০ সিকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵১০ আনা।

সূচী।

মহাযুদ্ধের ইতিবৃত্ত।



সীতা লক্ষ্মণ

সীতাবনবাস।

ENGRAVED & PRINTED BY
THE ACME PRINTING & PROCESS WORKS.
115, Amherst St., Calcutta.

নুরজাহান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৭)

গিয়াস্-পত্নী বলিলেন, তা আর কি করা যাইবে। ইহাই যে আমাদে দেশের রীতি! স্বয়ম্বর-প্রথার অনুসরণকারী হিন্দুরাও অবশেষে এই প্রথা অনুবর্ত্তন করিয়াছেন, সম্রাজ্ঞী বোধ হয় তাহা জানেন।

যোধবাঈ। আমার বোধ হয়, স্বয়ম্বরপ্রথাই খুব ভাল ছিল; কার কন্যাগণ আপন আপন পছন্দ মত বরের গলে মাল্য দান করিয়া চির-জীব সুখে অতিবাহিত করিতে পারিত।

গিয়াস্-পত্নী। আমিও আমার স্বামীকে ঠিক্ এই কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, যুবতী বালিকা কখনও কোনও পাত্রের দোষ-গুণ বিচার করিতে পারে না। সে কেবল আপনার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের নির্দ্দেশ-মত স্বামী পছন্দ করে।

যোধবাঈ। তাঁহার ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মানুষের মস্তিষ্ক অপেক্ষা তাহার অন্তঃকরণই অধিকতর বিচারক্ষম। পুরুষে কেমন করিয়া স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ বুঝিবে?

গিয়াস্-পত্নী। কিন্তু কি করা যায়, পুরাতন প্রথা, কাজেই কোনরূপে ইহা ত্যাগ করা যায় না।

যোধবাঈ। আমার বিবাহ-সময়ে কিন্তু এই পুরাতন-প্রথার সমূলে উচ্ছেদ সাধন হয়। ভালবাসা সমস্ত প্রথাকে পরাজিত করিয়া থাকে।

এমন সময়ে আকবরের ইউরোপীয়ান্ পত্নী মেরী বলিলেন, আহা! যদি আমাদের দেশের মত তোমাদের দেশের মেয়েরা আপন আপন স্বামী পছন্দ করিতে পারিত এবং স্বাধীনভাবে মুক্ত আকাশতলে বেড়াইয়া বেড়াইতে পারিত, তবে কেমন সুন্দর হইত!

যোধবাঈ। আহা! মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ করা কেমন মনোরম আমরা ত এ সংসারে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী!

গিয়াস-পত্নী। আমার স্বামী বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে পর-পুরুষে সহিত দেখা সাক্ষাৎ করা বা কথাবার্ত্তা বলা কর্ত্তব্য নহে।

এইভাবে যোধবাঈ, মেরী ও গিয়াস-পত্নীতে স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথার দোষ-গুণাদি কীর্ত্তন-মূলক অনেক কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এদিকে সেলিম-গত-প্রাণা মেহের অন্যের সহিত আপন পরিণয়ের আভাস শুনিয়া ছিন্ন-মূল ব্রততির ন্যায় প্রায় ভূম্যবলুণ্ঠিতা হইতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যে আনন খানি শারদ কৌমুদীর ন্যায় হাস্যময়ী ছিল, অকস্মাৎ তাহা ম্লান হইল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে সাশ্রু নয়নে অতি কষ্টে দণ্ডায়মানের পর মেহের প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিলেন। তিনি জানিতেন না যে, সেই প্রকোষ্ঠে তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব সেলিম অবস্থান করিতেছিলেন।

মেহেরকে প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবিষ্টা দেখিয়া সেলিম নতজানু হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। মেহের তদ্দর্শনে বিস্মিতা, চমৎকৃতা এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইলেন। অনেকক্ষণ উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, কিন্তু কাহারও মুখ হইতে বাক্যনিঃসরণ হইল না।

অবশেষে রুদ্ধকণ্ঠে সেলিম বলিলেন, সুন্দরি আমার প্রার্থনা—করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, আমায় ক্ষমা কর।

মেহের। যুবরাজ কি আজ অন্যত্র বিশ্রামের স্থান পান নাই?

সেলিম। সত্য বলিয়াছ, তোমাকে দেখিয়া অবধি আমি কোথাও বিশ্রামের স্থান পাই না। আমার পা দু'খানি কেবল তোমারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চাহে—নয়ন কেবল তোমার ঐ চন্দ্রসদৃশ মুখখানি দেখিতে চাহে—কর্ণ কেবল তোমারই অমৃত নিস্যন্দিনী বাক্যাবলি শুনিতে চাহে, আর—আর কি বলিব সুন্দরি, আমার হৃদয় কেবল তোমাতেই ডুবিয়া থাকিতে চাহে!

মেহের একটু ক্রোধান্বিত ভাবে বলিলেন, আপনি কেন আমায় সর্ব্বদা অন্বেষণ করেন? আমাকে এখন একটু নির্জ্জনে বিশ্রাম করিতে দিন।

সেলিম। সুন্দরি! তুমি আমার কষ্ট জানিয়া শুনিয়াও কেন আমাকে প্রতিনিয়ত জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ করিতেছ। সম্ভবতঃ তুমি মানুষের মনের বেদনা অনুভব করিতে পার না।

মেহের। যুবরাজ! আপনি বলিতেছেন—আমি বেদনা অনুভব করিতে জানি না! কিন্তু আপনার সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আজ আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—হৃদয় আমার অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে। যুবরাজ! যুবরাজ! আপনার পায়ে ধরি, আপনি এ হতভাগিনীকে বিস্মৃতির

অতল-তলে বিসর্জ্জন দিয়া শান্তি-সুখ উপভোগ করুন। কেন আমাকে চাটু-বাক্যে প্রতারিত করিতেছেন?

সেলিম। সুন্দরি! তুমি আমার হৃদয়ে যে আঘাত করিয়াছ, এখন তাহা হইতে অবিশ্রান্ত শোণিত-ধারা নির্গত হইতেছে। তত্রাপি তুমি বলিতেছ, আমি তোমাকে চাটুবাক্যে প্রতারিত করিতেছি!

মেহের। আপনি সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও কেন এরূপ করিতেছেন? সম্রাজ্ঞী ও আমার মাতা—এতদুভয়ে যে কথোপকথন হইয়াছে, তাহা আপনি নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন; অতএব আমাকে এখন নির্জ্জনে বসিয়া বিশ্রাম করিতে দিন।

সেলিম। সুন্দরি! তোমার মাতা ও সম্রাজ্ঞীতে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, আমি তাহা সমস্তই শুনিয়াছি; শুনিয়া মর্ম্মান্তিক বেদনাও পাইয়াছি। কিন্তু সুন্দরি! একবার তুমি প্রাণ খুলিয়া বল আমাকে ভালবাস, আমি তখন সমস্ত প্রতিবন্ধক দূর করিব।

মেহের। সে কথা ত আপনাকে আমি প্রথম সাক্ষাতের দিনেই বলিয়াছি। স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় চঞ্চলমতি নহে। স্ত্রীলোক যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে চির-জীবনের জন্য ভালবাসে। কিন্তু নিষ্ঠুর পুরুষে তাহা করে না। পুরুষ, স্ত্রীলোককে আপন ইন্দ্রিয়লালসার সামগ্রী মনে করে এবং লালসা চরিতার্থ হইলে তাহাকে তৃণ-খণ্ডের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করে।

সেলিম সহর্ষে মেহেরের গণ্ডে একটী মৃদু চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন;—আমি তোমার পিতার নিকট এই সম্বন্ধ ভঙ্গ করিতে প্রস্তাব উত্থাপন করিব। যদি তিনি ইহাতে সম্মত না হন, তবে আমি আমার পিতাকে অনুরোধ করিব।

মেহের। আমিও আমার মাতা-পিতার নিকট এ সম্বন্ধে বলিব। আমার বিশ্বাস, তাঁহারা কখনই আমাকে চিরদুঃখ-সাগরে ভাসাইবেন না।

সেলিম। আমার বিশ্বাস,—তোমার পিতা কখনই অন্যের সহিত তোমার বিবাহ দিয়া আমার অসন্তোষভাগী হইবেন না।

মেহের। কিন্তু তিনি যেন কেমন এক অদ্ভুত ধরণের লোক।

সেলিম। মেহের, তুমি জানিও আমার শিরায় একবিন্দু শোণিত থাকিতে আমি কখনও মেহের-শূন্য জীবন যাপন করিব না।

সেলিম কিছুক্ষণ পরে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, মেহের! আমার

হৃদয়সর্ব্বস্ব মেহের! এ জগতে আমি আর কিছুই চাই না। তোমার একটু ভালবাসার বিনিময়ে আমি এই বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করিতে পারি। তোমাকে লইয়া কুটীরবাসী হইলেও সেই আমার স্বর্গ।

মেহের। যুবরাজ! না জানি ভগবান আমার ভাগ্যে কি লিখিয়াছেন! আপনি ত শীঘ্রই সম্রাট্ হইবেন এবং নিশ্চয়ই তখন এ হতভাগিনীকে ভুলিয়া যাইবেন।

সেলিম। তোমাকে ভুলিব! মেহের, তুমি একথা আর মুখে আনিও না! অধিক আর কি বলিব মেহের, আমার যদি বক্ষ চিরিয়া দেখাইবার শক্তি থাকিত, তবে দেখাইতাম—এ হৃদয়ে তোমারই প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। যদি সেই অসভ্য পাষণ্ডী আমার এই সুখের পথের পরিপন্থী হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহার শির ধূলায় গড়াগড়ি যাইবে।

মেহের উত্তর দিতে উদ্যতা হইয়াছেন—এমন সময় অকস্মাৎ প্রকোষ্ঠের দ্বার উন্মোচিত হইল। উভয়ে দেখিলেন, সক্রোধে মেহের-জননী দ্বারে দণ্ডায়মানা।

কিছুক্ষণ বজ্রাহতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিবার পর তিনি বলিলেন, যুবরাজ! তোমার আচরণ দর্শনে আমি বিস্মিত হইয়াছি। তুমি ভারতের ভাবী সম্রাট্, তুমিই কি না আজ কোথায় অকৃত্রিম নৈতিক চরিত্রের দৃষ্টান্তে প্রজাবর্গকে চরিত্রবান্ করিবে, তাহা না করিয়া দিনে দুপুরে আমার সরলা কন্যার মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতেছ!

যুবরাজ সলজ্জভাবে বলিলেন, আগে অনুগ্রহ করিয়া আমার কথা কয়েকটী শ্রবণ করুন।

গিয়াস-পত্নী। লোকে বলে,—চক্ষু অপেক্ষা আর প্রত্যক্ষ সাক্ষী নাই। আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিলাম, তাহার জন্য আর কি শুনিব যুবরাজ! এস মেহের এস!

সেলিম। মেহের নিজেই আপনাকে সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত বলিবে। তখন বুঝিতে পারিবেন, আমি তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করি নাই।

মেহের বলিল—"মা"!

"চুপ কর হতভাগি!" এই বলিয়া সজোরে মেহেরের হাত ধরিয়া সম্রাজ্ঞীর কক্ষে লইয়া গেলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে গিয়াস্-পত্নী বলিলেন, দেখিতেছি সংসারটা দুষ্ট লোকে পরিপূর্ণ।

সাগ্রহে যোধবাঈ বলিলেন, কেন কি হইয়াছে?

গিয়াস-পত্নী। আমার কন্যা পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে বিশ্রাম করিতেছিল, এমন সময় যুবরাজ সেলিম সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অনেক প্রকার ভালবাসার কথা বলিতেছিলেন। আমি দরজা খুলিয়া দেখিলাম তাহারা উভয়ে উভয়ের সম্মুখে বসিয়া কত প্রকার ভালবাসাপূর্ণ কথাবার্ত্তা বলিতেছে। ধর্ম্মের কুসুম একবার মুকুলে চষিত হইলে তাহা আর প্রস্ফুটিত হয় কি? কিন্তু আমি যুবরাজকে সরলা বালিকার ধর্ম্ম-বাঁধ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। আশা করি, আপনি ঐ বিষয়ে একটু অনুসন্ধান ও ইহার প্রতীকারের একটা উপায়াবলম্বন করিবেন।

যোধবাঈ। আমার পুত্র একটু মাথা পাগলা রকমের। যাহা হউক, আমি তাহাকে ভৎর্সনা করিব। কিন্তু এ ঘটনার বিষয় আর কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না। সৌভাগ্য যে তুমি দেখিয়াছিলে!

গিয়াস-পত্নী সম্রাজ্ঞীকে নমস্কার করিয়া গাত্রোত্থানের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় মেহের-উন্-নিসা সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে নতজানু হইয়া বলিলেন,—

মহারাজ্ঞি! আমার প্রার্থনাটী একবার কৃপা করিয়া শুনুন। আমি বিশেষরূপে জানি, আপনি আমার মাতা-পিতার ন্যায় কঠোরান্তঃকরণ-বিশিষ্টা নহেন। আপনার পুত্র আমাকে অকৃত্রিমভাবে ভালবাসেন এবং—এবং এই বলিয়া লজ্জায় নতমুখী হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে মেহের বলিলেন, আমিও তাঁহাকে ভালবাসি। তাঁহার সহিত প্রথম দর্শন দিনেই আমি তাঁহাকে বিবাহ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। তিনি আমাকে অনুচিত কিছুই বলেন নাই। তিনি আমাকে ভালবাসেন, আমিও তাঁহাকে ভালবাসি, তাই তিনি আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আপনি দেশের মাতা—দেশের রাণী, আপনার নিকট করযোড়ে প্রার্থনা, আপনি আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন—আমার মাতা-পিতা আমাকে অকুল পাথারে ডুবাইতে যাইতেছেন, আপনি তাহা হইতে আমাকে উদ্ধার করুন।

এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মেহের উন্-নিসা বলিলেন, আমার মাতা-পিতা আমাকে একজন অপরিচিত লোকের হস্তে অর্পণ করিতে চান। তাহাকে আমি কখনও দেখি নাই বা ভালবাসি নাই। মহারাজ্ঞি! আর অধিক কি বলিব, আমি একটী হৃদয় ক'জনকে দিব?

কন্যার কথা শুনিয়া মেহের-জননী ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন।

যোধবাঈ মেহেরের কথা শুনিয়া হৃদয়ে বড়ই কষ্ট পাইলেন। তিনি তাহার মাতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি মেহেরের উপর অত রাগ করিও না। সে যেমন তোমার কন্যা, সেইরূপ আমারও কন্যা। সে আজ প্রাণের কথা—হৃদয়ের ব্যথা আমার কাছে খুলিয়া বলিয়াছে বলিয়া কি উহার উপর অত রাগ করিতে আছে? তুমি ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা জান না; যদি জানিতে, তাহা হইলে আর উহার প্রতি অত রাগান্বিত হইতে না।

গিয়াস-পত্নী। আমি বালিকা-বয়সেই বিবাহিতা হই। তদবধি আমি স্বামী ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। স্বামী পূর্ব্ব হইতে পরিচিত হউক বা না হউক, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কে ভালবাসার পাত্র?

যোধবাঈ। এই কারণেই তুমি তোমার কন্যার কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইতে পারিতেছ না। মায়ের মত ধৈর্য্যাবলম্বিনী হও, সমস্ত বিচারের ভার আমাকে অর্পণ কর, দেখিবে তাহাতে তোমাদের কল্যাণ বই অকল্যাণ হইবে না।

এই কথা বলিয়া তিনি মেহেরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তুমি আমাকে সমস্ত বিষয় বলিয়া ভাল কাযই করিয়াছ। আমি তোমার সুখের পথে কাঁটা দিব না।

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মেহের সম্রাজ্ঞীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া মাতৃ-সমভিব্যাহারে স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

কথাদু'টী।

কথাদু'টী, প্রিয়সখে, কও ফুল্লমনে—
প্রাণে ব্যথা দিও না'ক আর ;
ছুটিয়াছি কত দিন আকুল পরাণে
কথাদু'টী শুনিতে তোমার॥
নাহি চাহি বিশ্বপানে—করিয়াছি কত
মনে মনে তোমারি সাধনা ;
তুমি মোর চিন্তামণি হয়েছ নিয়ত
—পুরাবে না এ দীন-কামনা ?
মনে পড়ে, প্রাবৃটের বারিধর-তলে
খেলেছিনু কিবা ফুল্লপ্রাণে ?
শুনি তব ভাষা, বিশ্ব যাইতাম ভুলে
এবে, সখে, আছে সবি মনে ?
অনন্ত জলধি যথা নীলাম্বরচ্ছায়
ধ'রে রাখে সতত উরসে,
তেমনি তোমার ছবি স্মৃতি-তুলিকায়
চিরতরে এঁকেছি মানসে !
সেধেছি তোমায় এত—বিনিময় তরে
চাহি শুধু—বেশী কিছু নয় !
কথাদু'টী কও সখে—কও প্রাণভরে
কও—কও—দাও বিনিময় !
কথাদু'টী তব দীন-মুক্তাপ্রাপ্তি-সম
মধুচক্রমধু-বিজড়িত !
চন্দ্রামলকর-সম মোহে মন মম
বড় সাধ—শুনি অবিরত !
তাই কথাদু'টী সখে—কও ফুল্লমনে
—প্রাণে ব্যথা দিও না'ক আর ;
বিনিময় দাও সখে, সদয় পরাণে
আমিই যে তোমার—তোমার !

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়।

নিদয়া।

গল্প।

(১)

আধা বয়সে দুই শত টাকা পণ দিয়া সৃষ্টিধর যখন চঞ্চলাকে বিবাহ করিয়া আনে, তখন চঞ্চলার বয়স দশ বৎসর। সৃষ্টিরও সংসারে আর কেহ ছিল না। মনে করিয়াছিল—বালিকা পত্নীটীর হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্তে শেষের দিন কয়টা একটু সুখে শান্তিতে কাটাইয়া যাইবে।

“কিন্তু হাদে বিধি বিধি হ'ল বাম” প্রথমটা আসিয়াই চঞ্চলা এমন কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিতে লাগিল, যে সৃষ্টির বড় দুঃখ হইল। ভাবিল, কি অন্যায়ই করিয়াছি! তারপর অনেক কষ্টে খেলনা সন্দেশ নূতন কাপড় চোপড় ইত্যাদিতে যদিও কথঞ্চিৎ শান্ত হইল,—কিন্তু সৃষ্টির উপর বক্র হইয়াই রহিল। তাহাকে দুটো রাঁধিয়া বাড়িয়া দেওয়া ত দূরের কথা, নিজের পরণের কাপড়খানা পর্য্যন্ত কাচিত না—সৃষ্টিকেই মাঠ হইতে খাটিয়া খুটিয়া আসিয়া একই সঙ্গে রান্না বাড়া এবং স্ত্রীর পরিধানের কাপড়খানা পর্য্যন্ত কাচিয়া দিতে হইত।

লোকে হাসিত, ঠাট্টা করিত, বলিত—সৃষ্টি বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিলে ভাল! সৃষ্টি নীরবেই সমস্ত শুনিয়া যাইত। নিজের এই কার্য্যের জন্য দুঃখিত হইয়াছে বলিয়াও বোধ হইত না, স্ত্রীর নাম হইলেই অবুঝ স্ত্রীর পরে একটা সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুকম্পায় তাহার সমস্ত মুখে একটা অপূর্ব্ব স্নেহের রেখা ফুটিয়া উঠিত, একান্ত কেহ চাপিয়া ধরিলে এবং স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাইবার প্রস্তাব তুলিলে বলিত—এখনও অবুঝ আছে, একটু বড় হইলেই সারিয়া যাইবে। কিন্তু দ্বাদশ, ক্রমে ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ পর্য্যন্ত কাটিয়া গেল, তবু চঞ্চলার বোধ হইল না! স্বামীর স্কন্ধে সেই প্রথমে যেমন বিনা সঙ্কোচে আরোহণ করিয়াছিল, এখনও সেইরূপ স্কন্ধের বোঝা হইয়াই রহিল! বেচারাকে একটু নিষ্কৃতি দিয়া হাঁপ ছাড়িবার অবসর দিল না! কিন্তু সৃষ্টির তাহাতে দুঃখ নাই; সে যে চঞ্চলাকে ভালবাসিতে পারিয়াছে, এই অনুভবে তাহার সমস্ত বক্ষ ভরিয়া রহিত।

একদিন আষাঢ় মাসে সন্ধ্যার সময় মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সৃষ্টি ডাকিল—চঞ্চলা!

চঞ্চলা ঘরের মধ্যে তখন পাড়ার নবীন বোসের পুত্র কুমারীশকে দিয়া তাহার মাসীর বাড়ীতে একখানা পত্র লিখাইতেছিল। তাহার মা বাপ কেহ ছিল না;—মাসীই তাহাকে মানুষ করিয়া বিবাহ দিয়াছিল। স্বামীর আহ্বানে মুখটী বেজার করিয়া বাহিরে আসিয়া কহিল,—কি ব'লো? মাগো, একখানা পত্র লেখাবারও অবসর নাই!

সৃষ্টি কহিল, আমাকে এক ঘটী জল দিবি চঞ্চলা, বড় তেষ্টা পেয়েছে।

চঞ্চলা অঞ্চল দোলাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল,—আমার এত অবসর নেই, তুমি নিজেই গড়িয়ে নাও গে—

সৃষ্টি কহিল, আমাকে জল দেওয়ার চেয়ে কি তোর চিঠি লেখাই বেশী হ'লো? হাঁরে কথার স্বরে একটা ক্ষোভ জাগিয়া উঠিল।

চঞ্চলা কহিল, তুমি কি আমার একখানা চিঠি লিখে দেবে, লিখ্‌তে জানো?

কুমারীশ বয়সে কিশোর হইলেও নারীর এই কথায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। চঞ্চলাকে কহিল, জলটী দিয়েই এসো না, খেটে খুটে এলো!

চঞ্চলা উঠিয়া জল দিয়া আসিয়া আবার কুমারীশের কাছে বসিয়া পত্র লেখাইতে লাগিল। কহিল, কি লিখিলে বলো দেখি?

কুমারীশ কহিল, যা বলেছো তাই লিখেছি।

চঞ্চলা কহিল, আর একটু লিখে দাও, আর আমাকে এই আষাঢ় মাসের মধ্যে নিয়ে যায় যেন। আর আমি থাকিতে পারিতেছি না।

সৃষ্টির কর্ণেও কথাটী প্রবেশ করিল, সে তখন তামাক সাজিতেছিল, কহিল—আমি তোকে মার্‌ছি না ধর্‌ছি?

সৃষ্টি ছেলেবেলা হইতে চঞ্চলাকে মানুষ করিয়াছিল বলিয়া তুই তোকারিই করিত।

চঞ্চলা কহিল, আমি কি তাই লেখাচ্চি নাকি; আমি তোমার ঘরে থাক্‌তে পার্ব্বো না, তাই মাসীমাকে জানাচ্চি।

সৃষ্টি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, এখনও চঞ্চলা বালিকাই রহিয়াছে, কিন্তু সংকল্প করিল—তাহার এ ভুল ভাঙাইতে হইবে। জানাইতে হইবে,—আমি তার স্বামী, আর এই স্বামীর ঘরই নারীর একমাত্র আশ্রয়-স্থল। তৎপরে সে নীরবে তামাক টানিতে লাগিল।

চঞ্চলা বাক্স খুলিয়া খামের দরুণ কয়টা পয়সা কুমারীশের হাতে দিয়া স্বষ্টিকে আদেশ করিল,—কুমারীশকে তাহাদের বাড়ীর দুয়ার পর্য্যন্ত রাখিয়া আইস।

স্বষ্টি তামাক টানিতে টানিতেই কুমারীশের সঙ্গে দাঁড়াইতে গেল।

পথে একবার সসঙ্কোচে স্বষ্টি কুমারীশকে জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ ভাই, সত্যিই চঞ্চলা—যা ব'ল্লে, তাই চিঠিতে লিখে দিলে নাকি?

কুমারীশ কহিল, না স্বষ্টি দা, তুমি কি আমাকে তাই পেলে! তোমার বউএর বোধশোধ নাই ব'লে কি আমাদেরও নাই। আমি মুখে বল্লাম বটে, যে, যা ব'ল্লে তাই লিখে দিলাম, কিন্তু আসলে তা নয়।

স্বষ্টি কহিল, বেশ বেশ ভাই। যা ব'লবে তাই অমনি লিখে দিও না। ইস্কুলে প'ড়ছো—দুকথা বেশ বানিযে তোমারাও ত লিখ্‌তে পারো, তাই লিখে দেবে। আর তার ত খাওয়া মাখারও কষ্ট নাই।

কুমারীশ কহিল, তা কি আমরাও দেখ্‌তে পাচ্চি না, কষ্টে-স্বষ্টে যা রোজগার করো, সে ত তোমার বউই সব খেযে ফেলে, একটী কথাও তুমি বলো না।

স্বষ্টি কহিল, না ভাই আমিও কিছু বলি না, ভাবি,—ছেলে মানুষ, কেউ সঙ্গী সাথী নাই, খাওয়া মাখাতে যদি ভুলে থাকে; তাই কিছু বলি না।

কুমারীশ মনে মনে হাসিয়া কহিল, বেশ নির্ব্বোধের মত চঞ্চলা তোমাকে ঠকাইতেছে! আর তুমি ভালবাসিয়া নিশ্চিন্ত আছো। কুমারীশ যেন চঞ্চলা সম্বন্ধে অনেকখানি কথাই জানিত। শুধু সে ইস্কুলের বালক বলিয়া ফুটিয়া বলিতে কেমন বাধো বাধো ঠেকিত মাত্র। বাড়ীর দোরে পৌঁছিয়া স্বষ্টিকে বিদায় দিয়া কহিল—যাও। স্বষ্টি ফিরিয়া আসিল।

(২)

বাড়ী প্রবেশ করিয়া স্বষ্টি দেখিল, চঞ্চলা এখনও বিছানায় পড়িয়া ঘুমায় নাই। ইহার আগে আগে এত রাত্রিতে এমন সময় সে অগাধ নিদ্রায় অভি-ভূত হইয়া গিয়াছে, জাগাইয়া তুলে কার সাধ্য! কিন্তু আজ সে ঘরের দাওয়ার খুঁটিটায় হেলান দিয়া পৈঠার ধারে পা ঝোলাইয়া, চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাঙা মেঘের কোলে চাঁদ উঠিয়াছে, আর সেই চাঁদের দিকে চাহিয়া তাহার অনিমেষ আঁখি দুটী কোন্ দুরান্তরের পানে কিসের সন্ধানে-উধাও হইয়া গিয়াছে, এ কি সুন্দর চাওয়া তার।

এ কি সুন্দর চাওয়া তার। চাঁদও যেন তার সুডৌল মুখখানির দিকে অনিমেষ চাহিয়াছিল। বিকচোন্মুখ চঞ্চলার পানে চাহিয়া সৃষ্টিধরের সমস্ত হৃদয় যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে নূতন একটা সৌন্দর্য্য-রসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। ভাবিল, এই ত তাহার লক্ষ্মী! এই ত তাহার গৃহের আনন্দ-প্রতিমা! আর তাহাকে চেষ্টা করিয়া মানুষ করিতে হইবে না। সে-ই এখন তাহার সংসারের সমস্ত ভার লইয়া তাহাকে নিষ্কৃতি দিবে,—একটু সুখের মুখ দেখাইবে।

সদ্য ভাবোচ্ছ্বসিত হৃদয়টী লইয়া—কাছে আসিয়া চঞ্চলার পার্শ্বটীতে বসিয়া ডাকিল চঞ্চলা,—চঞ্চলা সৃষ্টির পানে চাহিয়া উঠিয়া যাইতেছিল। সৃষ্টি অঞ্চলটী ধরিয়া কহিল, থাক্ আমি এখন ভাত খেতে যাবো না। দাঁড়াও না, দু'দণ্ড বসে কথা কহা যাক্!

এই কয়টী দিনমাত্র চঞ্চলা চাযের সময় বলিয়া ও পাঁচজনাকার অনুরোধে—ধিকারে স্বামীর জন্য রাঁধিতেছিল। ভক্ত স্বামীটীরও এই কারণে স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধার সীমা নাই। সে যে কি করিয়া স্ত্রীকে তাহার ভালবাসা জ্ঞাপন করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাই মুখে যা আসিল, তাই আবেগ ভরে বলিয়া গেল।

চঞ্চলা কোন উত্তর না দিয়া মুখটা ফিরাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

সৃষ্টি ভাবের প্রাবল্যে চঞ্চলার হাতটী চাপিয়া কহিল। আচ্ছা চঞ্চল! তুই কি আমায় ভালবাসিস্ না? না, বুড়ো ব'লে আমাকে পছন্দ হয় না? চঞ্চলা হাতটী ছাড়াইয়া লইয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল।

সৃষ্টি পুনরায় চঞ্চলার হাতটী চাপিয়া কহিল,—তুই ভাল বাসিস্ না বাসিস্; তবু চঞ্চল তোকে আমি ভালবাসি! তোকে ভালবেসে যে আমার কত সুখ, তা কি ক'রে ব'লবো! বুড়ো হয়ে গিয়েছি বটে, তবু প্রাণটী তাজা আছে, জীবনে আর কখন ত কারো পানে চাই নাই!

চঞ্চলা কোন কথা না বলিয়া সৃষ্টির হাতটা ছাড়াইয়া, অশ্রুটা সম্বরণ করিয়া লইতেই যেন ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

সৃষ্টিও ভাবিল, তবে কি চঞ্চলার মনে কোন কষ্ট দিলাম? ভাবিয়া দেখিল,—অন্যায় ত কিছু বলে নাই,—যা সত্য, যা বলা উচিত, তাই বলিয়াছে, তবু আশঙ্কায় তাহাকে একবার ঘরের মধ্যে আসিতে হইল।

আসিয়া দেখিল, চঞ্চলা তাহারই জন্য ভাত বাড়িতেছে। চক্ষের কোণে অশ্রুটা শুকাইয়া গিয়া সেটা একটা স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ভরিয়া উঠিয়াছে।

স্বষ্টি অকারণে খানিকটা হাসিয়া কহিল, চঞ্চল! তুই এখানে ভাত বাড়ছিস্, আমি ভাবলাম বুঝি কাঁদছিস্! কিন্তু সত্যই, অন্যায় কখন তোকে বলি নাই। অন্যায় কখন ব'লবোও না। আমাকে তুই ভালবাস্‌বি ত?

'ঢং দেখে বাঁচি না' বলিয়া একটা বক্র কটাক্ষের সহিত চঞ্চলা ভাতের পাথরটা স্বষ্টির সম্মুখে রাখিয়া পানের ডাবেরটা লইয়া বাহিরে গিয়া পান সাজাইতে লাগিল।

স্বষ্টি কহিল,— তোর খাওয়া হ'য়েছে ত চঞ্চল?

চঞ্চলা কহিল, হঁ।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া স্বষ্টি অনেক কথাই চঞ্চলাকে নিবেদন করিল। চঞ্চলা তার একটা কথার উত্তরও দিল না। এই প্রৌঢ় যে কি কারণে এই বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিল, এই দুঃখে তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া ছিল। পাশ ফিরিয়াই রাত্রি কাটাইয়া দিল।

(৩)

সকাল বেলায় জাগিয়া উঠিয়া চঞ্চলা দেখিল, পৃথিবী পরিপূর্ণতায় ভরিয়া রহিয়াছে, শুধু তাহারই কি যেন নাই। সে-ই যেন রিক্ত। আপনার দিকে চাহিয়া, তাহার ভিতরটা যেন গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, তাহার মধ্যে যে অমৃত সরোবরটা ছিল, সেটা কে সেঁচিয়া শুকাইয়া দিয়াছে, সেদিন আর চঞ্চলার গৃহস্থালীর কায-কর্ম্মে মন লাগিল না; গৃহকর্ম্ম ফেলাইয়া রাখিয়া বিছানাতেই পড়িয়া রহিল।

অনেক বেলার পর স্বষ্টি মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, কি রে চঞ্চল, এখনও যে শুয়ে রয়েছিস্। রাঁধিস্‌নি? অসুখ ক'রেছে?

চঞ্চলা কহিল, হাঁ।

স্বষ্টি নিজেই স্নান করিয়া রান্না চড়াইয়া দিল। তখন চঞ্চলা আস্তে আস্তে বিছানা হইতে উঠিয়া কুমারীশদের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। তাহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া কুমারীশের মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগা খুড়ী-মা, কুমারীশ ঠাকুরপো ইস্কুলে গেছে?"

যদিও কুমারীশের মা-ও সে ভিন্ন-জাতি, তবু গ্রাম-সম্পর্কে একটা সম্পর্ক পাতানো ছিল; কায়স্থ ও কৈবর্ত্ত বলিয়া আকাশ-পাতালের ভেদ ছিল না।

কুমারীশের মা কহিল, হাঁ ইস্কুলে গেছে।

চঞ্চলা কহিল, আমি মাসীমাকে একখানা চিঠি দিয়েছি, ডাকে গেল কি না, তাই জান্‌তে এলেম।

কুমারীশের মা কহিল, তা যাবে বৈ কি, বসো।

চঞ্চলা ঘরের দাওয়াটায় বসিয়া পড়িয়া কহিল,—আমার আর মা এখানে মন টিক্‌ছে না। মাসীমার ঘরে বড্ড যেতে ইচ্ছা হচ্চে।

কুমারীশের মা কহিল,—তা ইচ্ছে হয় বৈকি মা, এখন যাবে—

এমন সময় কুমারীশের এক বিধবা দিদি আসিয়া কহিল—কি কৈবর্ত্ত বউ! এত বেলা হ'য়েছে, সৃষ্টির জন্য রাঁধিস নাই?

চঞ্চলা কহিল,—পারি না দিদি। রোজই কি ওমনি রাঁধা যায়?

বিধবা কহিল,—তা আর যায় না? স্বামীর জন্যে রাঁধতে আবার কষ্ট আছে বুঝি?

চঞ্চলা সে কথার কোন উত্তর দিল না।—বিধবা হাসিয়া কহিল,—সৃষ্টিধর একটু বয়সওয়ালা ব'লে বুঝি তোর পছন্দ হয় না, না? তা হাঁরে পাগ্‌লী, স্বামী আবার বুড়ো অবুড়ো আছে?

চঞ্চলা খানিক চুপ থাকিয়া কহিল, তা যাই বলো দিদি, আমার কিন্তু এখানে পোষায় না। সেই যে রোজ দুবেলা রাঁধো বাড়ো—দাও থোও—সে আমি পেরে উঠি না।

বিধবা অমলা কহিল,—তবে তুই কেবল সুখ চাস্‌, না? বেশ বড়-লোকের ঘরে খাট্‌তে খুট্‌তে হবে না—ব'সে ব'সে খাবি?

চঞ্চলা সস্মিতমুখে কহিল—হ্যাঁ—

অমলা হাসিয়া কহিল,—দুঃ, ওকথা ব'ল্‌তে নাই। ভগবান তোকে যে ধনের অধিকারী ক'রেছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকিস্‌। দেখ্‌বি, তাতেই সুখ পাবি। বড়লোকের ঘরে—শুধু টাকার গদির ওপরে ব'সেই কি সুখ আছে রে পাগলী!—কত সোণার ঘরে, সোণার প্রতিমা বউ যে, স্বামীর ভালবাসা পাওয়া দূরের কথা, একবার চোকের দেখাও পায় নাই। তোকে ত সৃষ্টিদা ভালবাসে!—কাঙালের তাই ত সোণা রে—বলিয়া, চঞ্চলার বাল্যকালে সৃষ্টিধর তাহার জন্য কত কি করিয়াছিল—এক একটী করিয়া তাহাকে সমস্ত শুনাইয়া গেল। কবে কোন দিন সে কাহার বাড়ীতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সৃষ্টি বুকে করিয়া তুলিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছে; কবে পড়সীদের বাড়ী নারিকেল

তেল মাখাইয়া দড়ি দিয়া তাহার মাথাটী বাঁধিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছে, অমলা সকলই কহিয়া গেল।

চঞ্চলাও ভাবিয়া দেখিল।—ভালবাসা সে পাইয়াছে বটে, সত্যই ভালবাসা পাইয়াছে, কিন্তু এমন বৃদ্ধের কাছ হইতে কেন? যমে যাহার মরণের ডাক পাঠাইয়াছে, বার্দ্ধক্য যাহার জীবনের নবীনতার উপর শুভ্রতার ছাপ ফেলিয়াছে,সেখানেও হয় ত ভালবাসা আছে সত্য,—কিন্তু প্রতিদান দিয়া তৃপ্তি লাভ করিবার একটা অবসর কোথায়? মধ্যে যে একটী পর্ব্বত ব্যবধান করিয়া আছে। পদে পদে মৃত্যুগণ্ডী অতিক্রম করিয়া তবে যাইতে হইবে। নবীন জীবনে এতটা কি পোষায়? আপন মনেই একটী ভাঙা নারিকেল মালাকে ঠুকিয়া ঠুকিয়া মেঝের উপর বসাইতে লাগিল—এমন সময় জুতা পায়ে দিয়া কুমারীশ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

চঞ্চলা কুমারীশের পানে চাহিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, কি ঠাকুরপো, এলে ইস্কুল হ'তে? আমার চিঠিখানা ডাকে দিয়েছিলে ত?

কুমারীশ কহিল,—হাঁ—দিয়ে দিয়েছি।

চঞ্চলা খানিক সেখানে বসিয়া থাকিয়া, পুনরায় আপনার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ী আসিয়া দেখিল, স্বামী সৃষ্টিধর রান্না-বাড়া সমাপন করিয়া নিজে খাইয়া, চঞ্চলার জন্যও খাবার বাড়িয়া ঢাকা দিয়া বাসন কয়টী ধুইবার যোগাড় করিতেছে।

চঞ্চলা কহিল,—থাক্, বাসনটা না হয় আমিই ধুয়ে ফেল্‌বো।

সৃষ্টি কহিল—"বেশ, দয়া যে হ'য়েছে নিদয়ার, এই আমার ভাগ্যি" বলিয়া হাসিয়া তামাকটী সাজিয়া টানিতে টানিতে মাঠে চলিয়া গেল।

চঞ্চলা বাসনটী মাজিতে মাজিতে মনে মনে ঠিক দিতে লাগিল—বুড়ার কাছ হইতে কি আদায় করা যায়? সন্তানের জননী হওয়া সম্বন্ধে সে হতাশই হইয়াছিল। ঠিক করিল, তাহাকে গহনার জন্য ধরিব। সেই গহনা ক'টীই মাত্র তাহার জীবনের গর্ব্ব হইয়া রহিবে। লোকের কাছে বলিতে পারিবে, তাহার স্বামী আর কিছু দিতে না পারুক, এই গহনাই দিয়াছে। স্থির করিল, বুড়া যখন রাত্রের আহার সমাপন করিয়া একটু আরামে বিশ্রাম লইবে, তখনই ধরিয়া কথা পাড়িবে। চঞ্চলার অনুরোধ সে এড়াইতে পারিবে না। সে যে তাহাকে ভালবাসে,—প্রাণ দিয়াই ভ'লবাসে।

কথাটা চঞ্চলাকেও পাড়িতে হইল না। সৃষ্টিধরই একদিন ভাত খাইতে খাইতে চঞ্চলাকে বলিয়া উঠিল, একটা জিনিষ নিবি চঞ্চলা ?

প্রথমটা চঞ্চলা ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতিই জানাইল। তারপর যখন শুনিল, সে জিনিষটা সোণার, আর তার খুব আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী তাগা অনন্ত, তখন একবার সৃষ্টির পানে কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, যদি দাও, খুব ভালবাস্‌বো, সত্যি বল্‌ছি—খুব ভালবাস্‌বো !

সৃষ্টিধরও আর একবার কথাটী স্বীকার করাইয়া লইয়া কহিল, তাহ'লে দ্যাখ্ ভালবাসবি ত ?—না আমায় আনাড়ী বুঝে দম্ দিয়ে ভুলিয়ে রাখ্‌বি ?

চঞ্চলা ভঙ্গীর সহিত একটু চাহনি হানিয়া মুখটা ফিরাইয়া কহিল, না, আমি নিশ্চয় ভালবাস্‌বো,—যদি আমায় দাও !

সৃষ্টি কহিল,—তবে দাঁড়া। দুদিন আমায় কিন্তু ছুটি দিতে হবে। আমার মামার বাড়ীর গাঁয়ে বিক্রি আছে কিনা, আমায় নিজে যেয়ে আন্‌তে হবে। আমি চলে গেলে বাড়ীতে একলা থাক্‌তে পার্ব্বি ত ?

চঞ্চলা অধীর হইয়া কহিল,—সেজন্য তোমার কিছু ভাবনা নাই গো, তুমি আজই যাও না !

সৃষ্টি কহিল,—দাঁড়া, ধান পান দুটো বিক্রি করি—ওম্নি গেলেই হ'লো,—টাকা চাই।

চঞ্চলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিযা কহিল, তবেই তুমি এনেছ,—আর আমিও গহনা প'রেছি।—

সৃষ্টি কহিল, আচ্ছা দেখিস্।

সত্যই একদিন মাসের শেষাশেষি সৃষ্টি সকাল বেলায় উঠিয়া তাহার মামার বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। চঞ্চলার মনটা সেদিন ভারি খুসী হইয়া উঠিল,—কল্পনায় পড়্‌সীদের ও মাসীমাকে নিমন্ত্রণ করিল।

সন্ধ্যাবেলাতেই কুমারীশ তাহার ঘরের দুয়ার দিয়া যাইতেছিল ; চঞ্চলা তাহাকে ডাকিয়া কহিল ; একখানা পত্র লিখে দেবে ঠাকুরপো। বাড়ীতে মাসীমাকে পত্র দেবো।

কুমারীশ কহিল, সময় নাই। তারপর সৃষ্টির খবর লইয়া যখন শুনিল যে, সৃষ্টি ঘরে নাই, তখন কি ভাবিয়া সম্মত হইল। কহিল, চলো যাওয়া যাক্।

চঞ্চলা একখানা আসন পাড়িয়া দিয়া ও দোয়াত কলম কাগজ যোগাড় করিয়া দিয়া, কুমারীশের নিতান্ত কাছটীতেই আসিয়া বসিল।

কুমারীশ সাদা কাগজখানা ভাঁজ করিয়া কহিল, বলো কি লেখা যাবে।

চঞ্চলা কহিল, লেখ আমি ভাল আছি, খাব মাসীমার অনেকদিন কুশল সংবাদ পাই নাই। বাড়ীর কে কেমন আছে, অতি অবশ্য তার উত্তর দেয় যেন। আর মাসীমা, একবার এ বাটীতে আসিতে পারিলে ভাল হয়। তাগার কথাটাও মনে হইতেছিল এবং সেই কথাটা লেখাইবার জন্যই কুমারীশকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু সাহস করিয়া কথাটা কুমারীশকে খুলিয়া বলিতে পারিল না।

কুমারীশ কহিল, আর কিছু লেখাবার নাই?

চঞ্চলা কহিল,—না।

কুমারীশ পরিহাস করিয়া কহিল,—আচ্ছা আমি একটা কথা লিখে দিই, লিখি যে, তোমার স্বামী সৃষ্টিধর তোমায় খুব ভালবাসে।

চঞ্চলা লজ্জায় মুখটা ফিরাইয়া কহিল। দ্যোৎ, ওসব কথা লিখ্‌তে আছে বুঝি?

কুমারীশ কহিল, কেন নাই?

কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে রাত অনেকটা হইয়া পড়িয়াছিল; তবু কুমারীশ আজ চলিয়া যাইতেছিল না। চঞ্চলাও আজ কুমারীশকে যাও বলিয়া উঠাইয়া দিতে পারিতেছিল না। যেন তাহার ক্ষুধিত প্রাণটী অনেক দিনের একটা বুভুক্ষা মিটাইয়া লইবার অবসর পাইয়াছে; সুতরাং জোড় করিয়া আপনাকে বঞ্চনা করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। সহসা বাহি-রের দরজাটী খোলার শব্দ হইল।

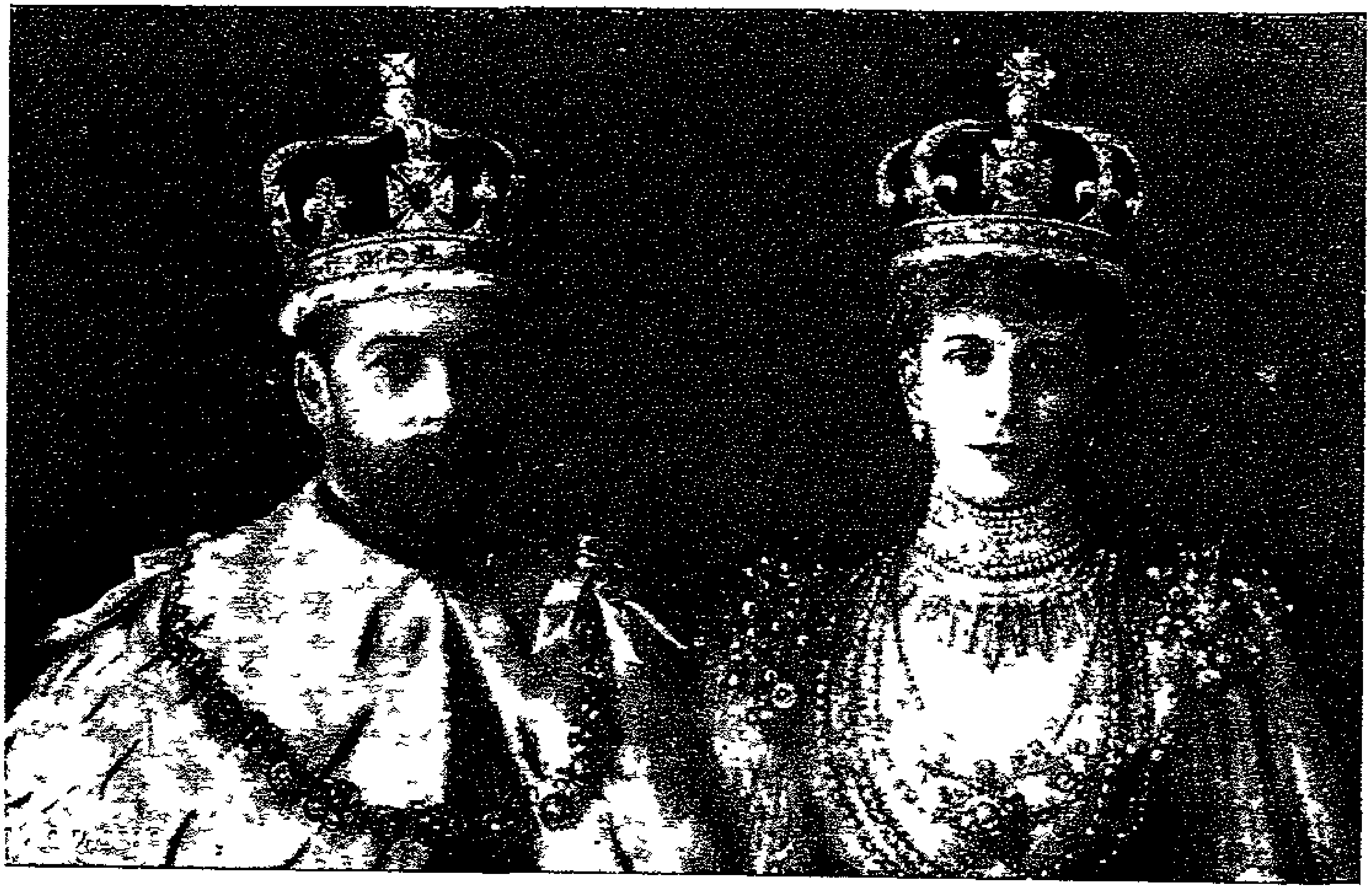
কুমারীশ চমকাইয়া কহিল, কে?

চঞ্চলা বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল—সৃষ্টিধরই আসিতেছে।

সৃষ্টিধর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন দুই জনেই চকিত হইয়া উঠিল। দেখিলে বোধ হয়, যেন দুইজনাকার মধ্যেই একটা গোপন কিছু ছিল, হঠাৎ তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

কাহাকেও কিছু না বলিয়া কুমারীশ আস্তে আস্তে ঘরের বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

একে সন্ধ্যা রাত্রিতে কুমারীশকে চঞ্চলার ঘরে একা দেখিতে পাইয়াই সৃষ্টির কেমন একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার উপর তাহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সন্দেহটা আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। চঞ্চলার পানে চাহিয়া কহিল, চঞ্চলা?



ভারত সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞী।

চঞ্চলা সৃষ্টির পা ধুইবার জলটা আনিয়া দিয়া কহিল, কি?

খুব একটা শক্ত কথাই সৃষ্টির ঠোঁটের আগে আসিয়াছিল; কিন্তু চঞ্চলার ঢল ঢল যৌবন-লীলায়িত মুখখানির দিকে চাহিয়া, সে একেবারে ভুলিয়া গেল। তাহার সকল ক্রোধ, স্নেহে ও প্রেমে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল। গদগদ স্বরে কহিল, না চঞ্চলা, তোকে আমি কিছু বল্‌বো না—তুই সুখেই থাক্? তার পর কথাটা ফিরাইয়া কহিল, তোর কেমন অনন্ত এনেছি দেখ্‌বি? আয়, পরিয়ে দি। সযত্নে চাদরের খুঁট হইতে অনন্তটী বাহির করিয়া চঞ্চলার হাতে পরাইয়া দিয়া কহিল, কেমন মানিয়েছে বল্ দেখি। আবেগ ভরে তাহার বিম্বাধরে হাত দিয়া মুখখানি তুলিয়া লইয়া কহিল—এইবার আমায় ভালবাস্‌বে ত চঞ্চল!

চঞ্চলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া স্বামীর জন্য ভাত বাড়িতে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

অনন্ত পাইয়া তাহারও যেন হঠাৎ স্বামীর প্রতি কেমন একটা ভক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল—সযত্নে ভাত বাড়িয়া কহিল, এসো ভাত খাওসে।

সৃষ্টির কোন উত্তর আসিল না।

চঞ্চলা কাছে গিয়া দেখিল, সৃষ্টি দাওয়াটায় উবুর হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, গোঁয়াইতেছে, চোক মুখও লাল হইয়া উঠিয়াছে।

চঞ্চলা আতঙ্কিত হইয়া ব্যস্ততার সহিত কহিল—কি হলো গো তোমার! দুই হাত দিয়া খুব জোড়েই টানাটানি করিল।

সৃষ্টি কষ্টে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—জোর ক'রে বুকের একটা ব্যথাকে চেপে রাখ্‌তে গিয়েছিলেম চঞ্চল। কিন্তু কেমন যেন বুক ভেঙ্গে গেল, চেপে রাখ্‌তে পার্লেম না চঞ্চল, তবু তোকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা নাই। এখনও ইচ্ছা হচ্ছে, আমার এই ভাঙা বুকের রক্ত দিয়েই তোর পা দুখানি রাঙিয়ে দিয়ে যাই।

চঞ্চলা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

প'ড়সীরা ছুটিয়া আসিয়া কহিল, ব্যাপার কি?

চঞ্চলা কাঁদিয়া কহিল,—তোমরা দেখ, কি হ'য়েছে জানি না। ভাত বাড়তে ব'লে আর ভাত খেলে না।

ডাক্তার আসিয়া কহিল,—সন্ন্যাস রোগেই ধরিয়াছে। বাঁচিবার আর আশা নাই শুনিয়া চঞ্চলা চক্ষে অন্ধকার দেখিল। ভাবিল, স্বামী চলিয়া

গেলে তাহার থাকিবে কি? কে আর তাহার এতটা আব্দার সহিয়া তাহাকে এমন ভাবে করুণা করিবে? ভবিষ্যৎ সংসারটার পানে চাহিয়া, সে একেবারে শিহরিয়া উঠিল। তাহার উপর সন্ধ্যাবেলাকার ব্যাপারটা মনে পড়িয়া, বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল যেন, তাহার পরে অভিমান করিয়াই স্বামী চলিয়া যাইতেছে।

সবলে দুই হস্তে সৃষ্টির পা দুটা জড়াইয়া ধরিয়া চঞ্চলা অশ্রু-অবরুদ্ধ স্বরে কহিল,—ওগো আমি দোষী নয়, দোষী নয়। তুমি আমায় মন্দ ঠাউরে চলে যে'য়ো না! আমায় ক্ষমা করো! হু হু করিয়া দুই চোকের জলে নারী ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

মরণোন্মুখ সৃষ্টিধর চঞ্চলার একখানি হস্ত আপনার বুকের উপর লইয়া ব্যাকুল ভাবে শেষ চাহনিটী চাহিতে চাহিতে, নীরবে প্রাণত্যাগ করিল। মরণের পরও তাহার চোকের কোণে লাগিয়াছিল—একবিন্দু মায়ার অশ্রু।

* * * *

সেই রাত্রেই প্রতিবেশীরা সৃষ্টির মৃতদেহ সৎকার করিতে শ্মশানে লইয়া গিয়াছে। নিশিশেষে আকাশে ম্লান চন্দ্র উদিত হইয়াছে, বাতাসও একটা হু হু বেদনা ভরে উচ্ছ্বসিত হইয়া বহিতেছিল। একাকিনী চঞ্চলার কাছে শুইয়াছিল, প্রতিবেশিনী কানাইএর মা। মাত্র এই রাত্রিটীর মত দয়া করিয়া সে আসিয়াছিল। সহসা একটা দুঃস্বপ্নে জাগিয়া উঠিয়া কানাইএর মা দেখিল, রান্নাঘরের কাছটাতে খুব আলো, যেন আগুণ লাগিয়াছে! পার্শ্বে চাহিয়া দেখিল চঞ্চলাও নাই! ছুটিয়া গিয়া দেখিল, আপনাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া সেই বস্ত্রে চঞ্চলা আগুণ ধরাইয়া দিয়াছে।

কানাইএর মা চীৎকার করিয়া পড়সীদের ডাকিল এবং জল ঢালিয়া আগুণ নিভাইয়া দিল; কিন্তু তবু তাহাকে বাঁচান গেল না। একই চিতায় স্বামী ও স্ত্রী দুইএর দাহকার্য্য সমাধা হইয়া গেল। যাহারা চঞ্চলাকে সবিশেষ জানিত বা না জানিত, তাহারা সকলেই "নিদয়ার" অপূর্ব্ব আত্মাহুতিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার কথাটা দেশের স্ত্রী মহলে আলোচনার বিষয় হইয়া রহিল।

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ।

আবার।

আজি এ ভগ্ন জীর্ণ বীণায়,
কা'র প্রেরণায় উঠেছে তান ;
কাহার পরশ-আবেশে জেগেছে
সুপ্ত রাগিণী, লুপ্ত গান।
ছিন্নতন্ত্রী দিয়াছে যুড়িয়া,
টানিয়া বেঁধেছে নূতন সুর ;
শূন্য যা'ছিল পূর্ণ করেছে,
নিকটে এনেছে ছিল যা'দূর।
কে তুমি এসেছ, কোন দেশ হ'তে,
কোন শুভ যোগে হেথায় নামি ;
কেন এ চাতুরি, কেন লুকাচুরি ?
তুমি কি ভেবেছ চিনি না আমি ?
চিরদিন ঐ রূপের নেশায়
মত্ত হইয়া আছে এ প্রাণ ;
জনমের তরে জীবন আমার,
ডুবায়েছে ঐ রূপের বান।
আঁধারে, আলোকে, ভূলোকে, দ্যুলোকে,
পূর্ণ তোমারি রূপের ছটা ;
তবু লুকাইতে এত আয়োজন ?—
তবু গোপনের একি এ ঘটা।
বঞ্চনা আর ক'রোনা আমায়,
আসিয়াছ যদি আবার কাছে ;
আবার শিখাও সে মহামন্ত্র,
যাহাতে মানব-জীবন বাঁচে।
আবার বিরাট ছন্দে গাঁথিয়া,
শুনাও সে গান অমিয় ভরা ;
জীর্ণ যন্ত্রে ঝঙ্কার শুনি,
পলাইয়া যা'ক্ মরণ-জরা।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বনফুল।

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নদীর উৎপত্তিস্থানের স্রোত সচরাচর কিছু প্রখর হয়। আমরা এস্থলে যে নদীর কথা উল্লেখ করিব, তাহারও স্রোত বড় প্রখর। ফেনমণ্ডিত জলরাশি গম্ভীর কলনাদ তুলিয়া তীরবেগে ছুটিতেছে; উভয় পার্শ্বস্থ উচ্চ পর্ব্বতমালার ছায়া পড়ায় জলরাশি কৃষ্ণবর্ণ প্রতীয়মান হইতেছে। নদীগর্ভের স্থানে স্থানে বিশালকায় শিলাসমূহ উন্নত মস্তকে বিরাজ করিতেছে। বেগবতী নদীর জলস্রোত ঐ সকল শিলাখণ্ডে প্রতিহত হইয়া গভীর কল্লোলে ঈষৎ উর্দ্ধে উঠিতেছে এবং পরক্ষণেই ফেনমণ্ডিত হইয়া কৃষ্ণ জলরাশির সহিত মিলিত হইয়া ছুটিয়া চলিতেছে। কৃষ্ণবর্ণ নদীগর্ভের স্থানে স্থানে ঐ সকল উৎক্ষিপ্ত জলরাশির শুভ্রতা বড়ই নয়নবিমোহন দৃশ্যের সৃষ্টি করিতেছে।

বৈশাখ মাস, বেলা অপরাহ্ণ। আকাশ কাল মেঘে ছাইয়া গিয়াছে; এখনও বৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু প্রচণ্ডবেগে ঝড় বহিতেছে। ভারতের সুবিখ্যাত একটী নদীর উৎপত্তিস্থান হইতে কিছু দূরে, প্রকাণ্ড একটী পর্ব্বতের পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র পানসি বাঁধা রহিয়াছে। পানসির ভিতর দুই বন্ধু সুরেশচন্দ্র এবং অমরনাথ ও একজন নাবিক। সুরেশচন্দ্র এবং অমরনাথ অন্য নদীটীর উৎপত্তি স্থানের সৌন্দর্য্য দেখিতে আসিয়াছিলেন। নদীগর্ভ হইতে চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিবার ইচ্ছায়, প্রায় এক মাইল পথ অগ্রসর হইয়া তাঁহারা একটী ক্ষুদ্র পান্‌সি ভাড়া করেন। পরে বেলা প্রায় ২টার সময় তাঁহারা পান্‌সি খুলিয়া স্রোতের মুখে রওনা হইয়াছিলেন,—এক্ষণে ঝড়ের ভীষণ তাড়নায় এই পর্ব্বতের পার্শ্বে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। উভয়েরই বাড়ী কলিকাতায়। স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে কিছু দিন হইল, ইঁহারা এস্থানে আসিয়া বাস করিতেছেন।

সন্ধ্যা হইল, ক্রমে রজনীর অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল। প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বন্ধুদ্বয় বড় চিন্তিত হইলেন। ভয়ে ভয়ে সুরেশচন্দ্র নাবিককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে, কেমন বোধ হচ্ছে?"

নাবিক একপার্শ্বে একখানি কম্বলের নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; সুরেশচন্দ্রের কথা শুনিয়া কম্বলখানা একটু ফাঁক করিয়া বলিল, "নৌকার গায়ে ঝড় ত তেমন লাগচে না, নৌকাটা একপ্রকার স্থির ভাবেই আছে। পাহাড়ের গায়েই ঝড়ের বেগটা আট্‌কে যাচ্ছে। কিন্তু বৃষ্টির বেগ বড় বেশী, ছই ফুঁড়ে ভিতরে জল আস্‌চে। আমি কম্বল জড়িয়ে পড়ে আছি।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন,—"তাই ত। কি কুক্ষণেই আজ বেরিয়েছিলুম।"

প্রচণ্ডবেগে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র নৌকার অভ্যন্তরে তিনটী প্রাণী স্থির নির্ব্বাক্‌—কেহ কোনরূপ শব্দ করিতেছে না। সকলেই অদৃষ্টের দোহাই দিয়া আপন আপন মনের সহিত তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়া দিয়াছে। বাহিরেও প্রকৃতির সহিত জল-ঝড়ের একটা ঘোরতর সংগ্রাম চলিয়াছে। ঝড়ের বেগ এত অধিক যে, পর্ব্বত-গাত্র হইতে বৃক্ষাদির ভগ্ন শাখা-প্রশাখা নদী-গর্ভে আসিয়া পড়িতেছিল। সহসা একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষশাখা ক্ষুদ্র তরণীর উপর আসিয়া পড়িল। প্রচণ্ড আঘাতে নৌকার ছহি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। নাবিকের একটী হস্ত ভগ্ন হইল। যুবকদ্বয়ও অঙ্গের স্থানে স্থানে অল্প-বিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। অতি কষ্টে সকলে ভগ্ন ছহির ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সহসা নাবিক চীৎকার করিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ। নৌকার নোঙ্গর উঠে পড়েচে।" যুবকদ্বয় অতিশয় ভীত হইলেন। অমরনাথ বলিলেন "নৌকা-খানা তা হলে আপনি স্রোতের মুখে ভেসে যাচ্চে নয়?"

নাবিক উত্তর করিল,—"আজ্ঞে হাঁ। হালটাও দেখ্‌চি ভেঙ্গে গেছে। আপনারা একটু সাবধানে থাকুন, নৌকা ডুবে যেতে পারে।"

ক্ষুদ্র তরণীখানি ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটিয়া চলিল। চতুষ্পার্শ্বে জলের গভীর কল্লোল শ্রুত হইতেছিল। ঘোর বিপদাশঙ্কায় প্রতি মুহূর্ত্তেই আরোহিত্রয়ের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছিল; অধিকক্ষণ কাহাকেও অপেক্ষা করিতে হইল না। সহসা একটী জলমগ্ন প্রস্তরে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া নৌকাখানি ভাঙ্গিয়া গেল। আসন্ন বিপদ উপস্থিত বুঝিয়া যুবকদ্বয় ত্রাসে গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠি-লেন। আর্ত্তস্বর বাতাসে বিলীন হইতে না হইতেই আরোহী-সমেত ভগ্ন নৌকাখানি নদীগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। নির্ম্মল বিশাল গগনপটে কুত্রাপি একখণ্ডও মেঘ দৃষ্ট হইতেছে না। চন্দ্রোদয় হইয়াছে, স্নিগ্ধ চন্দ্রকরোজ্জ্বল ধরণীর বক্ষে ক্ষুদ্র তটিনীটী আবার পূর্ব্ববৎ নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। নদীর উভয় তীরই শৈলমালা-শোভিত। একস্থানে পর্ব্বত-নিম্নে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর পতিত ছিল। প্রস্তরের পার্শ্বে নদীর জল ছল ছল করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। তদুপরি এক অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকা উপবিষ্ট ছিল; বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষের অধিক হইবে না। তাহার পরিধানে একখণ্ড ক্ষুদ্র মলিন বস্ত্র। অনাচ্ছাদিত অঙ্গের উপর চন্দ্রকিরণ পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল। আলুলায়িত কেশদাম গুচ্ছে গুচ্ছে পশ্চাতে শিলাতলে লুণ্ঠিত হইতেছিল। বালিকা একাকিনী ছিল না; তাহার উরুদেশে মস্তক রক্ষা করিয়া একটী সুন্দর যুবক নিদ্রা যাইতেছিলেন। বালিকা একদৃষ্টে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার সুন্দর মুখখানিতে লজ্জার কোনরূপ চিহ্নই প্রকাশ পাইতেছিল না। সে নীরবে উপবিষ্ট ছিল, কোনরূপ শব্দ করিতেছিল না। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউগুলি শিলাতলে এক প্রকার টপ্ টপ্ শব্দ করিতেছিল।

বহুক্ষণ পরে যুবকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া তিনি দেখিলেন, এক অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরীর ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করিয়া তিনি শয়ন করিয়া আছেন। একবার চারি চক্ষের মিলন হইল। যুবকের জ্ঞানের সঞ্চার হইতে দেখিয়া বালিকার মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সৌন্দর্য্যময়ী প্রতিমার অঙ্গে চন্দ্রকিরণ খেলা করিতেছিল। যুবক বালিকার অপার্থিব সৌন্দর্য্যরাশি দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

যুবক আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত অমরনাথ। উভয়েরই পরিহিত বস্ত্র সম্পূর্ণ আর্দ্র। অমরনাথ বুঝিতে পারিলেন, এই কিশোরীই তাঁহার রক্ষাকর্ত্রী। তিনি বালিকার হর্ষোৎফুল্ল আয়ত লোচনের দিকে চাহিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি ?"

অমরনাথের কথা শুনিয়া বালিকা ঈষৎ হাস্য করিল মাত্র, কোন উত্তর করিল না। অমরনাথ সস্নেহে বালিকার হস্ত দুটী স্বীয় হস্তে লইয়া পুনরায়

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমিই কি আমায় জল থেকে তুলেছ? আমার সঙ্গে আমার এক বন্ধু ছিলেন, তুমি তাঁকে দেখ নি?"

বালিকা আবার হাসিল। কি মধুর সে হাসিটুকু! অমরনাথের বুকের ভিতর তাড়িত খেলিয়া গেল। তিনি মুগ্ধনেত্রে বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সহসা ঊর্দ্ধে কিসের একটা শব্দ হইল। বালিকা একবার মুখ তুলিয়া চাহিল। যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। বুদ্ধিমতী বালিকা উভয় হস্তে অমরনাথকে ধরিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে দূরে সরাইয়া দিল। কিন্তু হায়, আত্মরক্ষার অবসরটুকু তাহার ঘটিয়া উঠিল না। দেখিতে দেখিতে একখণ্ড প্রস্তর পর্ব্বতগাত্র হইতে বেগে আসিয়া তাহার উপর পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটী কি গুরু পদার্থ নদীর জলে পড়িয়া নিমজ্জিত হইল। বালিকার করুণ আর্ত্তস্বর প্রত্যেক পর্ব্বতগাত্রে প্রতিধ্বনিত হইয়া বাতাসে বিলীন হইয়া গেল। আর ঐ দেখ, বালিকার পার্শ্বে অমরনাথ কঠিন প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার মুখ হইতে একটীও কথা বাহির হইতেছে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নদীর জলে সহসা একটা মানুষ ভাসিয়া উঠিল। লোকটী সন্তরণ পূর্ব্বক ক্রমে অমরনাথের নিকট তীরে আসিয়া উঠিল। চন্দ্রালোকে অমরনাথ চিনিলেন, এই তৃতীয় ব্যক্তি তাঁহারই বন্ধু সুরেশচন্দ্র। সুরেশচন্দ্রকে দেখিয়া তিনি কিছু সুস্থ হইলেন।

সৌন্দর্য্যের রাণী সরলতার মূর্ত্তি কিশোরীর দেহলতিকাখানি প্রস্তরাঘাতে হতচেতন হইয়া এখনও তাঁহারই সম্মুখে শিলাতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। হায়! যে নিজ প্রাণের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই খরস্রোতা নদীগর্ভ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল, তিনি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। এই কথা যতই অমরনাথের মনে উদয় হইতে লাগিল, ততই যেন এক অসহ্য যাতনায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। তাঁহার উভয় গণ্ড বহিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইল। তিনি বাষ্পজড়িত

কণ্ঠে সুরেশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাই সুরেশ, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে!"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "ভাই তুমি পুরুষ মানুষ; অল্পক্ষণের জন্য শোক ত্যাগ কর। এস, আগে ধরাধরি ক'রে পাথরটা সরিয়ে ফেলি।"

অনন্তর উভয়ে ধরাধরি করিয়া প্রস্তর উল্টাইয়া ফেলিলেন। হায়! বালিকার কটিদেশ এবং পদদ্বয় চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই সুকুমার দেহ কি অতবড় একটা প্রস্তরের আঘাত সহ্য করিতে পারে? অমরনাথের প্রাণের ভিতর তখন কি হইতেছিল কে বলিতে পারে? তাঁহার হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ, নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত—দেখিলে বোধ হয়, ঘোরতর মনোবিকার হেতু যেন তাঁহার বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

উভয়েই নীরব; কাহারও মুখে কথা নাই। বহুক্ষণ পরে অমরনাথ ধীরে ধীরে বালিকার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন এবং সযত্নে তাহার দেহখানি স্বীয় ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। সুরেশচন্দ্রও অমরনাথের সম্মুখে শিলাতলে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অমরনাথ একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "কেন এমন হ'ল?"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "ভাই, আমিই সব অনর্থের মূল। আমি অনেকক্ষণ জল থেকে উঠেছি। এই পাহাড়েরই চারিদিকে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। এইখানে এসেই নীচে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয়, এই আশায় ধীরে এসে উঁকি মেরে দেখ্‌ছিলুম; হঠাৎ পায়ের নীচের পাথরখানা খ'সে গেল, আমিও একেবারে নদীর জলে গিয়ে পড়লুম। তারপর যা হয়েছে, তুমি ত সব জানই? ভাই অমর, আমাকে ক্ষমা কর।"

অমরনাথ কোন কথা কহিলেন না। সুরেশচন্দ্রও অমরনাথের তৎকালীন অবস্থা বুঝিয়া আর কিছু বলিলেন না। তিনি বালিকার নাসিকাপ্রান্তে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন, তখনও ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য চলিতেছে। শুশ্রূষা করিলে এখনও বালিকার জ্ঞানের সঞ্চার হইলেও হইতে পারে, ভাবিয়া তিনি সত্বর পরিহিত বস্ত্রের এক অংশ ভিজাইয়া, নদী হইতে জল আনিলেন এবং বালিকার চক্ষে মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে বালিকার দেহখানি একবার কম্পিত হইল। অমরনাথ শিহরিয়া উঠিলেন,—পূর্ব্ববৎ জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। বালিকা ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিল।

অমরনাথ সস্নেহে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। বালিকা অতিকষ্টে হস্ত দুইখানি উত্তোলন করিয়া অমরনাথের স্কন্ধদেশে স্থাপন করিল। অমরনাথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; আবেগভরে বালিকাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। তাহার মুখে একটী মধুর হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে হাসির রেখা আর বিলুপ্ত হইল না। সব শেষ হইয়া গেল। বালিকার তুষার-শীতল দেহখানি অমরনাথের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীললিতকুমার সিংহ।

তন্ময়তা।

(১)

তুমি আমারি মোহন মুরলী
হৃদি বরজে বাজ গো,
শান্তি-সরোজ তুমি আমারি
ঊষর প্রাণে রাজ গো;
প্রাণের দৌর্ব্বল্য-লাজ গো।
তুমি আমারি আশা-প্রসূন
জীবন প্রভাতে ফুট গো,
চৈতন্য, সন্তোষ, পুলক, ভক্তি
জীবনে জাগিয়ে উঠ গো।

(২)

তুমি আমারি ঊষার সমীর
পুলক আন প্রাণে গো।
তুমি আছ অন্তরে বাহিরে
কেবা তোমারে জানে গো;
পাই তোমারে ধ্যানে গো।

স্বরগ-সুধা দৈন্যের শকতি
প্রীতির লীলা-ভূমি গো,
জীবন-পথ করিয়ে আলো
ব্যাপিয়ে থাকো তুমি গো।

(৩)

তোমারি সৌম্য মুরতি-মাঝে
কি প্রেম-সুরভি রহে গো ;
শ্রান্ত হৃদয়ে মধুর-বাণী
পাপিয়া তান বহে গো ;
তুমি আমারি জাহ্নবী-যমুনা-
মিলিত প্রয়াগ-ক্ষেত্র গো,
কি স্বর্গ সুন্দর জাগে প্রাণে
হেরি ও মুগধ নেত্র গো।

(৪)

আঁধার জীবনে জ্ঞান-সবিতা
প্রেমের রশ্মি ঢালো গো ;
আঁধার পরাণে জীবন-ইন্দু—
শত-দীপ স্নিগ্ধ জ্বালে গো
নিরাশা কর আলো গো।
জড়িয়ে থেকো ছেড়ো না আমায়
আমি যে তোমারি গো ;
তোমারে চাই জীবনে মরণে—
তুমি যে আমারি গো।

শ্রীসারদাচরণ চৌধুরী।

পূজার তত্ত্ব।

(গল্প)

জগৎ-জননী, ত্রিতাপহারিণী, মহামায়ার সপ্তমী পূজার দিন, অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময়, নবীন বাবুর অন্তঃপুরসংলগ্ন একটী কক্ষে মহিলাগণের মজ্‌লিস বসিয়াছে। গৃহিণী ওরফে নবীন বাবুর স্ত্রী মজ্‌লিসের নেত্রী, আর কয়েকজন প্রতিবাসিনী, নবীন বাবুর একমাত্র পুত্রবধূ সরলা এবং কয়েকজন চাক্‌রাণী এই মজলিস্‌-গল্পের শ্রোত্রী।

গৃহিণী বলিলেন—"হ্যাঁ লো পুঁটী, তোর বড়দিদির জন্য এবার পূজার সময় কি তত্ত্ব পাঠালে?"

পুঁটী। বড়দিদির তত্ত্ব আন্‌তে, পূজোর আগে বাবা কল্‌কেতায় গিয়েছিলেন। অনেক টাকা খরচ ক'রে, এবার তত্ত্ব পাঠিয়েছেন। বড়দিদির শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ বড়ই কড়া মেজাজের লোক; তত্ত্ব কম দেখ্‌লে দিদিকে আস্ত রাখবে না। তাই দেখে শুনে বাবা মনের মতন তত্ত্ব পাঠিয়েছেন।

গৃহিণী। ওগো ছোট বৌমা, তোমার বাপের বাড়ী থেকে, এবার কি কি জিনিষ এলো?

ছোট বৌ। অন্যান্য বছর দুর্গাপূজার সময় যেরূপ তত্ত্ব আস্‌তো, এবার তার চেয়ে খুব বেশী। এবার দাদা বি, এ, পাশ ক'রে, নিজের বুদ্ধিমতে ভগ্নীকে তত্ত্ব পাঠিয়েছেন।

গৃহিণী। হেমা, তোর ন'দিদির পূজোর তত্ত্ব কিরূপ গেলো?

হেমা। অপর্য্যাপ্ত! মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত, কোনখানে বাদ যায় নি। কিবা খাবারের ঘটা, কিবা পর্‌বার ঘটা। পাকা দুটীশো টাকা খরচ করে, কাকাবাবু তত্ত্ব পাঠিয়েছেন। নইলে ন'দিদির শ্বশুর বলেন, আবার ছেলের বিয়ে দেবো। পছন্দসই তত্ত্ব না হলে, দিদিকে শ্বশুরবাড়ী টিক্‌তে হতো না।

গৃহিণী। ওগো সুধার মা, তোমার বড় বউয়ের বাপের বাড়ী থেকে কি কি তত্ত্ব এলো?

সুধার মা। নিতান্ত মন্দ নহে। কতবার বল্‌তে বল্‌তে, এবার মহাশয়েরা কিছু-টাকা খরচ করে পাঠিয়েছেন। গত বছোর পূজোর তত্ত্ব ফিরিয়ে দিয়ে,

এবার একটু ভালরূপ পেয়েছি। ভাই! বউয়ের মা বাপগুলো আজ কাল বড় কৃপণ হয়েছে, যেমন রোগ, তেমনি ওষুধ দিলে রোগ আরোগ্য হয়।

গৃহিনী। মাসীমা ! সেজো বউয়ের বাপের বাড়ী থেকে কি তত্ত্ব এলো ?

মাসীমা। বল্‌বো কি মা দুঃখের কথা, কতবার মুখ ঝুক্‌ করে, তত্ত্ব ফিরিয়ে দিয়ে, এবার একরূপ ভদ্রলোকের বাড়ী পাঠানরূপ পেয়েছি। মোটের উপর সেজো বৌয়ের মা বেটী কৃপণের ধাড়ি, আমিও সেইরূপ করি আড়ি; এবার তত্ত্ব এসেছে খুব তাড়াতাড়ি; মনের মতন মন ভুলান সাড়ী; দিয়েছে স্বামীসোহাগী চুড়ি; পাঠিয়েছে বেয়ান মেয়ের বাড়ী।

গৃহিনী। মা দুর্গার আগমনে, এ বৎসর তোমাদেরই পোয়াবারো। চারু, তোদের রাধারাণীর জন্য কি পাঠান হ'লো ?

চারু। জ্যেঠাইমা, দুঃখের কথা বল্‌বো কি! রাধারাণীর সৎশাশুড়ী ঠাক্‌রুণ পুজোর আগে পত্র লিখেছিলেন, এবার একটী কলের গান না পাঠালে তত্ত্ব ফিরিয়ে দেবেন। দাদা তাই দেখে শুনে, দেড়শো টাকার কল ও অন্যান্য ন্যায্য তত্ত্ব পাঠিয়েছেন। কালে কালে দেশের দশা হ'লো কি ? হ্যাঁ জ্যেঠাইমা, তোমার বউয়ের বাপের বাড়ী থেকে কি কি তত্ত্ব এলো ?

গৃহিনী। (মুখ অন্ধকার করিয়া) এখনও মহাপ্রভুদের সাড়া হয় নি। আজ মা জগদম্বার সপ্তমী পূজো, কোন তত্ত্ব ত বাড়ীতে আস্‌তে দেখলুম না ত ?

চারু। (সরলাকে লক্ষ্য করিয়া) হ্যাঁ বৌ, তোমার বাপ এ পুজোর সময় তত্ত্ব পাঠাবেন না ?

সরলা কিছু অপ্রতিভ হইয়া, অস্ফুট স্বরে বলিল,—"গরিব লোক, না পাঠালেও পারেন।"

গৃহিনী মুখখানি কেলেহাঁড়ির তলার মতন করিয়া, ব্যঙ্গ ভাবে কহিলেন, "গরিব আছে ত আমার ব'য়ে গেলো। যদি তত্ত্ব পাঠাতে অপারগ হয়, তবে আঁতুড় ঘরে নুন খাইয়ে, মেয়েকে মেরে ফেলে নি কেন ?

শাশুড়ীর কথা শুনিয়া, সরলার রক্তিম বদনখানিতে ভয়ঙ্কর বিষাদের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল।

গৃহিনী বলিতে লাগিলেন—সম্বৎসর অন্তে আজ একটী মহা আনন্দের দিন। এ দিনে যে বেটা না খেতে পায়, সেও পাঁচ দুয়ারে ভিক্ষে করে এনে, জামাই বাড়ীতে তত্ত্ব পাঠিয়ে দেয়। দেবার মনন থাক্‌লে, কতরূপে দেওয়া যায়।

এমন সময় একজন চাকর আসিয়া সংবাদ দিল,—“শচীন্দ্র বাবুর শ্বশুর বাড়ী থেকে তত্ত্ব এসেছে।”

মহিলা-মজ্‌লিসটী আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল। কেহ বলিল, গরিব হোলে কি হয়, ভদ্রলোক ত! কেহ বলিল, একটী বৎসর পরে কিছু খরচ না করলে লোক-সমাজে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে। কেহ বলিল, বৌয়ের বাপ্ অতি সরল প্রকৃতির লোক! ইত্যাদি নানারূপ বক্তৃতা হইয়া, সরলার পিতাকে অতি উচ্চে,—উচ্চতর স্থানে আসন প্রদান করা হইতেছিল।

সরলার পিত্রালয় হইতে যাহারা তত্ত্ব লইয়া আসিয়াছে, প্রথমেই বহির্ব্বাটীতে তাহাদের সহিত নবীন বাবুর সাক্ষাৎ হইয়াছে। নবীন বাবু তত্ত্বের অবস্থা দেখিয়া, বাহিকাদ্বয়কে বলিলেন, “এখানে রাখ্‌লে কেন, বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যাও!”

তত্ত্ব-বাহিকাদ্বয় তত্ত্ব লইয়া, অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং মহিলা-মজ্‌লিসের সম্মুখে গিয়া তত্ত্ব রাখিয়া দিল।

গৃহিনী একদৃষ্টে তত্ত্বের দিকে চাহিয়া, মুখখানি ফিরাইয়া লইয়া, ক্ষণকাল পরে গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “কোথা থেকে তত্ত্ব আন্‌লে?”

বাহিকা-দ্বয়। তোমার ছেলের শ্বশুরবাড়ী থেকে।

গৃহিনী। তারা আছে—না—গেছে?

বাহিকা-দ্বয়। ও কি কথা মা ঠাক্‌রুণ? না থাক্‌লে আমরা এ তত্ত্ব আন্‌লুম কোথা থেকে!

গৃহিনী অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, এরূপ তত্ত্ব মরা মানুষে দিয়ে থাকে। ওগো পাড়া-প্রতিবাসীরা, তোমরা দেখ দিকিন, এমন তত্ত্ব কোন্ বেটা পাঠিয়ে থাকে? এর চেয়ে না পাঠালেই ত বেশী মান থাক্‌তো। (সরলাকে লক্ষ্য করিয়া) ওগো বউ ঠাক্‌রুণ, দেখ তোমার বাপ কত টাকা খরচ ক'রে তত্ত্ব পাঠিয়েছে। আক্কেলটা একবার দেখে নাও?

বামার মা সরলার দিকে চাহিয়া বলিল,—তাই ত বউমা, তোমার বাপের কি জ্ঞান নেই? মেয়ে জামাইয়ের দুই যোড়া করিয়া কাপড়, একটী মেয়ের একটী জামাইয়ের জামা, জামাইয়ের একযোড়া জুতা, একথান সিন্দুর, একথালা সন্দেশ,—আর তোমার শাশুড়ীর একখানি সস্তা সাড়ী—এই হ'ল কি তত্ত্ব গা?

মহিলা-মজ্‌লিস্‌টী, সরলাকে টিট কারী এবং আগন্তুক বাহিকাদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ ব্যঙ্গ করিতে লাগিল।

গৃহিণী চক্ষুদ্বয় আরক্তিম করিয়া, বাহিকাদিগকে বলিলেন, তোমরা এ তত্ত্ব ফিরিয়ে নিয়ে যাও? আমি যদি আবার ছেলের বিয়ে দিতে পারি, তবে ঢের ঢের তত্ত্ব পাব।

বাহিকারা বলিল, "গরিবলোক, এর বেশী সাধ্য হয় না। ক্ষমতা নিয়ে কথা মা ঠাকুরুণ?"

গৃহিণী। তোদের বেশী বচন ঝাড়্‌তে হবে না। যে পথে এসেছিস্‌, সেই পথে চলে যা। প্রভুদের বলিস্‌, আবার ছেলের বিয়ে দেবো। তাদের মেয়ের উপায় তারা যেন করে।

মজ্‌লিস্‌টী শুদ্ধ গৃহিণীর পক্ষ সমর্থন করিল। সকলেই বাহিকাদ্বয়কে ভর্ৎসনা করিতে করিতে, তুমুল কোলাহল উপস্থিত করিল।

ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত গৃহিণী বলিলেন, "ওরে হ'রে, মাগী দুটোকে গলা ধরে বের করে দে ত? আর এ তত্ত্ব—না—ফত্ত্ব, রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে আয়?"

বাহিকাদ্বয় গৃহিণীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধান্তঃকরণে তত্ত্ব ফিরাইয়া লইবার জন্য উদ্যোগী হইল। অন্তঃপুর হইতে আসিবার সময় বলিল—"ওগো গিন্নী ঠাকুরুণ, যদি কখনও মেয়ে বিয়োও, সেই সময় এ অপমানের প্রতিশোধ পাবে; বড়,—ছোট হতে বেশীদিন লাগে না। বিধাতা এর বিচার কর্‌বেন।"

এই বলিয়া তত্ত্ববাহিকাদ্বয় চলিয়া গেল। গৃহিণী এবার সরলাকে লক্ষ্য করিয়া, তাহার পিতৃবংশ নির্ব্বংশ হইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সরলা যাহাতে মনোবেদনা পায়, তাহাই বলিতে লাগিলেন। একে একে প্রতিবাসিনীরা সকলেই সরলার পিতৃনিন্দা করিয়া মজ্‌লিস ভঙ্গ করিল। একাকিনী সরলা বসিয়া রহিল।

চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া সরলা, অভয়ার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিল—মা দশভুজা, সম্বৎসরান্তে তোমার স্নেহের পুত্র-কন্যাদিগকে স্নেহ বিতরণ লালসায় এ বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণা হইয়াছ। মা দুর্গতিনাশিনি, আমি কি তোমার সন্তান নই? তোমার আগমনে, আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয়, জ্বলে পুড়ে খাক্‌ হয়ে যাচ্ছে! মা গো, তুমি ত সতী রমণীর সাধনার সামগ্রী তবে জগদম্বে, এ হতভাগিনীর উপর বিরূপ হ'লে কেন? মা মহামায়া, আর কখনও যদি এ বঙ্গভূমিতে এস, তবে আমার মত ক্ষুদ্রা বালিকাকে প্রাণে মারিও না। মা শঙ্করি, দীর্ঘ একটী বৎসর পরে তোমায় পাইয়া, এ হতভাগিনী তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ

কর্‌লো ? তনয়ার দোষ ক্ষমা ক'রো। শাশুড়ীর তীব্র কটূক্তি শ্রবণ আমার পক্ষে প্রাণান্তকর না হ'লেও বাপ মায়ের—বিশেষতঃ একমাত্র ছোট ভা'য়ের নিপাত-কামনা—পিতামহ প্রভৃতির নামে অভিশম্পাত আর সহ্য করিতে পারি না। তনয়ার দোষ ক্ষমা কর মা! মা অম্বিকে! তোমার "পূজার তত্ত্ব—এই ক্ষুদ্র প্রাণ" ঐ অলক্তকরঞ্জিত শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলাম। দাসীর সামান্য উপহার সাদরে গ্রহণ কর!

গিরিজায়ার সপ্তমী পূজার দিন, দ্বিপ্রহর রজনীর সময় উদ্বন্ধনে, সরলা পূজার তত্ত্বের গঞ্জনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র দাস কাব্যবিনোদ।

বিরহে।

তুমি আমারে ছাড়িয়া সুদূর প্রদেশে
জানি না রয়েছ কেমনে
হৃদয় বাঁধিয়া পাষাণে!
আমি আর যে পারি না সহিতে যাতনা,
প্রাণ জ্বলে যেন আগুণে,
মরম বেদন-দাহনে।
তুমি দুদিনের তরে কেন ওগো প্রিয়া
কলকণ্ঠ স্বরে গাহিলে ?
হৃদি কেন মোর নাচালে ?
আমি এবে যে গো দেখি আঁধার জগৎ
নয়ন তুলিয়া চাহিলে!
একি দশা মোর করিলে ?
তুমি হাসি-ভরা মুখে এস কাছে এস,
থেকনা'ক আর ভুলিয়া ;
দেখ এসে আঁখি মেলিয়া,—
আমি এসেছি পূজিতে বিভুর চরণ
অমল কমল তুলিয়া,
তোমার মিলন মাগিয়া।

শ্রীললিতকুমার সিংহ।

আশ্রম।

আশ্রম বলিলে আপাততঃ আমরা কি বুঝিতে পারি, এ বিষয়ে অনেকেই অনেক মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র যাহা মানবের অথবা প্রাণী-মাত্রের মানস-পটে সমুদিত হয়, উহাই সেই শব্দের অর্থ। আশ্রম শব্দ উচ্চারিত হইলেই তপোবন-বাসী মুনিঋষিদিগের নাতিক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীর আসিয়া আমাদের চিত্তপটে আন্দোলিত হইতে থাকে, সুতরাং আমরা বুঝি—মুনিঋষিরা তপোবনে গমনপূর্ব্বক যে স্থানে বসিয়া তপস্যাচরণ করিয়া থাকেন, সেই পর্ণময় কুটীরই আশ্রম নামে অভিহিত; অর্থাৎ মুনিঋষিদিগের বাসস্থানের নামই আশ্রম। যথা—কপিলাশ্রম, ভরদ্বাজাশ্রম ইত্যাদি। আমাদের এ মতে মুনিঋষিগণেরই আশ্রম-সম্ভাবনা, অন্যের নহে; অথচ শাস্ত্রে বিবিধ আশ্রমের কথাই দেখা যায়। তবে আশ্রম শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? যা হ'ক্, একবার আশ্রম শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যা'ক্, বিশেষ কিছু পাওয়া যায় কি না?

আ শ্রাম্যন্তি স্বং স্বং তপঃ সম্যক্ চরন্তি অত্র ইতি আশ্রমাঃ। আ-শ্রম+অল্।

যে স্থানে থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে নিজ নিজ তপস্যাচরণ করিতে পারা যায়, তাহাকে আশ্রম কহে। অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে স্বীয় কর্ত্তব্য পালনরূপ তপস্যাচরণ করেন, উহাকেই তাঁহার আশ্রম বলিয়া অভিহিত করা হয়। সুতরাং আশ্রমটা কেবল মুনি-ঋষিদিগেরই একচেটিয়া নহে, উহা সর্ব্বসাধারণেই প্রয়োজ্য; তাই শাস্ত্রে উহার নানাত্ব উক্ত হইয়াছে।

চত্বারঃ আশ্রমাঃ—ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ-পরিব্রাজকাঃ। বশিষ্ঠ।

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও পরিব্রাজক; অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও ভিক্ষাশ্রম এই চারিটী আশ্রম।

উপনয়নের পর জিতেন্দ্রিয় হইয়া গুরুগৃহে বাস ও অঙ্গের সহিত সমগ্র বেদাধ্যয়ন করিতে হয়, ইহারই নাম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া দারপরিগ্রহান্তে স্বধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক গৃহস্থ হইতে হয়, এই আশ্রমের নাম গার্হস্থ্য।

গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পুত্রোৎপাদনানন্তর বনে বাস অকৃষ্টপচ্য * ফলাদি ভক্ষণ ও ঈশ্বরের আরাধনা, ইহাই বানপ্রস্থ।

গৃহাদি সর্ব্ববস্তু পরিত্যাগানন্তর মুণ্ডিত মস্তকে কৌপীন পরিধান করিয়া দণ্ড ও কমণ্ডলু গ্রহণপূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, নির্জ্জন প্রদেশে বা তীর্থাদিতে বাস এবং একমাত্র পরমেশ্বরের আরাধনা, ইহারই নাম ভিক্ষাশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রম।

ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা। জাবালোপনিষৎ।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, তাহার পরে বনবাসী হইবে, পরিশেষে প্রব্রজ্যা অর্থাৎ ভৈক্ষ্য অবলম্বন করিবে। অথবা বিরক্ত হইলে যে কোন আশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে।

এই চারিটী আশ্রমের মধ্যে 'গার্হস্থ্য' আশ্রমই আমাদের প্রস্তুত বিষয়; সুতরাং আশ্রমান্তরের বিষয় এ প্রবন্ধে বিশেষ সমালোচ্য নহে।

বেদাধ্যয়নাদি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সমাপনান্তে গুরুদেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। প্রাচীন মুনিঋষিগণ গৃহস্থাশ্রমই আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া যথাশাস্ত্র দার পরিগ্রহ করিতে হয়। অন্যথা তিনি গৃহী নামে আখ্যাত হইবার যোগ্য হয়েন না।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।

হলায়ুধ।

গৃহ হইলেই তাহাকে গৃহ বলা যায় না, গৃহিণীই গৃহ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ গৃহিণী ব্যতীত গৃহ গৃহনামের অযোগ্য—সংসারীর বিড়ম্বনা মাত্র।

ন তদ্‌গৃহং যত্র বধূবিবর্জ্জিতম্। নারদ।

দেবর্ষি নারদ কথা-প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন যে, যে গৃহ বধূ-বিবর্জ্জিত অর্থাৎ যে গৃহে বধূ নাই, সে গৃহ গৃহই নয়। সুতরাং—

গৃহেষু দারেষু তিষ্ঠতি অভিরমতে যঃ সঃ গৃহস্থঃ। গৃহ-স্থা+ড।

শাস্ত্রানুসারে দার পরিগ্রহ করিয়া যিনি গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনিই প্রকৃত গৃহস্থ। উদাসীন ও সাধক ভেদে গৃহস্থ দ্বিবিধ, যথা—

* স্বভাবতঃ উৎপন্ন।

উদাসীনঃ সাধকশ্চ গৃহস্থো দ্বিবিধো ভবেৎ।
কুটুম্বভরণে যুক্তঃ সাধকোঽসৌ গৃহী ভবেৎ।
ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য ত্যক্ত্বা ভার্য্যাধনাদিকম্।
একাকী বিচরেদ্‌যস্তু উদাসীনঃ স মৌক্ষিকঃ॥

গরুড়-পুরাণ।

গৃহস্থ দুই প্রকার; উদাসীন ও সাধক। কুটুম্বভরণে অর্থাৎ আত্মীয় পরিজনাদির ভরণপোষণে তৎপর গৃহী—সাধক এবং ঋণত্রয় * পরিশোধ পূর্ব্বক ভার্য্যা ও ধনাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষমার্গাবলম্বী একাকী বিচরণকারী—উদাসীন নামে আখ্যাত।

সমাপ্যাহ্নিককর্ম্মাণি স্বাধ্যায়ং গৃহকর্ম্ম বা।
গৃহস্থো নিয়তং কুর্য্যান্নৈব তিষ্ঠেন্নিরুদ্যমঃ॥ তন্ত্রশাস্ত্র।

গৃহস্থ আহ্নিক কৃত্য সমাধা করিয়া বেদাধ্যয়ন বা গৃহকর্ম্ম করিবে। কদাপি নিরুদ্যম অবস্থায় অবস্থান করিবে না।

পরস্বে পরদারেচ ন কার্য্যা বুদ্ধিরুত্তমৈঃ।
পরস্বং নরকায়ৈব পরদারাশ্চ মৃত্যবে॥ বামনপুরাণ।

বুদ্ধিমান্ গৃহস্থ ব্যক্তি পরধনে বা পরদারে কদাচ অভিলাষ করিবে না। যে হেতু পরস্বাপহারীর নরক ভোগ ও পরদারগামীর মৃত্যু অনিবার্য্য।

অধীত্য বেদান্ কৃতসর্ব্বকৃত্যঃ
সন্তানমুৎপাদ্য সুখানি ভুক্ত্বা।
সমাহিতঃ প্রচরেদ্দুশ্চরং যো
গার্হস্থ্যধর্ম্মং মুনিধর্ম্মজুষ্টম্॥ মহাভারত।

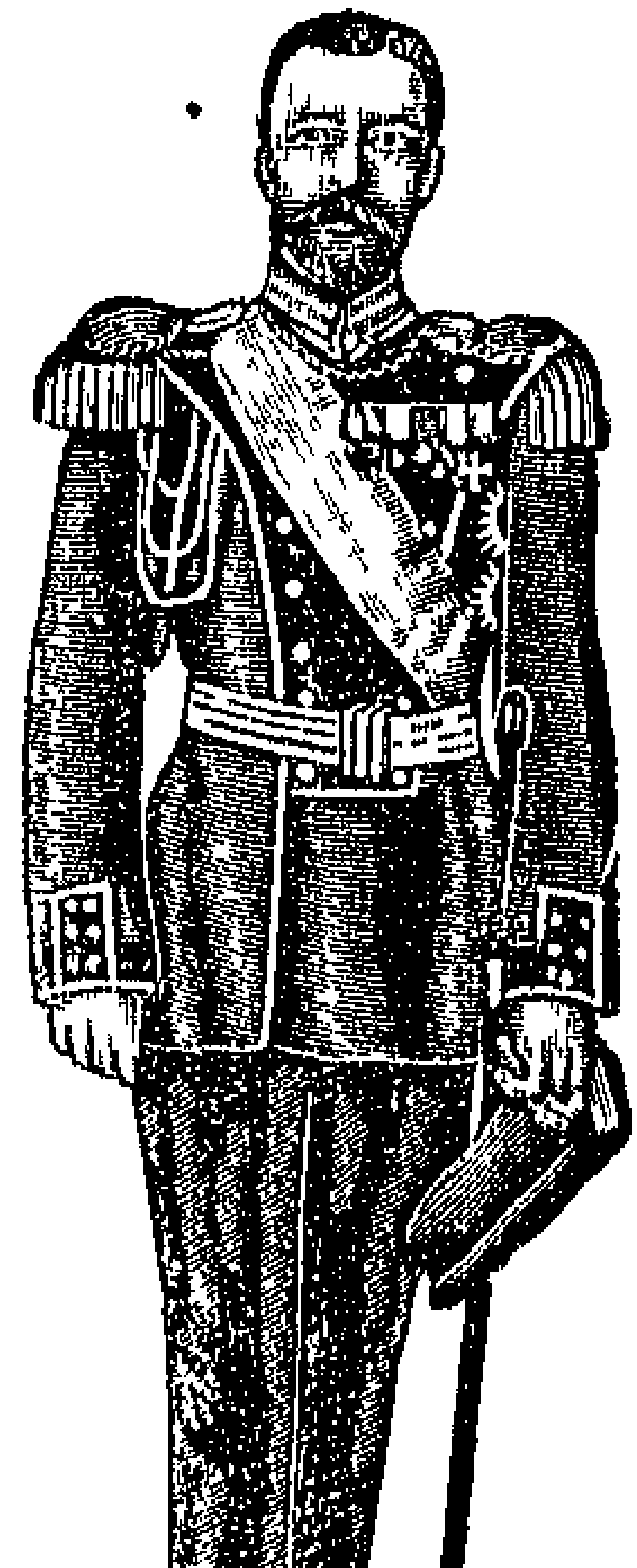
যে গৃহী বেদসকল অধ্যয়নপূর্ব্বক গৃহোচিত কার্য্যসকল সম্পাদন করিয়া, সন্তান উৎপাদনানন্তর যথারীতি সুখভোগ করিয়া সমাহিত অর্থাৎ যোগযুক্ত হইয়া মুনিদিগের ধর্ম্মাদি দ্বারাও সেবিত দুস্তর গৃহস্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর থাকেন, তিনি সর্ব্বথা মোক্ষলাভে সমর্থ হয়েন।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যের সহিত গৃহস্থাশ্রমের কোনরূপ বিরোধ হইতে পারে না, প্রত্যুত উপকারই সাধিত হইয়া থাকে।

* দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ।



জর্ম্মণ "সম্রাট্।"



রুষিয়ার "জার"।

বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—ইহাদের উভয়ের মধ্যে পরস্পর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে এবং ইহাদের সহিত গার্হস্থ্য আশ্রমের বিরোধও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব এই আশ্রমত্রয়ের মধ্যে কোনটী ভাল—সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয়, তৎসম্বন্ধেই যথাকথঞ্চিৎ সমালোচনা পূর্ব্বক আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বান-প্রস্থ ও সন্ন্যাস—দুইটী আশ্রম হইলেও পরস্পর প্রভূত সাদৃশ্য থাকায়, বিশে-ষতঃ গৃহস্থাশ্রমের প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে বর্ত্তমান বলিয়া আমরা ইহাদিগকে একটী নামেই আখ্যাত করিব।

সন্ন্যাসাশ্রম ও গৃহস্থাশ্রম;—উভয়ের মধ্যে কোনটী ভাল? সংসার কর্ম্মক্ষেত্র, কর্ম্ম করিতেই সংসারে আসা। তুচ্ছ জীবনের আশঙ্কায় যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়নপূর্ব্বক চিরদিনের জন্য নির্জ্জন পর্ব্বত-গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করা ভাল, না বীরোচিত পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধে জয়লাভ করা বা পরা-জিত হইয়া অকালে কাল-কবলে পতিত হওয়াই ভাল, ইহার প্রকৃত উত্তর কি? এ যে বিষম সমস্যা!

সন্ন্যাসিগণ এই ধর্ম্মক্ষেত্র সংসার-রূপ সমরক্ষেত্রে বিবিধ বাধা-বিপত্তির ভয়ে ভীত বলিযাই ত স্ত্রী-পুত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন বেশে একটী নূতন মূর্ত্তি ধারণ করেন। এবং দেহস্থ ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি সমূলে বিনষ্ট করিয়া, বিশেষতঃ যাহাতে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল সমধিক উত্তেজিত হইতে পারে, তাদৃশ প্রলোভনপূর্ণ উত্তেজক রাজ্য হইতে দূরে—অতিদূরে থাকিয়া জিতেন্দ্রিয় নাম ধারণানন্তর সন্ন্যাস নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীরা পুত্রকলত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া (দূরে রাখিয়া) অর্থাৎ চর্ম্ম-চক্ষুর অন্তরাল করিয়া বিজন বনে অবস্থান পূর্ব্বক ভগবদারাধনায় মনোনিবেশ করেন; কারণ পুত্রকলত্রাদি তপোঽনুষ্ঠানের অন্তরায় স্বরূপ, সুতরাং তাহাদিগকে চর্ম্ম-চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া কার্য্য করাই যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু তাহারা জ্ঞান-চক্ষুর অন্তরাল হয় কি? যদি তাহাই না হইল, তবে আর গৃহ ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাওয়া কেন? বরং উহাদিগকে চর্ম্ম-চক্ষুর সমীপে রাখিয়া যাহাতে জ্ঞান-চক্ষুর অন্তরাল করা যায়,—নিকটে থাকিলেও মনো-বিকার উপস্থিত না হয়, তাহা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অন্যথা পুরুষত্বের পরিচয় কি হইল? মহাকবি কালিদাস জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন ঃ—

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে—
যেষাং ন চেতাংসি তএব ধীরাঃ।

অর্থাৎ বিকারের কারণ বর্ত্তমান থাকিতেও যাঁহাদের অন্তঃকরণে বিকৃতি-ভাব উপস্থিত না হয়, তাঁহারাই যথার্থ ধীর—জ্ঞানী।

এই কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে আসিয়া সাধারণ কারণে ভীত হইয়াই যদি পলায়ন করিতে হয়, তবে আর সংসারে আসা কেন? জীব কর্ম্ম করিব বলিয়াই ত কর্ম্মক্ষেত্রে আগমন করে, কর্ম্ম করিতে হইলে যে কোন রূপেই হউক, ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইবেই হইবে। সমুদ্র-মধ্যে যাতায়াত করিতে হইলে তাহার উত্তাল তরঙ্গমালায় নিপতিত হওয়া ত অবশ্যম্ভাবী, তবে যদি কাহারও ভাগ্যবলে তরঙ্গ তখন উপস্থিত না হয়, কিন্তু এরূপ লোক কয় জন? তাই সকলেই যদি ভীত হইয়া সন্ন্যাসীর সাজে সাজিয়া বসিত, তাহা হইলে সংসারের অবস্থা কি হইত?

যে মহাপুরুষগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অমিত বিক্রমে যাবতীয় বাধা-বিপত্তির মস্তকে সদর্পে পদাঘাত করিয়া সংসারে জয়লাভ করেন, তাঁহারা কি পলায়নপর ভীরু সন্ন্যাসিগণ অপেক্ষা সমধিক প্রশংসা-ভাজন বা শক্তিশালী নহেন? পক্ষা-ন্তরে শত্রু-কবলে নিপতিত হইলেও তাঁহারা ইঁহাদের অপেক্ষা প্রশংসার পাত্র, সন্দেহ নাই।

পাঠকবর্গ এরূপ মনে করিবেন না যে, আমরা সন্ন্যাস আশ্রমটা "কিছু না" বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিতেছি; আমরা বলিতেছি, একমাত্র সন্ন্যাসই মানবের ধর্ম্মপথ নহে, উহা ধর্ম্মপথের একটী ক্ষুদ্রতম শাখাবিশেষ, পথটী বড়ই সঙ্কীর্ণ—প্রশস্ত নহে। গৃহস্থাশ্রমই প্রশস্ত রাজমার্গ, তবে রাজমার্গে গমনাগমন করিতে হইলেই বিশেষ সাবধান হইতে হয়, অন্যথা বিপদা-পদের ঘাতপ্রতিঘাতে সংসারীকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। গৃহস্থকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরিণামে এমন কি নরকের কীট অপেক্ষাও নিকৃষ্টতম হইতে হয়। তাই ভয়ে দু'এক জন এই সঙ্কীর্ণ পথের পথিক হইয়া থাকেন।

ভূমৌ মূলফলাশিত্বং স্বাধ্যায়স্তপ এব চ।
সংবিভাগো যথান্যায়ং ধর্ম্মোহয়ং বনবাসিনঃ॥

গরুড়পুরাণ।

ভূমিতে শয়ন, ফলমূল ভোজন বেদাধ্যয়ন, তপস্যাচরণ এবং ন্যায়ানুসারে সংবিভাগ, ইহাই বনবাসীর ধর্ম্ম।

ন চ পশ্যেৎ মুখং স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠেৎ তৎসমীপতঃ।
দারবীমপি যোষাঞ্চ ন স্পৃশেদ্ যঃ স ভিক্ষুকঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

ভিক্ষুক ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগের মুখ দর্শন করিবেন না, দারবী অর্থাৎ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত স্ত্রী-পুত্তলিকাকেও স্পর্শ করা ভিক্ষুকের পক্ষে একান্ত অকর্ত্তব্য।

তপসা কর্ষিতোঽত্যর্থং যস্তু ধ্যানপরো ভবেৎ।
সন্ন্যাসীহ স বিজ্ঞেয়ো বানপ্রস্থাশ্রমে স্থিতঃ॥

গরুড়পুরাণ।

বানপ্রস্থাশ্রমে অবস্থিত যে ব্যক্তি তপস্যাদ্বারা দেহ ও মনকে সাধনায় আকৃষ্ট করিয়া পরমেশ্বর-চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, তাঁহাকেই সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। ইত্যাদি বহু প্রমাণদ্বারা জানা যায় যে, সন্ন্যাসিগণ যথেষ্ট কঠোর সাধনা করেন। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমী কি উঁহাদের অপেক্ষা অধিক কঠোর সাধনা করেন না?

মহর্ষিপিতৃদেবানাং গত্বানৃণ্যং যথাবিধি।
পুত্রে সর্ব্বং সমাসজ্য বসেন্মধ্যস্থমাশ্রিতঃ॥

মনু।

বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ, পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ এবং যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবঋণ হইতে যথাবিধি মুক্ত হইয়া, পরিবারাদি ভরণ-পোষণের সমুদায় ভার উপযুক্ত পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া, স্ত্রী-পুত্র ও ধনাদিতে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক মধ্যস্থভাবে গৃহেই অবস্থান করিবে ইত্যাদি। ইহা কি সামান্য কঠোর সাধনা!

সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও যিনি—প্রতিশ্রুতি পালনের নিমিত্ত সম্পূর্ণ রাজত্ব দানে পরাঙ্মুখ হন নাই; অবশেষে স্ত্রী, পুত্র—এমন কি আপনাকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াও প্রতিশ্রুত ঋণ পরিশোধে তৎপর হইয়াছেন।—

যাঁহারা স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া স্বহস্তে সংসারের একমাত্র অবলম্বন প্রিয়তম পুত্ররত্নের মস্তক ছেদন করিয়াও স্বীয় কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে বিমুখ হন নাই।—

স্বীয় শিশু সন্তানগণ ধূল্যবলুণ্ঠিত গাত্রে—যাঁহার চারিদিকে পড়িয়া ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, এবং ঘোর আর্ত্তনাদে এমন কি প্রতিবাসীদিগেরও কর্ণবিবর বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে; সুযোগ বুঝিয়া মহাজনগণও

তখন প্রচণ্ড রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাক্যানলে বেচারাকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে, জীর্ণগৃহের অন্তরালে থাকিয়া এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়াও পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক যে রমণীরত্ন মূর্তিমতী দেবীর ন্যায় অচল অটল ভাবে দুর্গতিনাশিনী মাতা জগদম্বার পাদ-পদ্মে পতির মঙ্গল কামনায় কাশ্রাতিপাত করিতেছেন; এতাদৃশ ভয়াবহ দৃশ্যের মধ্যে থাকিয়া—দারিদ্র্যের এ হেন সর্ব্বগ্রাসী বিসদৃশ কবলে পতিত হইয়াও যিনি স্বীয় কর্ত্তব্যের ব্যবস্থায় সততই যত্নপর হইতেছেন, এবং মনের আবেগে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতভাবন ভবানীপতির চরণ-কমলে করযোড়ে হৃদয়ের ব্যথা জানাইতেছেন; ইঁহারা কি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী-দিগের অপেক্ষা অতি কঠোর তপঃসাধন করেন নাই? তবে আর গৃহী অপেক্ষা বনী বা সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ, এ কথা কেমন করিয়া বলা যায়; বরং আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, প্রাচীন মুনিঋষিগণ ইহাই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডে উক্ত হইয়াছে ঃ—

সর্ব্বাশ্রমাণামধিকো গৃহাশ্রম উদাহৃতঃ।
যস্মাত্তস্মিন্ সমায়ান্তি ভিক্ষার্থমাশ্রমাশ্রয়ঃ॥

সমস্ত আশ্রমের মধ্যে গৃহাশ্রমই শ্রেষ্ঠ, যে হেতু অপরাপর আশ্রমস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই ভিক্ষার নিমিত্ত এই গৃহাশ্রমেই উপস্থিত হইয়া থাকেন।

আশ্রমাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং গার্হস্থ্যং নাত্র সংশয়ঃ॥

মহাভারত।

আশ্রমসকলের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমই শ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তেষাং গৃহস্থো যোনিরপ্রজনত্বাদিতরেষাম্।

গৌতম।

আশ্রম সকলের মধ্যে গৃহস্থই যোনি (মূল কারণ), কেননা অন্য সকল আশ্রম প্রজাশূন্য।

বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব তথা দ্বিজঃ।
গৃহস্থস্য প্রসাদেন জীবন্ত্যেতে যথাবিধি॥
গৃহস্থ এব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ।
দাতা চৈব গৃহস্থঃ স্যাৎ তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী॥

শঙ্খ।

বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, যতি এবং দ্বিজগণ, ইঁহারা সকলেই গৃহস্থের কল্যাণে যথোচিতরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। গৃহস্থই যাগ যজ্ঞ করেন, গৃহস্থই তপস্যা করেন এবং গৃহস্থই দাতা হইয়া থাকেন, এই সকল কারণে গৃহস্থাশ্রমীই সকল আশ্রমীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইত্যাদি বহু প্রমাণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, প্রবন্ধ-বাহুল্য-ভয়ে আর অধিক প্রদর্শিত হইল না।

অতএব দেখা যায় যে, সকল প্রকারেই গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইল। এখন আশ্রমোচিত ধর্ম্মের সামান্য একটুকু আভাস মাত্র দিয়াই আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

অগ্নয়োঽতিথিশুশ্রূষা যজ্ঞো দানং সুরার্চ্চনম্।
গৃহস্থস্য সমাসেন ধর্ম্মোঽয়ং দ্বিজসত্তমাঃ॥

যথাবিধি অগ্নিত্রয়ের সমাধান, অতিথিসেবা, যাগ যজ্ঞ, দান ও দেবার্চ্চনাদি গৃহস্থের সাধারণ ধর্ম্ম।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেনঃ—

যাত্রামাত্রপ্রসিদ্ধ্যর্থং স্বৈঃ কর্ম্মভিরগর্হিতৈঃ।
অক্লেশেন শরীরস্য কুর্ব্বীত ধনসঞ্চয়ম্॥
ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত্তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাখ্যয়া বাপি ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥
ঋতমুঞ্ছশিলং জ্ঞেয়মমৃতং স্যাদযাচিতম্।
মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্॥
সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে।
সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

প্রাণযাত্রা মাত্র চলিয়া যায়, ইহা লক্ষ্য রাখিয়া শরীরকে কোনরূপ ক্লেশ না দিয়া স্ব স্ব বর্ণবিহিত অনিন্দিত কার্য্য দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিবে। ঋত এবং অমৃতের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। অথবা মৃত বা প্রমৃতের দ্বারা কিম্বা সত্যানৃত দ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, কিন্তু জীবিকার জন্য কদাচ শ্ববৃত্তি অবলম্বন করিবে না।

ভূপতিত ধান্যাদিকণাসমূহ এক একটী করিয়া উচ্চয়ন করাকে উঞ্ছবৃত্তি, ধান্যাদির মঞ্জরি উচ্চয়ন করার নাম শিলবৃত্তি। এই উঞ্ছশিল বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাকে ঋতস্বরূপ বলিয়া জানিবে।

অযাচিত ভাবে যাহা কিছু উপস্থিত হয়, সে-ই অমৃত-বৃত্তি। ভিক্ষাজীবনকে মৃত-বৃত্তি এবং কৃষি-জীবনকে প্রমৃত-বৃত্তি বলে। বাণিজ্যের নাম—সত্যানৃত, তদ্দ্বারাও জীবন যাপন করিতে পারে, কিন্তু সেবা বা চাকরি—যাহাকে শ্ববৃত্তি বলে, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সমাজদ্বার।

নিবেদন।

যখন তোমার ধ্যানে
হই আমি নিমগন,
কোথা হ'তে এসে প্রভো!
দেও মোরে দরশন।
যখন আপনা ভুলি'
হরি! ডাকি হে তোমায়,
হৃদয়ের কুটিলতা
সব দূরে চলি' যায়।
অনাবিল শান্তি-প্রেমে
হয় হৃদি ভরপুর,
পূত মন্দাকিনী-স্রোত
গায় হৃদে সুমধুর।
আকুল হরষে মেতে
তোমা-ময় হ'য়ে আমি,
তোমারি পবিত্র প্রেমে
থাকি ডুবে দিবা-যামী।
সদা যেন এই ভাবে
লয়ে থাকি তব নাম,
পুণ্য-পথে তুমি ছাড়া
কে চালাবে ভগবান!

শ্রীকেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শিক্ষার দোষ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

অভিসম্পাত।

তরঙ্গিণী যখন তাহার দাদার ঘরে উপস্থিত হইল, তখন হীরালাল চা' পান সমাপ্ত করিয়া বহির্গমনোপযোগী বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক বাহির হইতেছিল।

তরঙ্গিণী বলিল—"বাবা ডাক্‌ছেন।"

হীরালাল করধৃত যষ্টিগাছটীর মস্তকে ফুৎকার দিতে দিতে যেন কিঞ্চিৎ অন্তমনস্কভাবে বলিলেন,—"কোথায়?"

তর। বাহিরের রকে।

হীরা। কেন?

তর। কি জানি।

হীরা। বাবা কাছারি যান নাই?

তর। গেছিলেন,—মা আবার ডাকিয়ে এনেছেন।

উত্তোলিত যষ্টির আঘাতে মেঝ্যেয় শব্দ তুলিয়া হীরালাল বলিলেন,—"কেন?"

সে শব্দে ঈষচ্চমকিত হইয়া তারপরে তরঙ্গিণী বলিল,—"জানি না।"

হীরা। সেখানে আর কে আছে?

তর। মা আছেন, ওবাড়ীর সারদা পিসী আছেন,,—সে পাড়ার চক্রবর্ত্তী ঠাক্‌রুণ আছেন,—আবও কে কে আছে।

হীরালালের শরীরের রক্ত যেন একটু বিরুদ্ধগতিতে প্রবাহিত হইল। বক্রস্বরে বলিলেন—"হতচ্ছাড়া মাগী কেন এসেছে। বল্‌গে যা, আমি এখন যাব না।"

তর। বাবা ডাক্‌ছেন।

হীরা। সে মাগীর কথাতেই ডাকাইতেছেন। মাগী বজ্জাতের ধাড়ী—হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি। বেটী চোর——

তর। ওমা, অমন কথা বলিয়ো না দাদা;—তিনি বামুনের মেয়ে—বৃদ্ধা—

হীরা। রেখেদে বামুনেব মেয়ে—অমন বামুনের মেয়ে ঢের দেখেছি।

তর। বাবা ব'সে আছেন—ডাকৃছেন—চল না, ঐ রাস্তা দিয়ে বেরুবে।

"চল" এইকথা বলিয়া হীরালাল গৃহের বাহির হইলেন। তরঙ্গিণী তাঁহার পশ্চাদনুগমন করিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ভ্রাতা ও ভগিনী রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন।

তখন সেখানকার সকলেরই দৃষ্টি হীরালালের উপর পতিত হইল। ঘৃণায় কেবল ননির মাতা তাহার মুখাবলোকন করিলেন না।

হীরালাল পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমাকে ডাকছেন কেন? আমি একটু বিশেষ কাযে বাহির হইতেছিলাম ॥

সীতা। তা' যা—একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া ডাকাইয়াছি।

হীরা। কি কথা বাবা—বল, আমার মূল্যবান সময় অনর্থক নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

সীতা। ইনি ননিঠাকুরের মা—এঁকে তুমি চেন?

মহিষের মত আরক্ত বক্র দৃষ্টিতে ননির মাতার দিকে নেত্রপাত করিয়া হীরালাল গর্ব্বিতকণ্ঠে কহিলেন,—"চিনি, কেন বাবা?"

সীতা। তুমি ইঁহাদিগকে কি বলিয়া আসিয়াছ?

হীরা। ওসব কথার মধ্যে তুমি থাকিয়ো না, বাবা। ও মাগীরা বড় ধড়ীবাজ,—ওদের চরিত্র-কথা শুনিলে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়।

নিশীথ-নিশ্চিন্ত মানুষের শিরে সর্পাঘাত হইলে সে যেমন চমকিত, ভীত, ব্যথিত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, ননির মাতাও তেমনি হইয়া উঠিলেন। ক্রোধে, ক্ষোভে, ঘৃণায়, লজ্জায় ও অভিমানে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিস্ফারিত ও আরক্ত নয়নে হীরালালের পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তোমার পিশাচ সন্তানের কথা নিজ কাণে শুনলে? আমি চক্রবর্ত্তী-বংশের বধূ—আমার মুখের উপর এই কথা। এখনও ঐ দস্যুকে দমন করিতেছ না।"

সীতা। স্থির হও বউঠাকৃরুণ,—সকলে পাগল হইলে ত আর চলে না।

হীরালাল মৃদু হাসিয়া অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন,—"বল কি বাবা;

সকলে পাগল কি? ঐ ঠাকুরুণই ক্ষেপেছেন, মর্ম্মকথা তোমাকে গোপনে বলিব।"

অধিকতর উত্তেজিত কণ্ঠে ননির মাতা বলিলেন—"সীতানাথ, ছেলের মায়ায় আত্মকর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছ, দেবতা-ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রাখিতে বিস্মৃত হইয়াছ,—অত্যাচারিতের আর্ত্তনাদ শুনিতে বধির হইয়াছ,—কিন্তু এমন দিন চলিবে না। যদি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়া থাকি,—যদি বিনা কারণে তোমার ছেলে আমাদিগকে অপমান করিয়া থাকে—তবে ভগবান্ ইহার বিচার করিবেন। ঐ ছেলের জন্যে হাহাকার করিতে হইবে।"

ননির মাতা আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না। সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

শাস্ত্রজ্ঞান-হীনতা।

সীতানাথের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সীতানাথের স্ত্রী দাঁড়াইয়াছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। অপর সকলে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

হীরালাল রণবিজয়ী বীরের মত গর্ব্বোন্নত আননে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, —"বাবা কি ভয় খেলে নাকি?"

সীতানাথ কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্নস্বরে বলিলেন,—"বামুনের মেয়ে।"

হীরা। তাই কি?

সীতা। শাপ দিয়ে গেলেন।

হীরা। বাবা, শাস্ত্র জান না—তাই ওরকম কথা ব'লে ফেল্লে। যদি শাস্ত্র জান্‌তে, তবে বুঝতে পার্‌তে আমরা কি?

হীরালালের মাতা ক্ষুণ্ন ও ব্যথিত স্বরে বলিলেন,—শাস্তর উনি জানেন না, আর তুই-ই বা কোন্ ভশ্চায্যির টোলে পড়িয়াছিলি বাবা? বামুনের মেয়ে—বিশেষ তোদের কুলপুরোহিতের বংশ—ওদের সঙ্গে অমন করিস্‌নে বাবা। বামুনের শাপ—বড় ভয়ঙ্কর।

হীরালাল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসির তরঙ্গাভিঘাতে

সেখানকার সকলে হাবুডুবু খাইয়া ফেলিল। কিন্তু কেহ কোন কথা কহিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে হাসির বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া হীরালাল বলিলেন —"মা, আমি কোন ভট্টাচার্য্যের টোলে পড়ি নাই বলিয়াই কি আমার শাস্ত্র-জ্ঞান হয় নাই? শাস্ত্রজ্ঞান বর্ত্তমান যুগে পতিত-ভূমিতে কণ্টক বৃক্ষের ন্যায় আপনি গজাইয়া উঠে। বিশেষতঃ আমরা ক্ষত্রিয় জাতি বামুন বেটারা চিরকাল আমাদেরই নিকটে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছে। যাক্, তোমরা সে সকল গুরুতর কথা বুঝিতে সমর্থ হইবে না। আমার একটু বিশেষ কায আছে,—আমি চলিলাম।

সীতানাথ বাবু মনে মনে পুত্রের বিদ্যাবত্তার শত ধন্যবাদ দিলেন। ভাবিলেন, এমন ছেলে যে বংশে জন্মে সে বংশ পবিত্র ও ধন্য।

হীরালালের মাতাও সেইরূপ মনে করিলেন, কিন্তু তিনি ননির মাতার অভিসম্পাতটা হজম করিয়া ফেলিবার কোন উপায়ই স্থির করিয়া না উঠিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইলেন।

বামাপিসী প্রভৃতি সকলেই হীরালালের পক্ষ সমর্থন করিলেন।

তখন হীরালালের পিতা বলিলেন—"যাক্ বাবা, অত হাঙ্গামে কায নাই। ওরা গরিব মানুষ——

হীরা। না বাবা, তুমি ও সম্বন্ধে কোন কথা কহিতে পারিবে না। ঐ বুড়া বজ্জাত মাগী আমার অনেকগুলি টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে।

সীতা। উনি যে বলিলেন—দশ টাকা।

হীরা। তা নইলে আর বোলছি কি বাবা—মাগী ধড়িবাজের যাশু।

সারদা বলিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ গো, তখনই জানি, ভিতরে একটা কিছু না থাকিলে কি আর অমন হ'য়েছে। গ্রামে ত কত লোক আছে।"

ননির মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"ওগো, ঠাকৃরুণ, চালাকি খেল্‌তে গিয়ে বাঁধনে পড়ে গেছেন। হীরু ত আর সে রকম প্রকৃতির লোক নয় যে, ফাঁকি দিয়ে টাকা খাবে।"

হীরা। আসল কথা বলি শোন—ওদের বিষয় আমাকে পত্তনী বিলি দেবে বলিয়া কয়েক তারিখে প্রায় এক শত টাকার উপর লইয়াছে। এখন আর সে দিক দিয়া যাইতে চাহে না,—এখন বউটীকে দিয়ে টাকাগুলি নির্ব্বিবাদে হজম করিতে চায়।

হীরালালের মাতা বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সমস্ত মুখখানায় যেন চিন্তা ও আশঙ্কার ঘন কালিমা ছাইয়া পড়িল।

হীরালালের স্ত্রী চমকিয়া উঠিল। শাশুড়ী-বধুর মনের মধ্যে যেন বৈশাখী ঝটিকার পূর্ব্ব-সূচনা বলিয়া জ্ঞান হইল। সীতানাথও কথাটা ভাল বলিয়া জ্ঞান করিলেন না। বলিলেন,—"হীরু, যাই হোক, তুমি আর ওদের সম্পর্কে যাইয়ো না। লোকে নিন্দা ক'রবে।"

হীরা। বস্—বাবার পাগলামি দেখ,—আমার টাকাগুলো পথে পথে যাবে।

হী-মা। তা' যাক্ বাবা—ওতে লোকে নিন্দা ক'রবে—ধর্ম্মে পতিত হ'তে হবে।

হীরা। ধর্ম্মের প্রকৃত মূর্ত্তি তোমাদের নিকট লুক্কায়িত আছে মা। গীতাশাস্ত্র যদি পাঠ করিতে, তবে বুঝিতে পারিতে,—কায করাই কর্ত্তব্য। মানাপমান—ফলাফল কিছু দেখিবার প্রয়োজন করে না। এখন আমি চলিলাম।

ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে হীরালাল বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

হীরালালের পিতা হীরালালের মাতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কি বল ?"

অপ্রসন্নমুখে হীরালালের মাতা বলিলেন,—"তুমি কিছু বলিলে না, কাযটা কিন্তু ভাল হইল না।"

সীতা। ভালমন্দ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

গৃহিণী আর কোন কথা কহিলেন না। কোন স্পষ্টবাদী ও ভবিষ্যৎ-জ্ঞানে অভিজ্ঞ লোক সেস্থানে উপস্থিত থাকিলে, সীতানাথকে বুঝাইয়া দিতে পারিত,—স্নেহের মোহান্ধকারে ডুবিয়া পুত্রকে যে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে ছাড়িয়া দিতেছ, কালে ইহার ফলপ্রাপ্ত হইবে। মোহে ডুবিলে সদসৎ বিচার-শক্তি বিলুপ্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

কে ছিলে আমার।

(১)

পূর্ণচন্দ্র-নিভাননা অয়ি বরাননে,
পুণ্য-প্রেম-মন্দাকিনী-পূত বারিধারা
মন্দার-কুসুম-গুচ্ছ অয়ি সুলোচনে—
প্রিয়তমা, প্রেমময়ী প্রেয়সী আমার ?
শেফালিকা-সুরভিত সোণালী সন্ধ্যায়—
শান্ত হয় উদ্দাম এ জীবনের জ্বালা ;—
স্বপ্ন সঙ্গে এসে যদি বল একবার—
—ওগো কে ছিলে আমার।

(২)

নীল নীরদের মঞ্জু চন্দ্রাতপ-তলে
হীরক, কৌস্তুভ ভরা অনন্ত আকাশে,
নির্ম্মল কৌমুদী-মাখা লতিকা-বিতানে,
বসন্তের মৃদুল সে চন্দন হাওয়ায়,
হাস্যময়ী বিলাসিনী ধরণীর মাঝে,—
স্বপ্ন সম অতীতের ওগো মানময়ী ?
তৃপ্ত হই যদি ক'য়ে যাও একবার—
—ওগো কে ছিলে আমার।

(৩)

মনে পড়ে কোকিলেরে ব্যঙ্গ করি ডাকা,
মনে পড়ে গণা সেই আকাশের তারা,
সেই দীঘি, সুপ্ত নিশি, রজনী'ল ফুল,
ঘুম ভাঙ্গা সেই কথা আধ আধ ভুল,
হাসি কান্না সুখ শান্তি পলে পলে পলে—
মনে পড়ে গত কথা সকলি তোমার ;
মুছে যায় সব ব্যথা, সব যাই ভুলে—
ফিরে এসে কভু যদি বল একবার—
—ওগো কে ছিলে আমার—
তুমি—কে ছিলে আমার।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।